ইছ্‌লাম ও আদর্শ মহাপুরুষ।

বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর,
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য
খান্ বাহাদুর আল্‌হজ্জ্ মৌলবী আহ্‌ছানউল্লা
এম, এ ; এম্, আর্, এস্, এ ; আই, ই, এস্ প্রণীত

১ম সংস্করণ।

ঢাকা,—
নবাবপুর,—নারায়ণ মেশিন-প্রেসে,
শ্রীরাধাবল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

১৯২৫।

মূল্য ২ টাকা।

ইছ্‌লাম ও আদর্শ মহাপুরুষ।

বএস্তেদ্‌ আয়ে শাফায়াতে

উম্মাতানে শাফিওল্‌ ওমাম্‌ রাহমাতে দো আলাম্‌
ছাইয়েদুল আরাবে ওয়াল্‌ আজাম্‌
খাতেমুন্নাবিয়ীন্‌ ছাইয়েদুল মোর্‌ছালিন্‌,
রাছুলে রাব্বিল্‌ আলামিন্‌
শামছুদ্দোহা, বদ্‌রুদ্দোজা নূরলহুদা
আহ্‌মাদ্‌ মোজ্‌তাবা মোহাম্মাদ মোস্তাফা
ছাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়ালিহী ওয়াছাল্লাম্‌।

উপক্রমণিকা

ইসলাম একটী মহাসত্যের নাম। ইহার সংজ্ঞা প্রদান সুকঠিন। যাহা অনন্ত-সম্ভূত, সান্ত সংজ্ঞায় তাহাকে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা অর্ব্বাচীনতা। যে সত্য জগতের আদিকাল হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, অসম্পূর্ণ মানবীয় ভাষায় তাহার প্রকাশ অসম্ভব। কতিপয় গুণের সমষ্টিগত বিকাশকে ইসলাম আখ্যা প্রদান করা ভুল। বরং যে জীবন্ত শক্তি এই সকল গুণাবলীকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, তাহাই প্রকৃত ইসলাম। ইসলামের মূলে অনন্ত প্রেম নিহিত। এই প্রেম স্বর্গীয়। ইহার ক্রম বিকাশ জীবশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কতকালে মানব ইহার পূর্ণায়ত্ত লাভে সমর্থ হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যতই এই প্রেমের স্ফূরণ হয়, ততই ইসলামের মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়। যে অনন্ত শক্তি হইতে ইসলাম নিস্যন্দিত, ভাষা তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানব এই শক্তির আভাষ জীবনের কোন বিশেষ সময়ে উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু ইহাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জগতে যে আদর্শ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, মানব যুগে যুগে তাহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে কিন্তু পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না।

আবার ইসলাম একটী কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম। শুধু কতকগুলি নীতিবাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে বা শরীয়তের আজ্ঞাবলীর আক্ষরিক অর্থ পালন করিলেই মানুষ মোসলেম হইতে পারে না। কোর্‌আন্ শরীফে যে সকল নীতি লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি জীবনে কার্য্যক্ষেত্রে এক এক করিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে এবং কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনার্থ শরিয়ৎ কোন্ আদেশ করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে হইবে; তবেই খাঁটী

মোসলেম জীবন যাপিত হইবে। মোট কথা, আদেশ ও উপদেশের letter ছাড়িয়া spirit গ্রহণ করিতে হইবে ; খোসা ভেদ করিয়া সারে পৌঁছিতে হইবে।

কোর্‌আন্ বাণীর সম্যক্ অর্থবোধ করিতে হইলে আঁ হজরতের কার্য্য (ফে-ল) এবং বাক্যাবলীর (কওলের) পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজন, কারণ মাত্র তাঁহারই জীবনে ইসলাম অখণ্ড পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আঁ হজরতের জীবনকেই কোর্‌আনের ব্যবহারিক অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কোর্‌আন Theory এবং আঁ হজরতের জীবন তাহার Practiceএর সমুজ্জ্বল চিত্র। কোর্‌আন্ মহামূল্য বিভূ-প্রেরিত ধর্ম্মগ্রন্থ এবং আঁ হজরতের বাক্যাবলী তাহার ভাষ্য ও তাঁহার কার্য্যাবলী উক্ত মহাগ্রন্থের নীতিনিচয়ের কর্ম্মে পরিণতি। সুতরাং কোরআন্ ও হাদিছের সামবায়িক জ্ঞান দ্বারা আঁ হজরতের পবিত্র জীবনের আদর্শে নিজের জীবনকে গঠিত করিতে চেষ্টা করাই প্রত্যেক মোসলেমের একমাত্র কর্ত্তব্য।

ইসলামের সুবিস্তৃত আলোচনা সমন্বিত পুস্তক বিরল নহে এবং বঙ্গ ভাষায় আঁ হজরতের জীবনীও অপ্রতুল নহে ; কিন্তু তাঁহার জীবনীকে ইসলামের নীতিসমূহের ঠিক পাশাপাশি সজ্জিত করিয়া সহজে সাধারণের বোধগম্য করিবার সম্যক্ চেষ্টা হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। এইজন্যই বোধ হয়, বঙ্গবাসী মোসলেমের উপর আঁ হজরতের পবিত্র জীবনের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না। অপিচ ইসলাম অবলম্বনে যত পুস্তকই লিখিত হউক না কেন, কখনও ইহার পরিধি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কন করা সম্ভবপর হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। যদিও এই চেষ্টা বামনের চন্দ্র ধারণের ন্যায় হাস্যাস্পদ এবং যদিও পদে পদে নিজের অক্ষমতা এবং

অনুপযুক্ততা বুঝিতে পারিয়াছি, তথাপি কোন বিশেষ প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া আমাকে এই গুরুভার বহনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন হেজাজ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পীর মোর্‌শেদ হাজিউল হারামায়নেস্ শরিফায়েন জনাব হজরত ছৈয়দ গফুর শাহ্ আল্-হোচ্ছামি-ওয়াল-ওয়ারছি আঁ-হজরতের জীবনের ঘটনাবলী বিশেষভাবে অনুশীলন করিবার জন্য আমাকে আদেশ করেন। বলিতে কি, তদবধি আঁ-হজরতের 'ছওয়ানে উম্‌রিই' (জীবনীই) হেজাজ ভ্রমণে আমার একমাত্র পাঠ্য ছিল। বিশাল আরবের প্রকৃতি ক্রোড়স্থ প্রতি শৈল ও প্রতি বালুকণা অদ্যাপি সেই মহাপুরুষের সত্যবাণীর সাক্ষ্য প্রদান করে। সেখানকার ব্যোম চন্দ্রাতপতলস্থ সুশুভ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সেখানকার হৃদয়স্পর্শী আতিথেয়তা ও অপ্রমেয় সত্যপ্রিয়তা, সেখানকার অদম্য সাহসিকতা ও সাধু জনোচিত বীরত্ব, সেখানকার অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব ও অকলঙ্ক চারিত্র্য, সেখানকার মুখরা প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মলতা ইঙ্গিতে মানবকে কত কি গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দান করে এবং মহাপুরুষের জীবনের প্রভাবের পরিচয় দেয়। কিছুদিন এই পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করিয়া আঁ-হজরতের কার্য্যাবলীর ইতিহাস অনুসন্ধান করি এবং অতিশয় আনন্দ ও কৌতূহলের সহিত মদিনাবাসিদিগের চরিত্রপটে সেই মহাপুরুষের জীবনী প্রতিবিম্বিত দেখি। যতই প্রকৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, যতই তাঁহার জীবনী অনুসন্ধান করিয়াছি, যতই তাঁহার অনুচরগণের ও বংশধরদিগের চরিত্র আলোচনা করিয়াছি, অনুসন্ধিৎসা ততই বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ততই স্বীয় জ্ঞানাভাব উপলব্ধি করিয়াছি। ভ্রমণানন্তর স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল বন্ধুবান্ধবকে জ্ঞাপন করিতে এক অনিবার্য্য প্রেরণা অনুভব করি, তাহারই ফলে এই পুস্তক আজ সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হইল। এই প্রেরণার জন্য আমি আমার পরম

ভক্তিভাজন পীর মোরশেদের নিকট বহুল কৃতজ্ঞতা-ঋণপাশে আবদ্ধ। তাঁহারই প্রেরণা, তাঁহারই শক্তি এই সামান্য আয়াসের মধ্যে নিহিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাতে আমার স্বীয় প্রচেষ্টার কোন ফল নাই বলিলেই চলে। আমার জ্ঞানাভাব হেতু যদি এই প্রেরণার সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে অক্ষম হইয়া থাকি, আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ আমার সে দীনতা মার্জ্জনা করিবেন। মহাপুরুষের মহাবাণীকে আংশিকরূপে প্রকাশ করিতেও হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয় এবং তদ্ধেতুই এই অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি।

আঁহজরতের জীবনী অনন্ত প্রভাবের আভাষ স্বরূপ। সুতরাং ইহা লেখনি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহার জীবনীর যে কোন দৃশ্য গ্রহণ করি, তাহাতেই অনন্তের ছটা লক্ষিত হয়। কোন একটী দৃশ্য অবলম্বনে শত পুস্তক লিখিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাজ-সমক্ষে পরিস্ফুট করা যায় না। মানব যতই জ্ঞান লাভ করিবে, মানবের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসা যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই তাঁহার জীবনের পূর্ণতর আভাস প্রদানের প্রয়াস কতক পরিমাণে সফল হইতে থাকিবে।

মোসলেমের উন্নতি বা অবনতি, ইছলামের পূর্ণত্ব বা অপূর্ণত্বব্যঞ্জক নহে। উহা আমাদের স্বীয় কর্ম্মপ্রসূত। মানব যতই কোর্‌আনের আদেশ পালন করিবে, যতই আঁহজরতের কার্য্য পরম্পরা অনুসরণ করিবে, ততই ইসলামের উন্নতি সংঘটিত হইবে। আর যতই মানব উহা হইতে দূরে থাকিবে, ততই ইসলামের অবনতি ঘটিবে। বর্ত্তমান যুগ যে তমসাচ্ছন্ন অনুমিত হয়, সে ইসলামের পরাজয় নহে; তাহা আমাদের কর্ম্মেরই অভিব্যক্তি। ইসলামের অভিব্যক্তি যথাসম্ভব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক মোসলেমেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমগ্র মোসলেম জাতির পুঞ্জীভূত এবং সামবায়িক প্রচেষ্টার উপর ইসলামের উন্নতি নির্ভর

করিতেছে। আক্ষেপের বিষয়, আমরা আমাদের দায়িত্ব দিন দিন ভুলিয়া অন্ধকারের গভীরতমস্তরে প্রবেশ করিতেছি, স্বীয় দোষ গণনা না করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতেছি, জড়তা ও নির্জ্জীবতা আলিঙ্গন করিতেছি। খোদাওন্দ! একবার মোসলেম জগৎকে সঞ্জীবিত কর, একবার মোসলেমকে তাহার কর্ত্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা দাও, একবার তাহার স্বীয় দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিবার ইচ্ছা বলবতী কর, একবার সত্যময়ের আভা পৃথিবীতে উদ্ভাসিত হউক, একবার মানব সত্যের মহিমা ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হউক, একবার কোর্‌আনের রহস্য উদ্ঘাটিত হউক, একবার মহাপুরুষগণের আদেশবাণী পূর্ণ হউক। সমগ্র পৃথিবী স্বদেশহিতৈষণা, শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত। এই সময়, খোদাওন্দ! তোমার অপার করুণা একবার মানবের উপর বর্ষণ কর, একবার তোমার অনন্ত মাহাত্ম্য তাহারা অনুভব করুক্, সত্যের জয় হউক, অসত্য চিরতরে বিদায় লউক।

আয়্ শফিউল উমাম! তোমার উম্মত (১) কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় দিন দিন সুকৃতির কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। তুমি যাহাদিগের জন্য সারাজীবন দুঃসহ কষ্টভার গ্রহণ করিয়াছিলে, যাহাদের জ্ঞানের জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হাদিছ রাখিয়া গিয়াছ, যাহাদের পরিচালনের জন্য আপন ছেল্‌ছেলা (পুরুষ পরম্পরা) সুস্থির রাখিয়াছ, আজ তাহারা ক্রমে বিস্মৃতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আজ তাহারা সেই অমূল্য উপদেশাবলী বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় পূর্ণ দুনিয়াদার সাজিয়াছে, আজ তাহারা ইছ্‌লামের অলৌকিকত্ব ভুলিয়া স্বীয় জাতির পূর্ব্বগৌরব পদদলিত করিয়া ক্রমে গভীর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা আজ মানব সমাজে হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহারা আজ অজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিত, তাহারা আজ কর্ম্মক্ষেত্রে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া পরিগণিত। আয়্ রহ্‌মতে দো-আলম্!

(১) অনুবর্ত্তী

একবার দুঃস্থ মোসলেমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের ইহজীবন ও পরজীবনের পথ পরিষ্কার কর, একবার ইসলামের অনন্ত প্রভাব তাহাদের উপর প্রতিফলিত কর, যেন তোমার পুণ্যনামের উপর কলঙ্কপাত না হয়, যেন সমগ্র জগৎ একবাক্যে তোমার গুণগান করিতে শিখে, যেন মহা প্রভুর জয়গান অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া ইসলামের সাক্ষ্য দেয়। আমীন্, ছুম্মা আমীন্!

এই পুস্তক প্রণয়নে আমি নানা পুস্তক হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে কয়েকখানির নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

এতদ্ভিন্ন ইহার সঙ্কলনে আমার প্রিয় বন্ধুবান্ধবগণ অযাচিত পরিশ্রম ও সহানুভূতি প্রদর্শন দ্বারা আমাকে বিশেষ রূপে উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য বাক্য দ্বারা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্ভব। এই পুস্তক দ্বারা একটী আত্মাও যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মপ্রসাদের অধিকারী হন্, তবে আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তিনি ভূলোকে না হইলে দ্যুলোকেও সেই প্রসাদের অংশী হইবেন।

যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের কতিপয়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

১। ছওয়ানেহে উম্‌রি।

২। মারাজুল বাহ্‌রায়েন।

৩। ছফরে হারামায়্‌নেছশরিফায়েন।

৪। ছীরাতুন্ নবী—মওলানা শিবলী নোমানি প্রণীত।

৫। তোয়ায়ে হক্—আব্দুল হালিম শরার প্রণীত।

৬। আল্‌বায়ান—মওলানা হাক্কানী প্রণীত।

৭। মৌলুদে বার্‌জাঞ্জী—জাফর বিন্ হোছায়েন প্রণীত।

৮। The Historian's History of the world.

৯। Islamic Review.

১০। লর্ড হিড্‌লি (উমর ফারুখ) প্রণীত Appreciation of Islam.

১১। ইংলণ্ডের মোছ্‌লেম মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

১২। আরণল্ড' প্রণীত Mahomedan World of Today.

১৩। আমির আলী প্রণীত Spirit of Islam.

১৪। ঐ History of the Saracens.

১৫। ষ্টেটস্‌ম্যান্ প্রকাশিত Year Book.

১৬। Encyclopaedia of Islam.

১৭। Encyclopaedia Britannica.

১৮। সার উইলিয়ম মিউর প্রণীত Caliphate

১৯। গিল্‌ম্যান প্রণীত Story of Nations

২০। হিত্তী প্রণীত Origin of Islamic State.

এই পুস্তকে 'আঁ-হজরত' শব্দ বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। হজরত মোহম্মদ (দঃ) প্রয়োগ করা অসম্মান বোধে এই শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ছাহাবা ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে হজরত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষত্বের জন্যই হজরত মোহম্মদ (দঃ) আঁ-হজরত নামে অভিহিত হইয়াছেন। উর্দ্দু পুস্তকে এই শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। সেই জন্য বঙ্গভাষাতেও ইহার প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলাম। আশা করি, পাঠকবর্গ এই নূতন শব্দ ব্যবহারের ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

আরবী ث ছিন অক্ষরের প্রতি অক্ষর বঙ্গ ভাষায় নাই, এযাবৎ 'স' ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে আরবীভাষায় অনভিজ্ঞ মোসলেমগণ অনেক শব্দের বিকৃত উচ্চারণ করিয়া থাকেন—

ইস্‌লাম, ইসমাইল, মোসলমান প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্থল। স-কারের উচ্চারণ সংস্কৃতে যেরূপ বঙ্গভাষায় ঠিক তদ্রূপ নহে। মনস্কাম প্রভৃতির স-কার সাধারণতঃ শ-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। এই সকল উচ্চারণ বিভ্রাটহেতু কোন কোন মোসলেম লেখক ইসলাম প্রভৃতি শব্দে স-কারের স্থলে 'ছ' ব্যবহার করিয়াছেন। ছ-কারের উচ্চারণ সম্যক্‌রূপে ث ছিনের উচ্চারণ সদৃশ না হইলেও অনেক পরিমাণে উহারই তুল্য। এতদ্ধেতু এই পুস্তকে স-কারের পরিবর্ত্তে ছ-কার সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। আশা করি, পাঠকবর্গ এই প্রচলিত পদ্ধতির ব্যতিক্রমজনিত ত্রুটী লইবেন না।

কতিপয় সঙ্কেতের ব্যাখ্যা।

এই পুস্তকে আঁ-হজরতের নামের পার্শ্বে (দঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের নামের পার্শ্বে (আঃ) এবং কাহারও নামের পার্শ্বে (রাঃ) এবং কাহারও বা (আঃ রাঃ) লিখিত হইয়াছে—উহাদের পূর্ণ পাঠ ও অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :— দঃ— (দরুদ—ছাল্লাল্লাহো আল্লাইহে ওয়া-ছাল্লাম) = তাঁহার উপর আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হইয়াছে।

আঃ— (আলাইহে ছাল্লাম) = তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

রাঃ—(রাজেয়াল্লাহো আনহু) = আল্লাহ্‌তালা তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন।

আঃ রাঃ—(আলাইহে রাহমাত) = তাঁহার উপর কৃপা বর্ষিত হউক।

কলিকাতা,
২৯শে মে, ১৯২৫।

গ্রন্থকার।

নির্ঘণ্ট পত্র।

ইছলাম :—

আদর্শ-পুরুষ

পরিশিষ্ট।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ

ইছলাম একটী আরবী শব্দ। আরবী অতি প্রাচীন ভাষা। ইহা প্রাচীন হইলেও অদ্যাপি সর্ব্বভাষার অগ্রণী। প্রায় সর্ব্বপ্রকার ভাষাই পরিবর্ত্তনশীল। সময়ে শব্দ ও বাক্যের অর্থ পরিবর্ত্তিত ও ভাষা মৃত ভাষায় পরিণত হয়। আরবী ভাষা সংস্কৃত ও লাটিন ভাষার ন্যায় মৃত নহে। ইহা এখনও আরব, মিশর, এশিয়া মাইনর, তুর্কী, ত্রিপোলী, টিউনিস্, আলজিরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। সুতরাং আরবীকে জীবন্ত ভাষা বলা যায়। প্রাচীন অনেক সাহিত্য আমাদের অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, আরবী ব্যতীত অনেক প্রাচীন ভাষারই ঈদৃশী অধোগতি ঘটিয়াছে। প্রফেসার হুইট্‌নি-প্রমুখ ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ কোর্‌আনের ভাষাকে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আরবী ভাষার অপরিবর্ত্তনীয়তা গুণে তাহাতে ঐশীবাণী প্রেরণ এবং রক্ষণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। কোর্‌আন্ সর্ব্বদেশের জন্য ও সর্ব্বকালের জন্য মনোনীত। সুতরাং কোন পরিবর্ত্তনশীল ভাষা দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব হইত। কোর্‌আনের আদেশ যে সার্ব্বজনীন, তাহা কোর্‌আন্ হইতেই প্রতিপাদিত হয়। "আমরা তোমাকে

ইছলাম — আকায়েদ, শরিয়ত ও মারেফত।

(কোর্‌আন্) পাঠাই নাই, (কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য), বরং মানব সাধারণের জন্য (প্রেরিত হইয়াছে) তাহাদের সতর্ককারী ও সুসংবাদের অগ্রদূত স্বরূপ, ৩৪-১২৮।" "আমরা তোমাকে (কোর্‌আন্) পাঠাইয়াছি বরং জগৎ সমূহের প্রতি করুণার দান স্বরূপ, ২১— ১০৮।" এমন ভাবই নাই, যাহা আরবী ভাষায় ব্যক্ত না হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার সকল শব্দের তাৎপর্য্য অন্য কোন ভাষার প্রতিশব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। কোর্‌আন্ শরিফের মধ্যে অনেক শব্দ ব্যবহৃত আছে, যাহার সম্পূর্ণ অর্থ এখনও সম্যক্ বোধগম্য নহে। বিজ্ঞান দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে এবং উহার সমস্ত তথ্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ কত নূতন শব্দের অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছেন, কিন্তু তজ্জন্য আরবী ভাষার আজও কোন দৈন্য হয় নাই। এইজন্যই আরবী ভাষায় মোছ্‌লেম ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত ও লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক শব্দ আছে, যাহার অর্থ বিবিধ হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। "ইছ্‌লাম" উহাদের মধ্যে একটী শব্দ। যে সত্যধর্ম্ম হজরত আদম (আঃ) হইতে একাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, তাহাকে ইছ্‌লাম বলে। পুরাকালে যে সকল সত্যবাণী প্রচারিত হইয়াছে, সমস্তই ইছ্‌লাম নামে আখ্যাত। কোর্‌আন্ শরিফে হজরত ইব্রাহিম প্রচারিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মোছ্‌লেম নামে আখ্যাত করা হইয়াছে (ছুরা হজ্জ ১০ রুকু)। শিক্ষার অভাব, চিন্তার অভাব ও দেশকালের প্রভাবে এ সমস্ত সত্যবাণী নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেইজন্যই বিভিন্ন ধর্ম্ম পুস্তকে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এই বিভিন্নতা হেতু সকল ধর্ম্ম ইছ্‌লাম পদ বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু যাহা প্রকৃত সত্যবাণী, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্বকালের জন্যই সত্য। এই মহা সত্যই ইছ্‌লাম বলিয়া পরিগণিত। হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত ইছা (আঃ) ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সকলেই উহাকে দেশজ

ও কালজ দোষ হইতে সংরক্ষণ করিতে ব্রতী হন। বর্ত্তমান মোছ্‌লেম ধর্ম্মেই ইছ্‌লাম পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। খোদাওন্দ করিম হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সাহায্যে ইছ্‌লামকে এই মহাসম্মান দান করিয়াছেন। তাই ইছ্‌লাম আজ সর্ব্বত্র পরিচিত, আদৃত ও সম্মানিত।

ইছ্‌লাম শব্দের অর্থ সমর্পণ, প্রীতি ও শান্তি। মোছ্‌লেম স্বার্থকে ত্যাগ করিয়া জাগতিক মঙ্গল সাধন করে। মোছ্‌লেম আত্মসমর্পণ করিয়া মহাসত্যে বিলীন হয়। মোছ্‌লেম সেবা দ্বারা মহাপ্রভূর প্রীতি সাধন করে। ইছ্‌লাম মনুষ্যগত মঙ্গলামঙ্গল জগতের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করে। ইছ্‌লাম অস্থায়ী সুখ পরিহার করিয়া চিরন্তন সুখ খরিদ করে। ইছ্‌লাম জাগতিক প্রীতিস্থাপন করিয়া মহাসত্যের পরিচয় দেয়। ইছ্‌লাম সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ছালামতি অর্থাৎ শান্তির সৃষ্টি করে। ইছ্‌লাম "ফানা" (১) হইতে "বাকা" (২) তে পৌছাইয়া দেয়। এই ইছ্‌লাম শব্দের গূঢ়তত্ত্ব এখনও সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত হয় নাই। কেবল আরবী ভাষাতেই একটি শব্দ সাহায্যে এতগুলি সূক্ষ্মভাব সম্যক্ প্রকাশিত হইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত অর্থগুলিই এক ইছ্‌লাম শব্দে নিহিত আছে।

ইছ্‌লামধর্ম্ম পঞ্চস্তম্ভের উপর নির্ম্মিত ও সংরক্ষিত। উহাদের সকলেরই মূলে একের স্বার্থত্যাগ ও অপরের মঙ্গল সাধন পরিলক্ষিত হয়। ইছ্‌লামে "আম্‌র্" (৩) ও "নেহি" (৪) উভয়ই বর্ত্তমান। মানব যে পর্য্যন্ত স্বার্থত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গল অপূর্ণ থাকে। আত্মবিস্মৃতি সার্ব্বভৌমিক স্মৃতির মূল কারণ। ইহা অস্থায়ী সুখের বিনিময়ে স্থায়ী সুখ আনয়ন করে। কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্জ এই পাঁচটী স্তম্ভের উপর সমগ্র ইছ্‌লাম ধর্ম্ম দণ্ডায়মান

(১) অস্থায়িত্ব, (২) স্থায়িত্ব, (৩) আদেশ, (৪) নিষেধ।

বটে, কিন্তু কেবল এই পাঁচটী লইয়াই ইছ্‌লাম গঠিত নহে। ইছ্‌লাম বলিলে কেবল এই পাঁচটী বুঝা বড়ই ভুল। স্তম্ভ যেমন অট্টালিকা নহে, কেবল তাহার উপর অট্টালিকা স্থাপিত হয় মাত্র, তেমনি এই পাঁচটী আদেশের উপর ইছ্‌লাম অবস্থিত মাত্র। আবার স্তম্ভগুলি যেমন "বুনিয়াদের" (১) উপর অবস্থিত, তেমনি উক্ত পাঁচটী আদেশ ও ইমানের উপর অবস্থিত। ইমান আকায়েদ ও শরিয়তের সহিত সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট নহে। আকায়েদ ও শরিয়ত পরস্পরকে সাহায্য করে।

ইমান একটী শক্তি বিশেষ এবং শরিয়ত উহার ফল স্বরূপ। একটী অন্তর্দ্দেশস্থ ও অপরটী বহির্দ্দেশস্থ। যেমন অণ্ডের সহিত পক্ষীর সম্বন্ধ, সেইরূপ ইমানের সহিত শরিয়তের সম্বন্ধ। ইমান হইতে শরিয়ত উৎপন্ন হয়, আবার শরিয়ত হইতে ইমানের পোষকতা জন্মে। মোছ্‌লেম ইমান লইয়া শরিয়তে প্রবেশ করে। আবার ইমানের যতই পরিপক্কতা হয়, শরিয়তের প্রতি ততই মোছ্‌লেমের আগ্রহ ও যত্ন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শরিয়ত অনুযায়ী যিনি যতই স্বার্থ বর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি ততই মোমেন নামের উপযুক্ত হন। শরিয়তের মধ্যে প্রধান নীতি আত্ম-বিসর্জ্জন। যিনি যতই "নফ্‌ছের" (২) বিরুদ্ধে বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিবেন, তিনি ততই মোছ্‌লেম নামের উপযোগী হইবেন। এই বর্জ্জনই শরিয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবের সমস্ত জীবন এই বর্জ্জন নীতি শিক্ষার স্থল। ইহার উপর মানবের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। এই বর্জ্জন কোন গবর্ণমেণ্ট বা সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা প্রবৃত্তিচয়ের বিরুদ্ধে বর্জ্জন। যিনি যতই প্রবৃত্তিগুলি বর্জ্জন করিতে পারিবেন, যিনি যতই আপনাকে খোদার রাহে উৎসর্গ করিতে পারিবেন, তিনি ততই মোছ্‌লেম নামের উপযুক্ত হইবেন। যিনি স্বীয় "হাস্তী" (৩) নষ্ট করিতে

(১) ভিত্তি, (২) প্রবৃত্তির, (৩) অহংজ্ঞান।

পারেন, তিনি প্রকৃত অস্তিত্ব লাভ করিতে পারেন। বর্জ্জনই ইছ্লামের প্রথম শিক্ষা ও বর্জ্জনই ইছ্লামের শেষ উদ্দেশ্য। যিনি প্রবৃত্তিগুলি যতই দমন করিতে পারেন, তিনি ততই আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে পারেন। তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাই আকায়েদের উদ্দেশ্য। আকায়েদ হইতেই ইছ্লামের উৎপত্তি; আবার উহাতেই ইহার পরিণতি। বিনা আত্মসমর্পণে, বিনা শরিয়ত পালনে মানুষের আকায়েদ দোরস্ত হইতে পারে না। আবার ইমান ব্যতীত মানুষের শরিয়তে আসক্তি জন্মে না। উভয়ই পরস্পর বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। একটী ব্যতীত অপরটী নিরর্থক।

আকায়েদ এই কয়েকটি বস্তু লইয়া গঠিত, যথা :—আল্লাহ্তায়লার একত্বে বিশ্বাস, তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রতি বিশ্বাস, তাঁহার প্রেরিত কেতাব ও আদেশাদির প্রতি বিশ্বাস, ফেরেস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস, সুকার্য্য বা কুকার্য্যের ফলাফলের প্রতি বিশ্বাস, হাশর্ নশরের প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর পর হেছাব নিকাশ ও শাস্তি এবং পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ্তায়ালার মহাপ্রভুত্বে যিনি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসী, তিনিই মোমেন। প্রকৃতপক্ষে ইমান কোন কালে বা স্থানে সীমাবদ্ধ নহে। মোমেন অতি প্রাচীনকালেও ছিল, বর্ত্তমানকালেও আছে; ভবিষ্যতেও থাকিবে। ইমানের পরিপক্কতা সাধন করিতে হইলে শরিয়তের পরিপক্কতা অত্যাবশ্যক। যে শরিয়তে আত্মত্যাগ নাই, সে শরিয়ত অপরিপক্ক; যে শরিয়তে বর্জ্জন নীতি নাই, সে শরিয়ত অপরিপুষ্ট; যে শরিয়ত জাগতিক প্রীতি ও সহানুভূতি শিক্ষা দেয় না, সে শরিয়ত অসম্পূর্ণ; যে শরিয়তে ভ্রাতৃত্ব-বিস্তার নাই, সে শরিয়ত অঙ্গহীন; যে শরিয়ত একত্বের পথ পরিষ্কার না করে, সে শরিয়ত উদ্দেশ্য-হীন।

শরিয়তের প্রথম স্তম্ভ একত্বের অনুসরণ। কলেমা তৈয়ব আয়ত্ত করাই প্রথম আদেশ। এইটী অতি গুরুতর আদেশ ও উহার পালন বহুল আয়াস সাধ্য। যাঁহার অবশিষ্ট আদেশ চতুষ্টয়ে অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রথম আদেশ পালন কতক সহজ সাধ্য। মানুষ আপনাকে উৎসর্গ করিতে যতই তৎপরতা লাভ করিবে, ততই সে "নফি" (১) হইতে "এছ্‌বাতে" (২) পৌঁছিতে পারিবে; ততই সে বহুত্ব মধ্যে একত্ব দেখিতে পাইবে। বিশ্বাসের নাম শরিয়ত নহে, কার্য্যের নামই শরিয়ত। Theory ও Practice এ যেরূপ প্রভেদ, ইমান ও শরিয়তে সেইরূপ প্রভেদ। শক্তি থাকিলেই কার্য্যোৎপত্তি হয়, শক্তির অভাব হইলে কার্য্যোৎপত্তি হয় না। তাই বলি, ইমান না হইলে শরিয়ত দোরস্ত হয় না। আবার শরিয়ত না হইলে ইমানের পরিপক্কতা জন্মে না। অন্তঃকরণের মধ্যে ইমান পোষণ করিতে হয়, আর শরীর দ্বারা শরিয়ত পালন করিতে হয়। একটী কারণ, অপরটী কার্য্য। একটী বীজ, অপরটী ফল। বীজে ফলোৎপন্ন হয়, আবার ফল হইতেই বীজ লাভ হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শরিয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রবৃত্তি দমন ও স্বার্থ বিনাশ। যিনি যতই রোজা রাখিবেন, যিনি যতই নামাজ পড়িবেন, তিনি ততই দমন ও বর্জ্জন নীতি অনুসরণ করিতে পারিবেন, তিনি ততই দম ও শম গুণে বিভূষিত হইবেন, তিনি ততই দুষ্প্রবৃত্তি দমন ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন।

স্বার্থের বিনাশ পঞ্চমাদেশ অর্থাৎ হজ্জ দ্বারাই বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হয়। মানুষ আপন ধন দান করিতে পারে, কিন্তু আপন জন সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। হজ্জ ব্রতে এই উভয় ত্যাগই সংসাধিত হয়। ইহাতে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসব্রত উভয়ই প্রতিপালিত হয়। যিনি "লিল্লাহ",

(১) নাস্তিবাদ Negation (২) অস্তিবাদ affirmation।

স্বায় শরীর, স্বায় ধন ও স্বীয় জন উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মোমেন, তিনিই প্রকৃত মোছ্‌লেম। ধন, জন ত্যাগ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য পর্ব্বত বাস সহজ সাধ্য, কিন্তু পুত্র কন্যা, দারা পরিবার, আত্মীয়স্বজন, ধন দৌলত চির বিদায় দিয়া স্বদেশ হইতে অতি দূরে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া প্রচণ্ড মরুভূমির মধ্যে, দস্যু ও বিবিধ আপদ-বিপদ-সঙ্কুল স্থানে, কতক পদব্রজে, কতক উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কতক জলযানে, কতক স্থল পথে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করিয়া, প্রখর সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া, একমাত্র খোদা ওন্দ করিমের শরণ লইয়া যে মহা "ছফর" (১) সম্পন্ন হয়, তাহা সন্ন্যাস ব্রত অপেক্ষা শত সহস্র গুণে কষ্টসাধ্য। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা আত্মোৎসর্গের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নাই। যিনি আল্লাহ্‌তায়ালার "রাহমানিয়তের" (২) উপর আপনাকে ভাসাইতে পারেন, তিনিই এই দুঃসাধ্য ব্রত প্রতিপালন করিতে সক্ষম হন। এখানে বলা আবশ্যক, যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে হজ্জব্রত পালন করেন, তাঁহাদের বিষয় এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে।

আকায়েদ ও শরিয়ত লইয়া যে ইছ্‌লাম সম্পূর্ণ হইল, তাহা নহে; উহাকে অবলম্বন করিয়া "হাকিকতের" (৩) অনুসন্ধান করাই ইছ্‌লামের মুখ্য উদ্দেশ্য। হাকিকত জানিবার জন্য এল্‌মে "ছফিনা" (৪) যথেষ্ট নহে। [পরবর্ত্তী চিত্র দ্রষ্টব্য]। শরিয়ত দ্বারা জমি প্রস্তুত হয়; কিন্তু কেবল জমি প্রস্তুত হইলেই বাগিচা ফল ফুলে শোভিত হয় না। উহাতে কেবল উর্ব্বরতা উৎপন্ন হয়। যে পর্য্যন্ত "কল্‌ব্‌" (৫) তমসাছন্ন থাকে, সে পর্য্যন্ত উহাতে দিব্য রশ্মি সহজে প্রতিফলিত হয় না। শরিয়ত "পরস্ত" (৬) হইলে মোছ্‌লেমগণ এল্‌মে হাকিকি (৭) অর্জ্জন করিবার সহজ পথ অনুসরণ করিতে পারে। তখন

(১) ভ্রমণ। (২) করুণাময়তা (৩) পরম সত্য (৪) পুস্তকগত জ্ঞান (৫) অন্তঃকরণ (৬) সেবক (৭) তত্ত্বজ্ঞান।

তাহার প্রবৃত্তিগুলির উপর প্রভুত্ব জন্মে এবং যদৃচ্ছা উহাদিগকে চালনা করিতে পারে। যখন উহাদের উপর মানবের পূর্ণ ক্ষমতা জন্মে, যখন নফ্ছকে মানুষ সহজে দমন করিতে শিখে, তখন সে একত্বের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। এনছান (১) ও নফ্ছের চির শত্রুতা। যিনি এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে পারেন; তিনিই প্রকৃত মোছ্লেম। যিনি নফ্ছ্কে যত অধিক পরিমাণে শাসন করিতে সমর্থ হন, তিনি ততই খোদাতালার পেয়ারা হন। কেবল মাত্র এশ্কই (২) মানুষকে হাকিকতে পৌঁছাইতে পারে। এশ্ক পোষণ করিতে হইলে নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা হৃদয় দ্রবীভূত করিতে হয়। যে হৃদয় যত দ্রবীভূত হয়, সে হৃদয়ে ততই বীজোৎপত্তির সুযোগ ঘটে। ইমান ও শরিয়ত হাকিকতের দ্বার স্বরূপ। ইহারা এনছানের প্রবৃত্তিগুলি সুশাসন করে। খোদা ওন্দ করিম তাঁহার অসীম কৃপা গুণে এনছানকে প্রবৃত্তি (desire) ও মহব্বত (love) এই দুইটা মূল্যবান বস্তু দান করিয়াছেন। মানব প্রবৃত্তিগুলি যতই সৎপথে চালিত করিতে পারেন, ততই মহব্বতের বিকাশ হইতে থাকে। এই মহব্বত ক্রমে আত্ম ছাড়িয়া অপরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেয়। তৎপর উহা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অবশেষে জড় পদার্থে পর্য্যন্ত প্রসার বিস্তার করে ও সর্ব্বশেষে তাহাকে মহাপ্রভুর একত্বে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহারই নাম প্রেম। এই প্রেম দ্বারা এনছান প্রেমময়ের রহস্য বুঝিতে সক্ষম হয়। খোদা ওন্দকরিম দয়ার আধার। তিনি সকল এনছানকে এই মহাবস্তু দান করিয়াছেন। ইহার যতই বিকাশ হইতে থাকে, দুষ্প্রবৃত্তিগুলি ততই পরাজিত হয়। প্রবৃত্তি ও মহব্বতের বিবাদ যিনি ভঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মানব পদ-বাচ্য। দুষ্প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে হাস্তীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। প্রেম আসিয়া হাস্তীকে দমন

(১) মানব (২) প্রেম

করিতে থাকে ও প্রবৃত্তিগুলি বিনষ্ট করে। তখন ক্রমে মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উপস্থিত হয়। প্রথমাবস্থায় এন্‌ছান পশ্বাদির ন্যায় আত্মসুখে মগ্ন থাকে। ক্রমে সে সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা, মানব-সেবা ও জগৎ-সেবা করিয়া প্রেমময়ের একত্ব উপলব্ধি করে। যিনি আত্ম-সেবাতে আবদ্ধ, তিনি পশ্বাদি অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহেন। যিনি আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও সমাজ লইয়া ব্যস্ত, তিনি আত্মসেবী অপেক্ষা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু সমাজ সেবাই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। দেশের মঙ্গল হেতু স্বীয় স্বার্থ উৎসর্গ করা উচিত, কিন্তু সমাজ বা দেশ-সেবাই চরম লক্ষ্য মনে করা নিতান্ত ভুল।

আজকাল দেশহিতৈষণা লইয়া সর্ব্বত্র হৈ চৈ পড়িয়াছে। দেশ সেবাকেই লোকে একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইছ্‌লাম কেবল দেশ লইয়াই সীমাবদ্ধ নহে। ইহার প্রসার তদপেক্ষা অতি বৃহৎ। জাতি নির্ব্বিশেষে, দেশ নির্ব্বিশেষে, কাল নির্ব্বিশেষে, স্থান নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ইছ্‌লাম জগৎকে আপনার করিতে শিখায়। ইছ্‌লাম সমগ্র জগৎ লইয়া ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, ইছ্‌লাম সমস্ত প্রাণীজগৎকে প্রেম শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ক্রমে প্রাণীজগৎ ছাড়িয়া ইছ্‌লাম জড়জগতে পৌঁছে। জড় ও অজড়কে এন্‌ছান ভালবাসিতে শিখে এবং প্রেমময়ের সৃষ্টি বলিয়া তাহাদের সহিত প্রেমভাবের আদান প্রদান করে। (সমকেন্দ্রিক বৃত্তের চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইছ্‌লাম জড়জগতেও আত্মার আরোপ করে এবং সর্ব্বভূতে দয়া করিতে ও ভালবাসিতে শিখায়। প্রকৃতই "জড় ও অজড় সকল পদার্থই প্রেমময় হইতে উৎপন্ন ও উহারা সকলেই প্রেমময়ে প্রত্যাগত হইবে", এই কোর্‌আন্‌ বাণী মহা সত্য। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জগতের সমস্ত বস্তুই অনুপ্রাণিত। সমস্ত বস্তুতেই আত্মা নিহিত এবং সমস্ত আত্মাতেই

প্রেমবীজ উপ্ত। এই প্রেমকেই বিজ্ঞান মহাকর্ষণ আখ্যা দিয়াছে। এমন বস্তু নাই, যাহা মহাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট নহে। পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল এবং কঠিন, তরল, বায়বীয় সমস্ত পদার্থই এই মহাকর্ষণ দ্বারা সঞ্জীবিত। সকলেই অলক্ষ্যে ও অপ্রতিহতভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। যিনি সর্ব্বজগতে এই মহাকর্ষণ উপলব্ধি করেন, তিনিই প্রেমময়ের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মহাকর্ষণ মহাপ্রভুর একটী শক্তিবিশেষ। তাঁহার অনন্ত দয়া, অনন্ত ভালবাসা, অনন্ত 'রহম' (১) সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে। এই জন্যই তিনি 'রহমান' নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শরিয়ত প্রবৃত্তিগুলির উপর অধিকার বিস্তার করে, হৃদয়কে প্রেমরসে সঞ্জীবিত করিবার জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু মারেফত (২) মানব হৃদয়ে প্রেমবহ্নি উদ্দীপিত করিয়া হাস্তীকে দহন করে ও মহাসত্যের আলোকে দুষ্প্রবৃত্তির অন্ধকার দূর করে, প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া দেয় ও অবশেষে প্রেমময়ে বিলীন করে। ইহাই ইছ্‌লামের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ নির্ব্বাণ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন ও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিগণ পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে মানবজন্মেই আত্মার পরিপুষ্টি সাধিত হইতে পারে। মানব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে ইচ্ছা করিলে পশুর স্থান অধিকার করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে স্বর্গীয় দূতের ও আদর্শস্থানীয় হইতে পারে। তাহার মধ্যে উভয়েরই দোষগুণ অন্তর্নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে মানবহৃদয়েই স্বর্গ নরক উভয়ের সমাবেশ। এই পৃথিবীতেই মানব স্বর্গীয় সুখের আভাষ পাইতে পারে; আবার এই পৃথিবীতেই সে নরকের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। যে নারকী, তাহার

(১) করুণা। (২) তত্ত্বজ্ঞান

নরক ভোগ এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ হইয়া পরলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। যিনি বেহেশ্‌তী, তাঁহার আত্মপ্রসাদ পৃথিবী হইতে স্ফুট হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, শরিয়ত কয়েকটি বিভিন্ন প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে। সবগুলির উদ্দেশ্য একই, তবে প্রয়োগের সামান্য বিভিন্নতা আছে। শরিয়তপদ্ধতি স্থাপয়িতৃ-গণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। উক্ত পদ্ধতি "মজহাব" নামে আখ্যাত। হজরত আবু হানিফা হইতে "হানিফী", হজরত শাফী হইতে "শাফেয়ী", হজরত মালেক হইতে "মালেকী" এবং আহম্মদ বিন হাম্বল হইতে 'হাম্বেলী' মজহাব সৃষ্ট। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত গূঢ় কোন বিভিন্নতা নাই। প্রত্যেক পন্থীর উদ্দেশ্যই শাসন ও সংযম শিক্ষাদান এবং ইহাই শরিয়তের পরম ও চরম উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক মোছ্‌লেমের পক্ষে উক্ত চারি মজহাবের যে কোন একটা এক্তেয়ার (১) করা আবশ্যক। যখন মোছ্‌লেম সংযম শিক্ষা দ্বারা হৃদয় প্রস্তুত করিয়া তোলে, তখনই প্রথমে এল্‌মে "ছিনার" (২) আবশ্যক হয়। এই শিক্ষা মানব হৃদয়ে প্রেমময়ের প্রতিভাস দেখাইয়া দেয় ও জগতের গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে। যে পর্য্যন্ত প্রেমিক ও প্রেমময়ের মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। যদি জীব জীবনদাতার জ্ঞানলাভ করিতে না পারে, যদি মানব পরমাত্ম-জ্ঞান লাভ না করে, তবে প্রেমময়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হয় না। তাই বলা হইয়াছে, ইছ্‌লাম কেবল আকায়েদ ও শরিয়ত-শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইছ্‌লাম মারেফত শিক্ষা দিয়া জগৎ-সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে।

(১) অবলম্বন (২) অন্তর্জ্ঞান।

আকায়েদ ও শরিয়ত প্রকৃতপক্ষে ইছ্‌লামের বুনিয়াদ মাত্র। যে পর্য্যন্ত বুনিয়াদের উপর গৃহ-স্থাপিত ও সুশোভিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবজীবন সার্থক হয় না। ইছ্‌লাম কেবলমাত্র বুনিয়াদ ও স্তম্ভস্থাপন করিয়াই বিরত থাকে না। ইছ্‌লাম মারেফত শিক্ষা দিয়া মানব হৃদয় স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করে। উহা পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করে ও প্রেমময়ের নৈকট্য সাধনে সহায়তা করে। শরিয়ত শিক্ষা যেমন চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, তেমনি প্রবর্ত্তকের নামানুসারে মারেফত পন্থীরাও প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ঃ—কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, ছাহ্‌রাওয়ারদিয়া বা মোজাদ্দেদিয়া। হজরত আব্দুল কাদের জেলানী (রঃ) প্রথমটীর প্রবর্ত্তক। হজরত মাইনউদ্দিন (রঃ) চিশ্‌তিয়া খান্দানের প্রবর্ত্তক। খাজা বাহাউদ্দিন (রঃ) নকশ্‌বন্দিয়ার ও শেখ শাহাবুদ্দিন (রঃ) ছাহ্‌রাওয়ারদিয়ার প্রবর্ত্তক। উক্ত পন্থি-চতুষ্ঠয়ের শিক্ষা পরস্পর বিভিন্ন। প্রথম পন্থী সৎকার্য্য করিতে আদেশ দেন ও দুষ্কার্য্য হইতে বিরত রাখেন। দ্বিতীয় পন্থী বিশুদ্ধ প্রেমবিস্তার শিক্ষা দেন। তৃতীয় পন্থী জেকের আজ্‌কার (১) ও চতুর্থ পন্থী বর্জ্জন ও ত্যাগনীতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে এই চারিটী উদ্দেশ্যই সুসাধন করা আবশ্যক। উহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট, তবে এক পন্থী একটী প্রকরণের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করেন এবং অন্য পন্থী অপর প্রকরণের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই আত্মচিন্তা করেন। সকলেই দুষ্প্রবৃত্তির দমন করেন, সকলেই হাস্তীর বিনাশ শিক্ষা দেন। সকলেই প্রেমময়ের জাত ও ছেফত (২) বর্ণন করেন এবং সকলেই প্রেম দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার রহস্য

---

(১) নামজপ ও আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসাবাদ (২) স্বরূপ।

উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন। মহাপ্রভুর সহিত নৈকট্য সাধন করাই প্রত্যেক পন্থীর উদ্দেশ্য।

যাঁহারা মারেফত্‌ জ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা চারিশ্রেণী হইতেই শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম প্রবেশকারীর জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বণীয়। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। ইছ্‌লাম কেবল আকায়েদ বা কেবল শরিয়ত বা মারেফত্‌ লইয়া সীমাবদ্ধ নহে। এই তিনটী লইয়াই ইছ্‌লাম গঠিত এবং উহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট। কেহ কেহ শরিয়তকে মারেফতের বিরুদ্ধ এবং মারেফত্‌কে শরিয়তের বিরুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক একটী অপরটীর দ্বার স্বরূপ। প্রবেশকের জন্য শরিয়ত অত্যাবশ্যক। পূর্ণ ইছ্‌লাম অবগত হইতে হইলে ঐ দ্বার দিয়া মারেফত গৃহে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। যিনি ঐ গৃহের লুক্কায়িত ধন যত বেশী পরিমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি প্রেমময়ের তত নৈকট্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শরিয়ত ও মারেফত-মধ্যে কোন বিরুদ্ধ নীতি অবলোকিত হয় না। একটী অপরটীর পরিপোষক। শরিয়তের পরিধি মারেফতের পরিধি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। শরিয়ত নীতি লইয়াই থাকে, মারেফত আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেয়। শরিয়ত সমাজ ও জাতি লইয়া সন্তুষ্ট, মারেফত সমস্ত জগৎ লইয়া বিস্তৃত। ইহা সান্তকে অনন্তে মিশাইয়া দেয়। শরিয়ত নীতি (Morality) লইয়া সীমাবদ্ধ। মারেফত অধ্যাত্মের (Spirituality) অনন্ত প্রসার লইয়া ব্যাপ্ত।

শরিয়ত অপরের হকুক (১) নষ্ট না করিয়া স্বীয় স্বার্থ সাধন শিক্ষা দেয়। মারেফত স্বীয় হকুক ভুলাইয়া দেয় ও জগতের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। শরিয়ত (Minimum) নিম্নতম পরিমাণ শিক্ষা দেয় ও মারেফত

(১) অধিকার সমূহ।

(Maximum) ঊর্দ্ধতম পরিমাণে পৌছায়। শরিয়ত শতকরা আড়াই টাকা জাকাত নির্দ্দেশ করে, মারেফত জাগতিক মঙ্গলের জন্য সমগ্র ধন সম্পত্তি, দেহ, মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দেয়। শরিয়ত মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শিক্ষা দেয়, মারেফত প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, নিদ্রাতে ও জাগরণে সর্ব্ব সময়ে নামাজ আদায় করিতে বলে। শরিয়ত এতিম ও গরীবকে খয়রাত দিতে শিক্ষা দেয়, মারেফত জড় ও অজড়, সজীব ও নির্জ্জীব, ভূলোক ও দ্যুলোক সর্ব্ব স্থানের সর্ব্ব প্রকার সৃষ্ট বস্তুর জন্য সার্ব্বজনীন বিসর্জ্জন শিক্ষা দেয়। শরিয়ত সৃষ্ট ও স্রষ্টার পার্থক্য করে, মারেফত উহাদিগকে একত্বে মিলিত করে। শরিয়ত হামা-আজ-উস্ত (১) শিক্ষা দেয়, মারেফত হামা-আজ-উস্ত ও হামা-উস্তের (২) সামঞ্জস্য ঘটায়। শরিয়ত স্রষ্টাকে দূরে রাখে, মারেফত স্রষ্টার নৈকট্য সাধন করে। শরিয়ত দূর হইতে মহাপ্রভুকে আহ্বান করে, মারেফত প্রতি অণু-পরমাণুতে মহাপ্রভুকে অনুভব করে। সাধারণের জন্য শরিয়ত কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দেয়, মারেফত খাছউল-খাওয়াছের (৩) জন্য সমাজ নীতি, দেশ নীতি অতিক্রম করিয়া জাগতিক নীতি, আধ্যাত্মিক নীতি ও পারলৌকিক নীতি শিক্ষা দিয়া তন্ময়ত্ব আনয়ন করে। শরিয়ত সাধারণের পরিচালনার জন্য নীতি সমূহ লিপিবদ্ধ করে, মারেফত জাগতিক সৌন্দর্য্য ও মহাকর্ষণ মধ্যে ঐ নীতি লিপিবদ্ধ দেখে। প্রতি জীব, প্রতি উদ্ভিদ, প্রতি জড়পরমাণু মধ্যে মারেফত অসংখ্য নীতি, অসংখ্য নিয়ম, অসংখ্য আইন শিক্ষা করে। সে কেবল সমাজ নীতি লইয়া স্থির থাকে না, নিমেষ মধ্যে ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত পর-ওয়াজ (৪) করে।

---

(১) তাঁহা হইতে সব, (২) তিনিই সব, (৩) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (৪) পরিভ্রমণ।

এল্‌মে হাকিকী

এল্‌মে ছিনা (মারেফত)

এল্‌মে ছফিনা
শরিয়ত ও আকায়েদ

সমকেন্দ্রিক বৃত্তের চিত্র
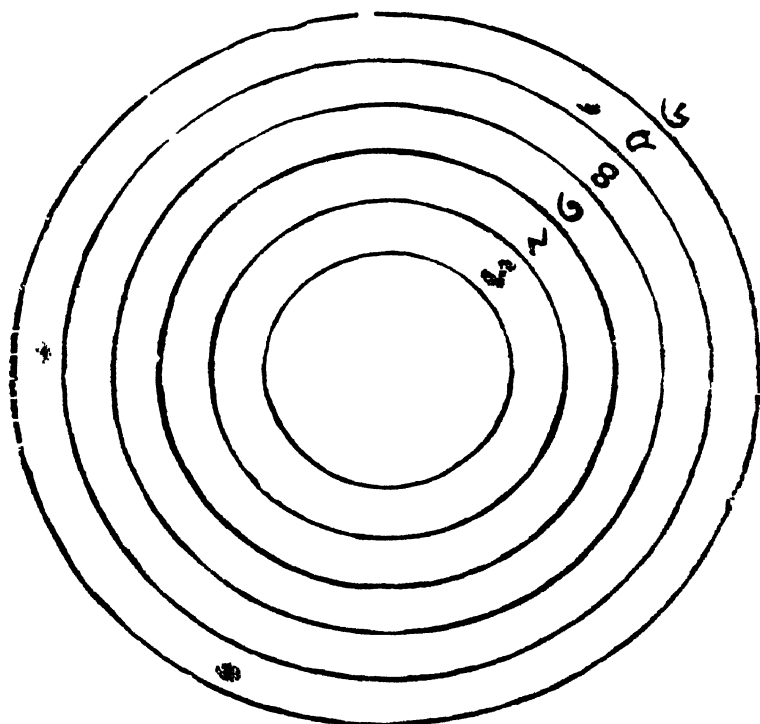
৬। বিশ্বপ্রেম। ৫। স্বজাতি প্রেম। ৪। সঙ্ঘপ্রেম।
৩। সমাজ প্রেম। ২। স্বগণ প্রেম। ১। আত্মপ্রেম

ইছ্‌লাম সন্ন্যাসব্রত অনুমোদন করে না। ইহা দ্বারা কোন কোন বিশেষত্ব লাভ করা যায় সত্য; কিন্তু মানব আত্মশাসনের সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারে না। ক্ষণকালের জন্য সে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে বটে কিন্তু স্বর্গীয় গুণে সম্যক্ গুণান্বিত হইতে সক্ষম হয় না। যে ধর্ম্ম বা যে শিক্ষা কেবল মাত্র আংশিক পূর্ণতা সাধন করে, তাহাকে শ্রেষ্ট ধর্ম্ম বা শিক্ষা বলা যায় না। খোদা প্রাপ্তিই মানবের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। কেবল ইছ্‌লামই এই লক্ষ্য পূর্ণরূপে সাধন করিতে পারে। এনছানের মধ্যে যে সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি নিহিত আছে, ঐ গুলিকে শিক্ষা দ্বারা সুপ্রবৃত্তিতে পরিণত করা এবং স্বর্গীয় গুণাবলীর সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির চেষ্টা করাই ইছ্‌লামের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অন্তঃকরণের প্রত্যেক বৃত্তি এরূপ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় যে, সকলেই একাধারে খোদা ওন্দ করিমের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। তাপসব্রত দুষ্কার্য্য হইতে মানবকে রক্ষা করে কিন্তু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য আগ্রহ জন্মাইতে পারে না। কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা মানব পাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে বটে কিন্তু পরোপকার সাধন করিতে সক্ষম হয় না। মানবের কর্ত্তব্য বহুবিধ। ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য পালন জন্য সংসার ধর্ম্ম পালন একান্ত আবশ্যক। ইহাতে নূতন শক্তির সঞ্চার হয় ও জীবনের মূল্য বর্দ্ধিত হয়।

ইছ্‌লামে সন্ন্যাসব্রত ও প্রেতাত্ম-জ্ঞান অবর্ত্তমান

আজ কাল আমেরিকা ও ইউরোপে Spiritualism (প্রেত বিজ্ঞান) লইয়া এক হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। বাহ্য জ্ঞান বলে কোন কোন ব্যক্তি অদৃশ্য জগতের সংবাদ লইতে সক্ষম হয় এবং পরলোকগত প্রেতাত্মার সহিত কথোপকথন করে ও তাহার সাহায্যে অন্যান্য কার্য্য সিদ্ধ করে। ইছ্‌লাম ইহা অনুমোদন করে না। ইহা দ্বারা মানবের পূর্ণত্ব লাভ হয় না। ইহা মানবকে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভে সক্ষম করে

না বা ইহাতে ঐশী শক্তির সম্যক্ বিকাশ হয় না। ইহাতে অন্তঃকরণ প্রকৃত প্রসাদ লাভ করিয়া প্রেমময়ের সহিত মনোভাব বিনিময় করিতে কৃতকার্য্য হয় না। ইহাতে মানব ইহলোক ও পরলোকের শান্তি ও আনন্দের আভাস পাইতে পারে না। ইহাতে মর্ত্ত্য স্বর্গে পরিণত হয় না। ইহাতে মানব খোদাওন্দ করিমের প্রতিবিম্ব বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। যে শিক্ষা দ্বারা এই সকল অভাবনীয় কার্য্য সম্ভবপর হয়, তাহাকেই ইছ্‌লাম বলে। এই ইছ্‌লামই চিরন্তন সত্য। ইহাই সৃষ্টি কাল হইতে প্রবহমান ও ইহার প্রসার মহাকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত।

'যে সৎপথে বিচরণ করে, সে অবিনশ্বর সুখের অধিকারী হয়' ইছ্‌লাম এই ধ্রুব সত্যের একমাত্র প্রমাণ স্থল। ইহা স্বর্গীয়, ইহা পবিত্র ;

ইছ্‌লাম সমস্ত ধর্ম্মের নির্যাস

ইহা নগণ্য ক্রীতদাসকে যে জ্ঞানে বিভূষিত করে, মহা বৈজ্ঞানিক কিম্বা বিরাট্ সম্রাট্‌ও সেই জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। ন্যায়পরতা ও সততা ইছ্‌লামের প্রধান অঙ্গ। ইহারই দ্বারা আঁ হজরত অসভ্য আরববাসীকে সত্য পথে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইছ্‌লামই "ছেরাতুল মোস্তাকিম", সত্যের দ্বার। ইছ্‌লাম যীশু, মুছা, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ সকলকে শ্রদ্ধা করিতে জানে। যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রেমময়ের কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়াছে, ইছ্‌লাম তাহাকে সম্মান করে। খোদাওন্দ করিম আমাদের উপাসনা বা দান প্রভৃতির অপেক্ষা করেন না। তিনি চান, এন্‌ছান্ পরস্পরকে সেবা করিতে শিখে। ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। অন্তঃকরণকে পবিত্র করাই মোছলেমের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইছ্‌লাম কাহারও প্রতি দুর্ব্ব্যবহার শিক্ষা দেয় না। দয়া, দান, দাক্ষিণ্য ইছ্‌লামের মূল মন্ত্র। কোন কালে, কোন দেশে, ইছ্‌লাম রাজ্যবিপ্লবের সহায়তা করে নাই। বনি ইস্রাইল প্যালেষ্টাইন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, কিন্তু আরব

তাহাকে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। মোছ্‌লেমগণ স্পেন, সুদান, ত্রিপোলি, বলকান্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে যেরূপ নৃশংস ভাবে বিনষ্ট এবং বিতাড়িত হইয়াছে, ইছ্‌লাম কোন কালে, কোন জাতির সহিত সেইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া প্রেমময়ের রাজ্যে কলঙ্কপাত করে নাই। মোছ্‌লেমগণ কার্য্য প্রণালী দ্বারা যেরূপ সাম্যনীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা তদ্রূপ হয় নাই। মোছ্‌লেমগণ ধর্ম্ম বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিলে আর্ম্মেনিয়ান, গ্রীক ও ইহুদিগণ ছোলতানের শাসনাধীন থাকিতে পারিত না। তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের ভাষা ও তাহাদের স্বাধীনতা চির তরে লোপ পাইত। এইরূপ মানব-হিতৈষণা সর্ব্ব ধর্ম্মের অনুকরণীয়। প্রত্যেক মোছ্‌লেমের বিশ্বাস যে, ইছ্‌লাম একটী চির সত্য এবং অচিরে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিবে ও আঁ হজরত সকলের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান এবং প্রশংসা প্রাপ্ত হইবেন।

খোদাওন্দ করিম তাঁহার অশেষ করুণাগুণে এন্‌ছানকে স্বীয় গুণের অনুকরণে সৃষ্টি করিয়াছেন; পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম এই সত্যতার প্রমাণ দেয়। মানব-হৃদয়ে অসাধারণ ক্ষমতার বীজ উপ্ত। কেহ এই গুণগুলিকে প্রচেষ্টা দ্বারা বিকশিত করিতে সমর্থ হয়, কেহ বা অসমর্থ থাকে; কিন্তু খোদাতায়ালা কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। তিনি কোর্‌আন্‌ পাকে বলিয়াছেন "ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তিকে আমি ভালবাসি, আমি তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়, যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তাহার দর্শনেন্দ্রিয়, যদ্দ্বারা সে দর্শন করে, আমি তাহার হস্তদ্বয়, যদ্দ্বারা সে স্পর্শ করে, আমি তাহার পদদ্বয়, যদ্দ্বারা সে বিচরণ করে।" খোদাওন্দ করিম অন্যত্র বলিয়াছেন "হে মানব কেবলমাত্র আমার নিয়ম অনুসরণ কর, এবং তুমি আমার সদৃশ হইবে এবং তৎপর বল 'হও,' এবং দেখিবে 'হইয়া গিয়াছ'।"

যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ না করে, যে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা তাঁহারই ইচ্ছার বশবর্ত্তী করিতে পারে, সেই ব্যক্তি উল্লিখিত গুণে বিভূষিত হয়। কোন এন্‌ছানের পক্ষে এইরূপ গুণবত্তা হাছেল করা অসম্ভব নহে। দয়াময়ের গুণাবলী সকল মহাপুরুষগণই কম বেশী আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার বলে যীশু বলিয়াছেন, "আমি পিতা হইতে, যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরিয়া গেলেও জীবিত থাকিবে" এবং এই শক্তির প্রেরণা হইতে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি ভগবান্, যাহারা আমার সেবা করে, তাহারা পূর্ণ পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইতে পারিবে।" যখন মক্কাবাসিগণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার শিষ্যবর্গের জীবন লইতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন আঁ হজরত মুষ্টিমেয় কঙ্কর ও বালুকা তাহাদের চক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে শত্রুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। খোদাওন্দ করিম তদুপলক্ষে কোর্‌আন্ মজিদে বলিয়াছেন, "যখন তুমি নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, খোদাতায়ালা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন" ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময় আঁ হজরতের হস্ত খোদাওন্দ করিমের হস্তের কার্য্য করিয়াছিল। কোর্‌আন্ পাকের অন্যত্র বর্ণিত আছে,"হে নবী,মানুষকে বল যে,যদি তাহারা খোদাতায়ালার প্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে চায়, তাহা হইলে তোমাকে অনুসরণ করিলে হইতে পারিবে।" এই আশ্বাসবাণী দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আঁ হজরত খোদাওন্দ করিমের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ছিলেন। তিনি মানবমধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ও তাঁহাতেই সদ্গুণাবলী পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে বীজ মানব হৃদয়ে উপ্ত, তাহা তাঁহাতেই ফলফুলে শোভিত হইয়াছিল ; সুতরাং প্রত্যেক মোছ্‌লেমের পক্ষে তাঁহার কার্য্যও তাঁহার উক্তির সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

হাদিছে কথিত আছে, খোদাওন্দ করিমের আদেশ পালন ও তাঁহার স্বষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি করাই ইছ্‌লাম। এন্‌ছানের মধ্যে যাঁহারা খোদাতায়ালার সন্তোষ সাধনের জন্য আত্মবিক্রয় করেন, তাঁহাদেরই উপর তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। যখন মানব স্বীয় ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছায় পরিণত করিতে সক্ষম হয়, যখন সে প্রকৃত যত্ন ও আনন্দের সহিত সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার উপর মহাপ্রভুর রশ্মি প্রতিবিম্বিত হয়। তখন তাহার স্বীয় আকাঙ্ক্ষা বিদায় গ্রহণ করে এবং মহাপ্রভুর আদেশ পালনই তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়। সে সৎকার্য্য সাধনে তৎপর না হইয়া তাঁহার আদেশ পালনই সুখ ও আনন্দের আকর মনে করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বর্গীয় সুখ বলিয়া আখ্যাত। এই পৃথিবীতেই মানব স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা বেহেশ্‌তী আনন্দ ও অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে। ইছ্‌লাম এন্‌ছানকে এই অসাধ্য ক্ষমতার অধিকারী করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে।

একমাত্র ইছ্‌লামই যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং সনাতন মানবীয় ধর্ম্ম, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত ফিলস্‌ফাসের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যীশুখৃষ্ট একটী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং সেই সঙ্গে একটা সামাজিক সাধারণ তন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ধন-সম্পদ্‌কে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং শিষ্যদিগকে তাহাই শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শাসনে ব্যক্তিগত ধন সাধরণ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ উক্ত সাধারণ তন্ত্র বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, একখণ্ড বিক্রীত ভূমির মূল্যের আংশিক অর্থ স্বাধিকারে রাখিবার জন্য "আনানিছ" এবং "সাফিরী" কে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সাধারণ তন্ত্র কয়দিন জীবিত ছিল? 'সর্ব্বস্ব বিক্রয় কর এবং

দরিদ্রদিগকে দান কর', কয়দিন পর্য্যন্ত মানব এই বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল ?

"যীশু প্রতিষ্ঠিত এই তন্ত্র স্থায়ী হয় নাই। স্থায়ী হইতে পারে না ; কারণ এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশাবলী কার্য্যতঃ পালন করা অসম্ভব। তাঁহার সাধারণ তন্ত্র যে কোন বহিঃপ্রভাব বা কুৎসাবাদে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে ; ইহার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা এবং অস্পূর্ণতাই উহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহার স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়াই উহা স্থায়ী হয় নাই। এই সাধারণ তন্ত্র সম্বন্ধে যীশু যেমন চরমপন্থী ছিলেন, অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার মত তদ্রূপ ছিল। 'সার্‌মন্‌ অন্‌ দি মাউণ্টে' ইহার যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। কে বলিতে পারে যে, তাঁহার উপদেশাবলী অখণ্ডরূপে প্রতিপালন করা সম্ভবপর ? দক্ষিণগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে কে তাহার বামগণ্ড ফিরাইয়া দিয়া থাকে ? কোট অপহারী তস্করকে কে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজের অন্যান্য অঙ্গবাস দান করিতে পারে ? এমন ব্যক্তি কে, যাহাকে বল-পূর্ব্বক এক মাইল ধরিয়া লইয়া গেলে সে অত্যাচারীর সঙ্গে দুই মাইল গমন করে ? ঋণান্বেষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে কে অর্থদান করিবে, ঘোর পীড়ক এবং ঘৃণাকারী শত্রুকে কে প্রেম করিবে এবং তাহার উপকার সাধন করিবে ? আগামী কল্যকার আহার্য্য, পানীয় এবং পরিধেয় বিষয়ে কে নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে ? কোন্‌ জ্ঞানী ব্যক্তি দুর্দ্দিনের জন্য সংস্থান করিয়া না রাখেন ? তাঁহার এই সমস্ত আদেশের কোন একটীও আমরা সাংসারিক জীবনে প্রতিপালিত হইতে দেখিতে পাই না। অন্যদিকে এই আদেশের সংখ্যা এত বহুল যে, সংখ্যাধিক্যই এগুলির পালন চেষ্টাকে আরও অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। যীশু প্রচারিত এই আদর্শ ব্যক্তিগত ভাবে সক্রেটিস বা তাঁহার দ্বারা

প্রতিপালিত হইতে পারে এবং ইঁহারা অত্যন্ত প্রশংসার পাত্র, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে মানবের পক্ষে ইহা অসম্ভব। তাঁহার স্থাপিত সাধারণ তন্ত্র যে প্রকার নিঃশেষ ও লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার কল্পিত ও ঈপ্সিত জগৎও তেমনি সম্পূর্ণ অনাগত রহিয়া গিয়াছে।”

ইছ্‌লামের ব্যাপ্তিও ইছ্‌লামের প্রভাব খৃষ্টধর্ম্ম হইতে অত্যধিক। ইছ্‌লাম স্থায়ী আদর্শ স্থাপন করিয়া ইহার পূর্ণত্বের সাক্ষ্য দেয়। জাগতিক সর্ব্ব ধর্ম্ম মধ্যে ইছ্‌লাম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম। এই ইছ্‌লাম ধনী ও দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। সকলেই ইহার ছাঁচে আপনাকে গঠন করিতে সক্ষম। ইছ্‌লাম কেবল এই নীতি সমষ্টি কল্পনা করিয়াই স্থির থাকে নাই, উহার প্রয়োগে আদর্শ জীবন গঠন করিতেও মোছ্‌লেমকে সুযোগ প্রদান করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের তুলনায় ইছ্‌লামের উৎকৃষ্টতা জনৈক খৃষ্টান লেখক দ্বারা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে, “ইছ্‌লামের নীতি বাক্য সমূহ অতীব প্রশংসার্হ এবং ইহাও দ্রষ্টব্য যে, ইছ্‌লাম এই সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সমস্ত মোছ্‌লেম দ্বারা ইহা পালন করাইতে সমর্থ হইয়াছে।’ [হার্‌বার্ট লেক্‌চার]

আজ ইউরোপে বহু জ্ঞানী এবং খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি পরিণত বয়সে ইছ্‌লাম গ্রহণ করিতেছেন। একটু অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে, ইছ্‌লাম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম না হইলে বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জ্ঞানাভিমানী ইউরোপে কিছুতেই উহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত না। ইছ্‌লাম সমগ্র মানব জাতিকে সমান অধিকার প্রদান করে। কোর্‌আন্‌ বলিয়াছেন:—“নিশ্চয়ই তাহারা যাহারা বিশ্বাসী (অর্থাৎ মোছ্‌লেম) এবং তাহারা যাহারা ইহুদি ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম এবং ছাবায়ী ধর্ম্ম অনুসরণ করে, ইহাদের মধ্যে যাহারাই সৃষ্টিকর্ত্তার উপর এবং শেষদিনের উপর বিশ্বাস

করে এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাদের নিকট খোদার দিক্‌ হইতে প্রতিদান আসিবে এবং তাহাদের ভয়ের কারণ থাকিবে না কিংবা তাহারা দুঃখিত হইবে না।" (কোর্‌আন্‌ ছুরা—২, ৫৯ আয়েত) ইছ্‌লাম খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় আধ্যাত্মিকতা ও ইহুদি ধর্ম্মের ন্যায় নৈষ্ঠিকতা উভয়েরই ব্যবস্থা করে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, "তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য পয়গম্বর ও উপদেষ্টা প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি কোন জাতির প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন না, যাহাদের জন্য পয়গম্বর প্রেরিত হয় নাই।" তিনি প্রত্যেক মানবের উপর দায়িত্ব স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং প্রত্যেক জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আদর্শ পুরুষও প্রেরণ করিয়াছেন। আঁ। হজরতের জীবন প্রত্যেক কাজের জন্য আমাদের আদর্শ স্বরূপ। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন, তেমনি জবরদস্ত ছুফীও ছিলেন। তিনি রোজা, নামাজ প্রভৃতি বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করিতেন। আবার সময় সময় সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একাকী গৃহমধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া একাগ্রচিত্তে তন্ময়ত্ব লাভের জন্য সযত্ন থাকিতেন। তিনি কেবল বেহেশ্‌ত লাভ জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করেন নাই, সৃষ্টিকর্ত্তার সান্নিধ্য লাভই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনে কোর্‌আনের মহতী বাণীর পোষকতা করিয়াছিলেন। ইছ্‌লাম শরীর ও আত্মা উভয়কে লক্ষ্য রাখে। প্রকৃত মোছ্‌লেম তিনি, যিনি ইছ্‌লামের সম্পূর্ণ বিধি অনুসরণ করেন ও তৎসহ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন করেন। আঁ। হজরতের সময় ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাদ্বয়ের শাসনকালে মোছ্‌লেম রাজ্য যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাও সেইরূপ পোষকতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের পার্থিব রাজত্ব স্বর্গীয় গৌরব লাভ করিয়াছিল।

ইছ্‌লাম কোন নূতন ধর্ম্মের নাম নহে। হজরত নূহ্‌, হজরত মুছা, হজরত ইছা সকলেই ইছ্‌লামেরই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইয়াকুব উভয়েই তাঁহাদের পুত্রদের উপর এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, "হে আমার পুত্রগণ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য এই ধর্ম্ম পছন্দ করিয়াছেন; অতএব যে পর্য্যন্ত তোমরা মোছল্‌মান না হও, সেই পর্য্যন্ত মরিও না।" (কোর্‌আন্‌—২,—১৩০—১৩২) উক্ত বাণী দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তদানীন্তন ধর্ম্ম ইছ্‌লাম ছিল! হজরত মুছা যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এখনও মোছ্‌লেম জগৎ তাহা পালন করিতেছে। নিম্নে প্রাচীন বাইবেলের ২য় পুস্তক হইতে কয়েকটী আদেশ উদ্ধৃত হইল :—

ইছ্‌লামের প্রাচীনত্ব

"আমার সমক্ষে তোমরা অন্য দেবতা মানিবে না, তোমরা কোন খোদিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে না, কিম্বা স্বর্গীয় কোন বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করিবে না। তোমরা তাহাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিবে না কিম্বা তাহাদের সেবা করিবে না। তোমরা চুরি করিবে না, তোমরা পরস্ত্রী গমন করিবে না। তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর গৃহের উপর লোভ করিবে না।"

পূর্ব্বোক্ত সকল আদেশগুলিই ইছ্‌লাম অনুমোদিত। হজরত ইছা বলিয়াছেন, "পরন্তু আমি তোমাদিগকে সত্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা তোমাদের পক্ষে উপযোগী যে, আমি চলিয়া যাই, যেহেতু যদি আমি চলিয়া না যাই, তাহা হইলে শান্তিবাদ ঘোষণা-কারক তোমাদের নিকট আসিবে না। কিন্তু যদি আমি যাই, আমি তাঁহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইব" (John—১৬—৭)। ইহা দ্বারা বাইবেল আঁ। হজরতের আগমন বার্ত্তার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন। ইছ্‌লাম খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ণতা আনয়ন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বাইবেলের উপর ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না। যেহেতু এযাবৎ গছ্‌পেলের (যীশুখৃষ্টের শিষ্য চতুষ্টয় দ্বারা লিখিত জীবনীর) ১৫০০০ পাঠ-ভেদ বহির্গত হইয়াছে। পাদরিগণ যে গছ্‌পেল চতুষ্টয় প্রকৃত বলিয়া উল্লেখ করেন, তদ্ব্যতীত প্রাচীনকালে শত শত গছপেল লিখিত হইয়াছিল, যাহা অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থেরই প্রায় এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কেবলমাত্র মোছ্‌লেম ধর্ম্মগ্রন্থ কোর্‌আনই এযাবৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মোছ্‌লেমগণ হজরত ইছাকে সম্মান করে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে ইছ্‌লাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম মনে করে না। কেবল পাদরিগণ খৃষ্টধর্ম্মের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে ইছ্‌লাম হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এই কথা বিশ্বাসের অযোগ্য যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সন্তুষ্টিসাধন জন্য তাঁহার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে [যীশুকে] হত্যা করিয়াছিলেন। সর্ব্বময়ের উপর ক্রোধের আরোপ করা অসমীচীন। ইহা খৃষ্টধর্ম্মের শিক্ষা নহে, বহু প্রাচীনতম কোন ধর্ম্মের লুপ্তপ্রায় ভাবাবশেষ হইবে।

ইছ্‌লামের একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে, আঁ হজরতের শিষ্যবর্গ দীক্ষার প্রথম দিবস হইতে আজীবন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল কিন্তু যীশুর শিষ্যবর্গ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুর নিকট ধরাইয়া দিয়াছিল ও কতিপয় রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে তাঁহার জীবন বিক্রয় করিয়াছিল। মুছার শিষ্যবর্গ তাঁহার উপর যুদ্ধ কার্য্যের ভার চাপাইয়া স্বয়ং নিরপেক্ষ থাকিত।

গিবন্ সাহেব খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন, "খৃষ্টানদিগের কূট ত্রিত্ব ও অবতারবাদ একত্ববাদের বিরোধী; স্পষ্টতঃ তাহারা তিনটী দেবতার অবতারণা করে এবং মানব-যীশুতে ঈশ্বরের আরোপ করে।

মোহাম্মদের (দঃ) ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ্যতার সন্দেহ হইতে মুক্ত এবং কোর্আন্ একত্ববাদের সমুজ্জ্বল প্রমাণ।”

ইহুদী ও খৃষ্টানগণের উপর একত্ববাদের আদেশ আছে। ইহার পোষকতায় নিম্নে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত হইল:—“শুন, হে ইস্রাইল! প্রভু আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা—একমাত্র প্রভু।” (Deuteronomy VI.) আমি প্রভু এবং আর কেহ নহে। আমি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নাই (Isaiah XIV. 5); যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন “শুন, হে ইস্রাইল! আমাদের প্রভু এক”, সে তাহাকে বলিল “আপনি সত্য বলিয়াছেন। প্রভু এক এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ নাই।”

এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, আঁ হজরতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রেরিত ধর্ম্মগ্রন্থে একত্ববাদের উল্লেখ আছে। হজরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদিগের নবী ছিলেন। উহারা একত্ববাদী ছিল এবং মুছাকে কখনও উপাস্য বলিয়া পূজা করিত না। খৃষ্টানগণই কেবল যীশু খৃষ্টে দেবত্ব আরোপ করিয়াছিল। আঁ হজরত একত্ববাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

খোদাওন্দ করিমের অসীম মাহাত্ম্য, তাঁহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব ও অদ্বিতীয়তা সম্বন্ধে ছুরে এখলাছ অতি সুন্দররূপে সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার প্রত্যেকটি আয়েত একত্বের পরিচায়ক। আমার জনৈক বন্ধু ছুরে এখ্লাছের যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে একত্বের সূক্ষ্মতত্ত্বটি অতি বিশদরূপে সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল:—

“চির দয়িত, বাঞ্ছিত, সঙ্গী নাহি,
আদি নাহি তব, অন্ত নাহি।

চির সত্য, স্বপূর্ণ, দৈন্য নাহি,
পুত্র নাহি তব, কন্যা নাহি।
চির বর্ত্তমান তুমি, নাস্তি নাহি
জন্ম নাহি তব, মৃত্যু নাহি,
চির একক, মালেক, তুল্য নাহি,
উপমাহীন তুমি, তোমা চাহি।"

(মোয়াজ্জেম হোছায়েন)

প্রেমময়তাও একত্বের একটী অঙ্গ। মোছ্লেম প্রকৃতিপটে প্রেমশিক্ষা করিয়া প্রেমময়ের প্রেমময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। অন্য কোন ধর্ম্ম প্রেমিক ও প্রেমময়ের সান্নিধ্য এত সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই। কোর্আনের প্রতি ছুরা খোদার রাহমানিয়তের সাক্ষ্য দেয়। মোছ্লেমের প্রতি কার্য্যের প্রারম্ভে প্রেমময়ের অপরিমিত করুণার স্মৃতি বিদ্যমান। পূর্ণ কোর্আনের সারতত্ত্ব, ছুরে ফাতেহায় সংক্ষেপে বর্ণিত। এই ছুরা একত্বের অন্যতম দৃষ্টান্ত। উক্ত বন্ধুবর বঙ্গভাষায় উহারও ভাবানুবাদ করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদটি পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতেছি।

প্রভু পরাৎপর, বিশ্ব চরাচর, দ্যুলোক ভূলোক পালক হে।
অশেষ কৃপাবান, রহিম রহমান, ভীষণ হাসর মালেক হে॥
নাই নাই কেহ নাই, তুহারি বন্দনা গাই,
তুহারি করুণা কণা, তুহারি নিকটে চাই,
হুর গেল্মান, জেন্ এন্ছান, তব জয়গান গায়ক হে।
প্রভু পরাৎপর, অশেষ গুণধর, বিস্তৃত বিশ্ব নিয়ামক হে।
শ্রেষ্ঠ কর্ণধার, ভ্রান্তি কলুষহর, শ্রেষ্ঠ পথ-জন-নায়ক হে।

চলিয়ে যে পথে, কোটী মহাপ্রাণ
লভেছে তোমার করুণাদান,
কৃপাচিহ্নিত সুগম সুপথ কর জীবন-পথ মম পালক হে।
পাপ তমসাবৃত, করুণা বঞ্চিত, অধমে করো না খালেক হে।

খোদাওন্দ করিমের অনন্ত প্রেম, অনন্ত রাহ্‌মানিয়ত, অনন্ত করুণা কেবল যে মানব অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত তাহা নহে; ইহার প্রসার পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, এক কথায় জড় ও অজড়ে বিস্তৃত। এই সুক্ষ্মভাব অন্য ধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয় না। তাপসকুল-শ্রেষ্ঠ মওলানা জালালউদ্দিন রুমী ইহাকে মহাকর্ষণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই মহাকর্ষণ প্রভাবে মানব হৃদয়ে প্রেম বীজ উপ্ত হয়; পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গে প্রীতিভাব বিস্তৃত হয় ও অণুপরমাণু মধ্যে সংহতি সৃষ্ট হয়। এতৎ সম্বন্ধে মছ্‌নবী শরিফের নিম্নাংশ দ্রষ্টব্য:—

"প্রাকৃতিক বিধানে জগতের সমুদয় উপাদান সংযোজিত এবং একটী অপরটীর প্রতি প্রেমভরে আকৃষ্ট।" অন্যত্র উহার পোষকতায় মওলানা সাহেব লিখিয়াছেন, "জগতের প্রত্যেক বস্তু অন্যের সহিত সম্মিলনপ্রয়াসী যথা—চুম্বক লৌহখণ্ড, তৃণ লতার প্রতি আকৃষ্ট।" বিজ্ঞান যে সকল তথ্য অদ্যাপি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই, কোর্‌আন্‌এ তাহার আভাষ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক বলেন, নৈসর্গিক কারণে কালে পৃথিবী বিধ্বস্ত হইবে। কোন গ্রহ বা উপগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া উহাকে মহা বলে আকর্ষণ করিবে এবং উহার ফলে পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। উহাদের প্রতিঘাতে যে তাপ উৎপন্ন হইবে, তদ্দ্বারা পৃথিবীর বহু অংশ ভস্মীভূত হইবে। মহাপ্রলয়ের সত্যতা সম্বন্ধে কোর্‌আন্‌ পাকে এইরূপ বর্ণিত আছে, "মহা সংঘর্ষ, সে মহা সংঘর্ষ কি এবং সেই সংঘর্ষে কি হইবে বলিয়া তোমরা মনে কর? সেই দিন মানুষ

ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে এবং পর্ব্বত সমুহ হইবে যেন বিধূনিত পশম, তখন ঐ ব্যক্তি যাহার (সৎকার্য্যের) ওজন ভারী হইবে, সেই সুখের জীবন যাপন করিবে এবং যাহাদের (সৎকার্য্যের) ওজন হাল্কা হইবে, তাহারা হাবিয়ার উদরস্থ হইবে এবং তোমরা কি জান, সে (হাবিয়া) কি? একটী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি" (আমপারা)। ইহাও কোর্‌আনের অলৌকিকত্বের পরিচায়ক। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সপ্তম শতাব্দীর প্রেরিত কোর্‌আন্‌ বাণীর বিরুদ্ধবাদী নহে। খগোল শাস্ত্রের কুটনিয়ম, যাহা এখনও বৈজ্ঞানিক উদঘাটন করিতে সক্ষম হন নাই, তাহাও বহু পূর্ব্বে কোর্‌আন্‌ আয়েতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের জ্ঞান সসীম। তাই অসীমের বর্ণনা এখনও সম্যগ্‌ বোধ করিতে সক্ষম হই নাই। জ্ঞানের প্রসার যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই কোর্‌আনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে। কোর্‌আনে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বিজ্ঞান তাহা ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করিয়া প্রশংসনীয় হইবে। সৃষ্টি কর্ত্তার সহিত আবিষ্কার কর্ত্তার সম্বন্ধ সর্ব্বদাই অনুকূল। যে ধর্ম্মে তাহা প্রতিকূল মনে করে, সেই ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। তাই আবার বলি, কোর্‌আনের সত্যতা ও পূর্ণতা অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কোর্‌আন্‌ মহাপ্রভুর প্রেরিত এবং ইছ্‌লাম ইহারই শিক্ষা; তাই সর্ব্বকালের জন্য, সর্ব্বলোকের জন্য ইছ্‌লাম সত্যবাণী প্রদান করিতে থাকিবে। কোর্‌আনের অলৌকিকত্ব সহজেই প্রামাণ্য। এযাবৎকাল কোন সাহিত্যিক বা কবি ইহার অতুল সৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতে সক্ষম হন নাই। লক্ষাধিক আয়েতের মধ্যে একটী আয়েতকেও কোন আলেম বা কৃতবিদ্য ব্যক্তি এযাবৎ সমালোচনার গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারেন নাই। একবাক্যে সকলেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার ভাব যেমন

কোর্‌আনের অলৌকিকত্ব

অলৌকিক, ভাষাও তদ্বৎ। জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়কেই ইহা মহাশিক্ষা প্রদান করে। এযাবৎ এই পবিত্র গ্রন্থের একটী বাক্য বা একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। আঁ হজরতের নবুয়ৎ হইতে এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোর্‌আন্ সর্ব্বশ্রেণীর মোছ্‌লেম দ্বারা সমভাবে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। ইহা কোর্‌আনের পবিত্রতার অন্যতম নিদর্শন। ইহার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে খোদাওন্দ করিম আঁ হজরতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "অবিশ্বাসী লোকগণ কি বলিতে চাহে যে, উহা (কোর্‌আন্) তোমারই রচনা সম্ভূত? তবে তাহাদিগকে বল, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তবে সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা উহার সমকক্ষ একটী ছূরাও রচনা করে।" অবিশ্বাসিগণ বলিতে চান্, কোর্‌আন্ মজিদ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মস্তিষ্ক প্রসূত। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইহার ভাষার পারিপাট্য, বাক্য বিন্যাসের সৌন্দর্য্য মানুষের সাধ্যাতীত। গদ্য রচনার মধ্যে এইরূপ কাব্যের সমাবেশ, সাহিত্যের এইরূপ রস ও মাধুর্য্য জগতে কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। অবিশ্বাসিগণ যদি কোর্‌আন্ পাকের ভাষার সহিত হাদিছ শরিফের ভাষার তুলনা করেন, তবে সহজেই বুঝিবেন যে, একটী মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ও অপরটী মানবের সাধ্যের অতীত; একটী লৌকিক, অপরটী অলৌকিক। উভয়ই একই মুখ হইতে নিঃসৃত অথচ উভয়ের পার্থক্য অসীম।

সমগ্র কোর্‌আন্ শরিফে একশত চৌদ্দটী ছুরা আছে এবং উহাতে বিছ্‌মিল্লা শরিফ ১১৪ বার লিখিত আছে। ইহাই বিছ্‌মিল্লা শরিফের বিশেষত্বের পরিচায়ক। মোছ্‌লেমগণ প্রত্যেক গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই বিছ্‌মিল্লা পাঠ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা মহাশক্তিশালী আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ইহা প্রত্যেক মোছলেমকে প্রতিদিন

বিছ্‌মিল্লা শরিফ সমগ্র কোর্‌আনের নির্য্যাস

বহুবার আল্লাহ্ তায়ালার একত্ব ও মাহাত্ম্য স্মরণ করাইয়া দেয়। "রহমান" অর্থে সৃষ্ট জীবের প্রতি অসীম প্রেম ও অনুগ্রহকারী বুঝায়। তিনি প্রেমময়, জীবের প্রতি তাঁহার প্রেমের অবধি নাই। তাঁহার অনুগ্রহ জীবের কার্য্য ফলের উপর সীমাবদ্ধ নহে। তিনি অতি নিকৃষ্ট জীবকেও আশাতীত অনুগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত করিতে পারেন। পুনরায়, তিনি রহিম অর্থাৎ দয়াময়। তাঁহার দয়া কেবল কার্য্যফলের উপর নির্ভর করে না, তিনি কেবল ন্যায়বান নহেন। যাহাকে আমরা ন্যায়ের চক্ষে দয়ার উপযোগী মনে না করিব, তিনি তাঁহার অনন্ত ক্ষমতা বলে তাহার প্রতিও দয়া করিয়া তাঁহার অনন্ত ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন। তিনি যে প্রেমময় ও দয়াময়, তাহা প্রতি মোছ্‌লেম বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। আল্লাহ্ তায়ালার এই দুইটী গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই প্রতি কার্য্যে মোছ্‌লেম ইহারই আবৃত্তি করে। বিছমিল্লা শরিফ মহাশক্তিশালী আল্লার একত্ব, প্রেমময়ত্ব ও দয়াময়ত্ব একাধারে শিক্ষা দেয়। ইছ্‌লামেরও ইহাই প্রধান শিক্ষা। এই বিছমিল্লা শরিফের স্থান অত্যুচ্চ। ইহা কোর্‌আনের মাহাত্ম্যের প্রধান পরিচায়ক।

বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ তাঁহার "লাইফ অব্ মোহাম্মদ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং বর্ণজ্ঞান শূন্য ছিলেন অথচ এমন এক গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা একাধারে কাব্য, দৈনন্দিন উপাসনা, ব্যবস্থাপুস্তক ও বিরাট্ ধর্ম্মশাস্ত্র। অদ্যাপি পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ মানব ইহাকে অলৌকিক সাহিত্য-রস, জ্ঞান এবং সত্যের ভাণ্ডার বলিয়া সম্মান করিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রধান অলৌকিকত্ব এবং তিনি নিজে ইহাকে 'স্থায়ী অলৌকিকত্ব' আখ্যা দিয়াছেন, ইহা সত্যই অলৌকিক।"

পপুলার এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার ৮ম খণ্ডে ৩২৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে, "কোর্‌আনের ভাষাকে সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ আরবী বলা হইয়া থাকে

এবং বাক্য বিন্যাস কৌশলে ও কবিত্ব সৌন্দর্য্যে ইহা অননুকরণীয়। ইহার নীতি শিক্ষা অতি সুন্দর। সম্যগ্‌রূপে ইহার অনুসরণ করিলেই ধর্ম্ম জীবন যাপন করা যায়।"

ডীন্ ষ্টান্‌লি তাঁহার 'ইষ্টার্‌ণ চার্চ্চ' গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি, বাইবেল খৃষ্টানদিগের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মোছ্‌লেমগণের উপর কোর্‌আনের প্রভাব তদপেক্ষা অনেক বেশী।"

ডেভিড আরক্‌হার্ট তাঁহার 'স্পিরিট অব্ দি ইষ্ট' নামক গ্রন্থের মুখপত্রে ইছ্‌লাম প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "ইছ্‌লাম মানবকে কোর্‌আন্ দ্বারা একাধারে একখানি ব্যবস্থা সংহিতা এবং একটী সুগঠিত সাম্রাজ্য শাসন প্রণালী দান করিয়াছে।"

এইরূপে ইউরোপীয় মনীষী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একবাক্যে ইছ্‌লামের মূলমন্ত্র কোর্‌আনের প্রশংসা করিয়াছেন।

ইছ্‌লামের লক্ষ্য এবং তাহা সাধনের বিভিন্ন পন্থা

জীবনের লক্ষ্য কি এবং কি উপায়ে উহা সাধন করা যায়, এই সমস্যা লইয়া তার্কিকগণ মহাব্যস্ত। বিভিন্ন পন্থী বিভিন্ন উদ্দেশ্য স্থির করেন এবং বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করেন। কোর্‌আন্ মজিদে এই জটিল প্রশ্নের অতি সহজ সমাধান বর্ণিত আছে। "আমি জেন ও এন্‌ছান পয়দা করি নাই এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যে, তাহারা আমাকে জানুক এবং আমার এবাদত করুক।" (৫১-৫৬)। আল্লাহ্‌তায়ালার সত্যজ্ঞান ও এবাদত মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা যাহা কিছু বলি বা যাহা কিছু করি, কেবল তাঁহারই উদ্দেশ্যে করা উচিত। হাস্তীর বর্জ্জন হইলেই নির্ভর আসে এবং পূর্ণ নির্ভর আসিলেই পূর্ণ জ্ঞান সম্ভব হয় ও প্রেম উথলিয়া উঠে। প্রেমের মাত্রা যত অধিক হইবে, এবাদতও তত মধুর

লাগিবে। তাঁহার প্রেম লাভ করাই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকৃত সুখই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ধন, পদ, রাজত্ব, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য প্রকৃত মানসিক আনন্দ আনয়ন করিতে পারে না। যতই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, ততই প্রেমময়ের সহিত মিলনের সুযোগ ঘটে, হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় এবং প্রিয়তম তাঁহার উপযুক্ত স্থান অধিকার করেন। এই আনন্দ উপভোগের জন্য, এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় নির্দ্ধারিত আছে। নিম্নে ইহার কয়েকটী উল্লেখ করা হইল :—

১। সৎপথ অনুসরণ ও সৎকার্য্য সাধন। কর্ম্মিগণ এই পথই সাধারণতঃ অবলম্বন করেন।

২। প্রকৃতি-মধ্যে মহাপ্রভুর সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও তাঁহার একত্বের উপলব্ধি। প্রেমিকতা লাভ করিতে হইলে প্রকৃতি হইতে এই শিক্ষা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা আপনাকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। প্রেমিক সৃষ্টিকর্ত্তাকে কখনও নির্দ্দয়, অক্ষম, দুর্ব্বল আখ্যা দান করে না। যে সমস্ত ধর্ম্মে সৃষ্টিকর্ত্তাকে এইরূপ আখ্যা দেওয়া হয়, সেই সব ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। ইছ্‌লাম খোদাওন্দ করিমের একত্ব ও প্রভুত্ব যেরূপ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্ম তদ্রূপ হয় নাই। প্রত্যেক রূপের মধ্যে ইছ্‌লাম অরূপকে অনুসন্ধান করে। প্রত্যেক ভেদের মধ্যে ইছ্‌লাম অভেদকে দেখিতে পায়।

৩। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষার মধ্যে মঙ্গল অনুসন্ধান অন্যতম পন্থা। খোদাতায়ালার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়ার পরিধি যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই মানব তাঁহার নৈকট্য সাধন করিতে সক্ষম হয়। যে মানব পার্থিব পরীক্ষার মধ্যে অমঙ্গল দেখে, সে কখনও মঙ্গলময়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না। যিনি মঙ্গলের আকর, তাঁহা হইতে অমঙ্গল অসম্ভব। তাই

বলি, যিনি প্রকৃতির মধ্যে যতই মঙ্গল দেখিবেন, বাহ্য অমঙ্গলের মধ্যে যতই মঙ্গল অনুভব করিবেন, তিনি ততই প্রেমলাভে সক্ষম হইবেন।

৪। উপাসনা আর একটী উপায়। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "আমাকে ডাক, আমি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিব।"

৫। মোজাহেদা—ইহা দ্বারা মানব আত্মত্যাগ শিক্ষা করে। যিনি খোদার রাহে যতই ধন, বল, জীবন উৎসর্গ করিবেন, তিনি ততই প্রেমময়ের সান্নিধ্য অনুভব করিবেন।

৬। সর্ব্বপ্রকার বিপদের মধ্যে অচল অটল থাকা আর একটী উপায়। খোদাতায়ালার প্রতি বিশ্বাস যতই দৃঢ় হইবে, ততই মুছিবতের মধ্যে মানুষের স্থিরতা আসিবে, ভয় কমিবে ও প্রকৃত আনন্দের দ্বার খুলিবে। "হে মানব! সকল প্রকার মঙ্গল খোদাতায়ালা হইতে আগত হয় এবং যে বিপদ্ তোমার উপর আপতিত হয়, তাহা তোমা হইতে আগত।" মানব শৈশবাবস্থায় নিষ্পাপ থাকে; ক্রমে পারিপার্শ্বিক বস্তু দ্বারা সে প্রলুব্ধ হইতে থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত ভুল ভ্রান্তি আসিতে থাকে। পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব তাহাকে যে ভাবে আকর্ষণ করে, সে তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ক্রমে শৈশবকালীন নিষ্পাপ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম দীক্ষা দ্বারা সে পুনরায় অমঙ্গলের আকর্ষণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। যে যতই ইছ্‌লামের নীতি সমূহের অনুবর্ত্তন করে, সে ততই উচ্চতর মানবত্ব লাভ করিতে পারে। যে যতই পার্থিব বৃত্তিনিচয়কে দমন করিতে পারে, সে ততই পাপ হইতে নিরস্ত থাকিতে পারে, সে ততই শ্রদ্ধার পাত্র হয়। আঁ হজরত ইছ্‌লামের নীতি সমূহ স্বীয় জীবনে সম্যক্ প্রতিপালন করিয়া আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী অতিবাহিত হইল, এখনও তিনি সর্ব্বশ্রেণী-মধ্যে যেরূপ সম্মানিত, কোন মহাপুরুষ তাঁহার জীবনকাল মধ্যে সেরূপ উচ্চস্থান

অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। মানব স্বীয় কার্য্য দ্বারাই অমঙ্গল খরিদ করে, আবার ইচ্ছা করিলে স্বীয় জীবন সে জগতের মঙ্গল সাধনেও উৎসর্গ করিতে পারে। আমাদের মঙ্গলামঙ্গলে সকল সময় খোদাতায়ালা সহানুভূতি করেন। মানবের মঙ্গলে তিনি সুখী হন এবং অমঙ্গলে দুঃখিত হন। কোন অবস্থাতেই মানবের প্রতি তাঁহার করুণার দ্বার রুদ্ধ হয় না; করুণাময় কখনও মানবকে অভিসম্পাত করেন না। আমরা স্বীয় কুকার্য্য ফলেই দুঃখের অধিকারী হই। ইছ্লাম আল্লাহ্ তায়ালাকে অত্যাচারী আখ্যা প্রদান করে না। তিনি মানবের পরম দয়ালু এবং প্রিয়তম বন্ধু। পৃথিবী হইতে অমঙ্গল অপসারিত হইলে মঙ্গল সুভোগ্য হইত না। আমরা প্রলোভনের তাড়না হেতুই চরিত্রকে সর্ব্বদা সুগঠিত করিতে প্রয়াস পাই। প্রলোভন না থাকিলে, আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে আত্মার জয় পরাজয়ের অবসর ঘটিত না। এই উভয়ের মিশ্রনই আত্মপ্রসাদের হেতু। ইছ্লামের প্রধান শিক্ষা এইযে, মানব প্রবৃত্তি-নিচয়ের আকর্ষণ সত্বেও করুণাময়ের করুণা লাভে সমর্থ হইতে পারে; অমঙ্গল স্পৃহাকে দমন করিয়া প্রকৃত আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইতে পারে।

যখন মানুষের ধন, মান, জীবন বিপন্ন হয়, তখনই তাহার স্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি যত অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার পরীক্ষাও তত কঠিন হইয়াছে। নানাপ্রকার বিপদে বেষ্টিত থাকিয়াও যিনি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনিই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন, তাহার উপর খোদাতায়ালার অনুগ্রহ অজস্রধারে বর্ষিত হয়। যিনি যত তাঁহার রাহে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন, তিনি ততই কৃত-কৃতার্থ হন। প্রকৃত প্রেমিক বিপদ ও

আনন্দের সহিত আহ্বান করেন। তাঁহার নিকট প্রেমময়ের পরীক্ষা অতি আদরণীয় অনুভূত হয়। তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা মহা পাপ মনে করেন। নির্ভরই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠে। প্রেমিক বিপদ দেখিলে পশ্চাৎপদ না হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হন এবং কঠিনতর পরীক্ষার জন্য প্রতীক্ষা করেন। কোরান মজিদে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,—"খোদাতায়ালার প্রকৃত প্রেমিক তাঁহার কাছে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন এবং তাঁহারই আনন্দকে প্রতিদান স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা অতিশয় দয়াবান।" (২-২০৩)

৭। স্বপ্নাদেশ, অহি ও এল্‌হাম (১) দ্বারা খোদাতায়ালা এন্‌ছানকে সময়ে সময়ে গূঢ় বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার পথের পথিককে উৎসাহিত করেন, বিপদের মধ্যে সাহস দিয়া অগ্রসর হইতে শক্তি দান করেন। পথিক তাঁহার সহায়তা পাইয়া স্থির চিত্তে স্বীয় লক্ষ্য সাধন করিতে তৎপর থাকেন। কোন প্রকার অমঙ্গল তাঁহাকে সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না।

৮। আদর্শ পুরুষের সঙ্গলাভ ও তাঁহার কার্য্যাবলীর অনুসরণ। সততায় যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তাহার অনুসরণ করা সকলের

(১) দুই প্রকারে মানবের নিকট আল্লাতায়ালার অণুভূতি আসে। মনের মধ্যে স্বতঃই জ্ঞানের উদয় হয় কিংবা পয়গম্বর যোগে আদেশ প্রেরিত হয়। প্রথম অবস্থাকে এল্‌হাম এবং দ্বিতীয়কে অহি বলা হয়। আওলিয়াগণের উপর এল্‌হাম হইয়া থাকে। এল্‌হাম ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান হইতে বিভিন্ন। ইহা ধ্যান বা একান্ত চিন্তার ফল। ইহা কিরূপে কখন কোথা হইতে আসে, তাহা বলা কঠিন। ইহা আল্লাতায়ালার অসীম অনুগ্রহের বিশিষ্ট দান। অহি ফেরেস্তার দ্বারা প্রেরিত হয়। ফেরেস্তাকে পয়গম্বর দেখিতে পান। উহা মানব জাতির জন্য আইসে। এল্‌হাম কেবল গ্রহীতার নিকট অব্যক্ত ভাবে প্রেরিত হয়।

সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্য করুণাময় তাঁহার অনন্ত করুণাবলে কাল ও স্থানভেদে বিভিন্ন মহাপুরুষ অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইঁহারা স্বীয় দৃষ্টান্ত-দ্বারা মানব হৃদয়ে নূতন বলের সঞ্চার করেন। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, সকলেরই জীবন বিপদ-সঙ্কুল ছিল। তাঁহারা কঠিন মুছিবতের মধ্যে যেরূপ স্থিরতা ও একাগ্রতা দেখাইয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। আঁ হজরত প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার জীবনী একটা মহাগ্রন্থ। উল্লিখিত প্রণালীগুলির পরিণতি তাঁহার জীবনে সম্যক্ লক্ষিত হয়। প্রত্যেক মোছ্লেমের পক্ষে তাঁহার গুণে গুণবান হওয়া উচিত। যিনি তাঁহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, মুক্তি বা শাফায়াৎ তাঁহার জন্য স্থির নিশ্চয়। যিনি মোছ্লেমের নাম লইয়া তাঁহার উক্তি বা কার্য্যের অনুসরণ না করেন, যিনি কোর্‌আন ও হাদিছকে জীবনের মূল মন্ত্র করিয়া না লন, তিনি প্রকৃত কৃতিত্ব লাভ করিতে অক্ষম। ইছ্লাম আঁহজরতেই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

শিক্ষকের কার্য্য দ্বারাই তাঁহার উপদেশ সহজে উপলব্ধ হয়। পয়গম্বর ব্যতীত শুধু কোন পুস্তক দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী ঐশী বাণীর সামঞ্জস্য ও সার্থকতা সম্পাদন করে। মহাপুরুষদিগের জীবনী অনুবর্ত্তিগণের বিশেষ উপাদেয়। হজরত ইছা (আঃ) হজরত মুছা (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরগণ পৃথিবীতে আসিয়াছেন,কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে পূর্ণজীবনী মানবের হস্তগত হয় নাই। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রত্যেক অবস্থা সকলেরই চক্ষের সমক্ষে ভাসমান। কোর্‌আনের যে কোন আয়েত, যে কোন আদেশ তাঁহার জীবনীতে, তাঁহার কার্য্যে বা উক্তিতে সর্ব্বদা প্রমাণিত হইয়াছে মোছ্লেম যে কোন শিক্ষার জন্য তাঁহার জীবনীকে আদর্শ করিতে

পারে। অন্য কোন মহাপুরুষ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঈদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়।

মনুষ্য শরীর ও আত্মার সমবায়। শরীর আধার ও আত্মা আধেয়। আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। শরীর আত্মার অবয়ব মাত্র। শরীর ক্ষণস্থায়ী, আত্মা চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর শরীরের পতন হয়, আত্মার পতন হয় না। অতি পুরাকালে সক্রেটিশ, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক জোরষ্টার, বুদ্ধ, কন্‌ফিউসাস্‌, আঁ। হজরত সকলেই এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই মানুষ বুঝিতে পারে যে, শরীর কেবল বস্তু সমষ্টি নহে। প্রস্তর খণ্ড যেমন বস্তু সংহতি দ্বারা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, মনুষ্য শরীর তদ্রূপ নহে। কেবলমাত্র কার্ব্বন. অক্সিজেন ও লাইম মিলিত হইলেই মনুষ্যদেহ উৎপন্ন হয় না। আত্মা দেহ ত্যাগ করিলে শরীর উক্ত তিনটী বস্তুতে বিশ্লিষ্ট হয়, কিন্তু উহাদের সংশ্লেষ বা মিলনে দেহ উৎপন্ন হয় না। দেহের মধ্যে একটী সজীব বস্তু আছে। সে বায়ু, জল, খাদ্য হইতে বিশেষ বিশেষ বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া শরীর গঠন করিতে থাকে। এই সজীব পদার্থেরই নাম আত্মা। আরিষ্টটল্‌ বলিয়াছেন, মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ সকলেরই আত্মা আছে। বাইবেল বলিয়াছে, প্রত্যেক ভূচর, প্রত্যেক খেচর, প্রত্যেক উদ্ভিদের মধ্যে জীবন্ত আত্মা নিহিত আছে। কোর্‌আন মজিদ ও এই বাণী সমর্থন করিয়াছে। অনন্ত আত্মা হইতে এন্‌ছান, চারেন্দা (১) পারেন্দা (২) প্রত্যেক বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে এবং প্রত্যেকই সেই অনন্ত আত্মায় প্রত্যাবৃত্ত হইবে। একটু অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দ্রিয় গুলির প্রত্যেকে অপরের সাহায্যকারক। আত্মার ইচ্ছা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পালন করে। কোন একটী অঙ্গ দ্বারা সম্পূর্ণ কার্য্য সাধিত হয় না।

---

(১) ভূচর (২) খেচর।

পশু নখর দ্বারা শিকার করে, দন্ত দ্বারা ছেদন করে, মুখ দ্বারা গ্রাস করে, পাকস্থলী দ্বারা পরিপাক করে ও হৃদপিণ্ড দ্বারা রক্তশোধন করিয়া সমস্ত শরীরে বিক্ষিপ্ত করে। শরীরের মধ্যে আত্মা না থাকিলে কল কব্জা অচল হয়, সমস্ত শরীর পচিয়া খসিয়া পড়ে। নাস্তিকগণ শরীর ও আত্মার পার্থক্য দেখে না। জার্ম্মেনির বহু বৈজ্ঞানিক জীবনী শক্তিকে দেহ-সম্ভুত মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে দেহ আত্মার আজ্ঞাবহ মাত্র। মানব জন্মগ্রহণ করিতেই স্বতঃ এই শক্তি লাভ করে। সর্ব্বদেশের ধার্ম্মিকগণই এই তথ্য শিক্ষা দেন। চক্ষুঃ অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ উভয়েরই কার্য্য করে। চক্ষুঃ কাচ সমষ্টি স্বরূপ। কাচগুলি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করত জীবন্ত পুরুষ কখনও অনুবীক্ষণের কাজ লন, কখনও বা দূরবীক্ষণের কাজ লন। দেহ হইতে জীবন্ত পুরুষ অন্তর্হিত হইলে চক্ষু দ্বারা নিকট বা দূরদৃষ্টির সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই চক্ষুঃ প্রকৃত দর্শক নহে, অন্তর্জীবই প্রকৃত দর্শক।'

দেহ ত্যাগের পর আত্মা মুক্ত হয়। মুক্তির পর আত্মা পৃথিবীতে পুনরায় দেহ ধারণ করে না। ইছ্লাম পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে না। ইছ্লাম পৃথিবীকে শিক্ষানবিশীর স্থান মনে করে। কৃত-কার্য্যতার জন্য শিক্ষানবিশী অত্যাবশ্যক। আত্মার ভবিষ্যৎউন্নতির জন্য পার্থিবশিক্ষা অপরিহার্য্য।

ইছ্লাম রূহ্কে মৃত্যুর সহিত বিদায় দেয় না। ইছ্লাম মৃত্যুকে অন্ত আখ্যা না দিয়া বেছাল বা মিলন আখ্যা প্রদান করে। প্রকৃত পক্ষে জীবনের সত্যতা মৃত্যুর পরেই পরিস্ফুট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবী কয়েক দিনের শিক্ষাক্ষেত্র মাত্র। খোদাওন্দ করিম অনন্ত দয়ার আধার। অল্প কয়েক দিন শিক্ষানবিশীর পর তিনি অনন্ত সুখের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। পার্থিব কোন ব্যবসায়ের জন্য যেরূপ শিক্ষানবিশী

দরকার, আত্মার পরিপুষ্টি সাধনের জন্যও তদ্রূপ শিক্ষানবিশী আবশ্যক। এই পৃথিবীতে আত্মা বা রূহ্‌ কয়েক দিনের জন্য দেহের সংস্রবে থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করে। ঐ শিক্ষাদ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, রূহ্‌ দেহত্যাগের পর ঐ শক্তি লইয়া পরলোকে উপস্থিত হয়। এই শক্তির উন্মেষ হেতুই পৃথিবীতে রূহের আগমন।

সমস্ত রূহ্‌ খোদাওন্দকরিম হইতে আগত ও সকলেই কালে তাঁহাতে প্রত্যাগত হইবে। যেমন অনন্ত বারিধি হইতে বিন্দু মেঘরূপ দেহে অন্তর্নিবিষ্ট হয়, সেইরূপ রূহ্‌ও মহাশক্তি হইতে সৃষ্ট বস্তুতে প্রবেশ করে। এই প্রবেশলাভ খোদাওন্দ করিমের আজ্ঞায় সাধিত হয়। এইজন্যই রূহ্‌ "আমর" বা আদেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে বিবিধ তাড়নার মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রূহ্‌ পারলৌকিক উন্নতির জন্য প্রস্তুত হয়। যেমন বাগিচায় বীজ উপ্ত হইলে উহা ক্রমে অঙ্কুরিত এবং বৃক্ষে পরিণত হয় এবং অবশেষে ফল ফুলে শোভিত হয়, সেইরূপ রূহ্‌ও পরলোকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। বীজের বিভিন্নতাহেতু যেমন বৃক্ষের বিভিন্নতা জন্মে, সেইরূপ রূহের সহিত শক্তির পার্থক্যহেতু তাহার পারলৌকিক পুরিপুষ্টিরও পার্থক্য জন্মে। পৃথিবী বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ। যিনি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনি জান্নাতে অনন্ত সুখের উদ্যানে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হন। যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না, যে কুসঙ্গ ও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করত স্রষ্টার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে মৃত্যুর পর কঠোর তাড়নার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাও আবার তাঁহার অনন্ত দয়ারই পরিচায়ক। তিনি সজ্জনকে মৃত্যুর পর অনন্ত সুখের অধিকারী করেন কিন্তু অসজ্জনকে অনন্তপীড়নে প্রপীড়িত করেন না। তিনি তাহার জন্য কঠোর শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করেন ও যে পর্য্যন্ত রূহ্‌ ভূ-লোকার্জ্জিত

কালিমা বর্জ্জন করিতে সক্ষম না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে বিবিধ পীড়ন সহ্য করিতে হয়। যে রূহের কালিমা যত অধিক, তাহার প্রতি পীড়নও তত অধিক। এই পীড়নাগারকে দোজখ বা নরক নামে আখ্যাত করা হয়। রূহ্‌ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় জান্নাতী (১) দিগের ন্যায় অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারে। এনছানের উপর খোদাওন্দ করিমের কৃপা অসীম। তিনি সকল সময় সকল অবস্থায় সর্ব্বত্র সকলের উপর সমভাবে কৃপাবর্ষণ করেন। তাঁহার প্রভাব প্রতি কল্‌বের উপর বিস্তীর্ণ হয়, কিন্তু এনছান স্বীয় পাপকালিমা হেতু উহা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারে না। পৃথিবীর উপর যেরূপ চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হয়, প্রতি কল্‌বের উপর সেইরূপ ঐশীপ্রতিভা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। মেঘ যত ঘন গভীর হয়, ততই চন্দ্রের প্রভা প্রতিহত হয়; আবার ঘনত্বের যতই হ্রাস হইতে থাকে, ততই পৃথিবী চন্দ্রের কিরণে উদ্ভাসিত হয়। এনছান যতই দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ততই তাহার কল্‌বের উপর কালিমা পড়িতে থাকে। এনছান যতই দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করিতে শিখে, ততই উক্ত কালিমা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কালিমার হ্রাস হেতু ঐশ-প্রভাব ক্রমে অনুভূত হইতে থাকে। দুষ্প্রবৃত্তির উপর যে রূহের কর্তৃত্ব যতই অধিক, ঐশীশক্তির অনুভূতি ততই প্রবল। এনছান স্বকৃত দোষ হেতু, স্বকৃত কালিমা হেতু ঐশ-প্রভাব সম্যক্‌ অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। রূহের সহিত নফ্‌ছ বা দুষ্প্রবৃত্তির বিবাদ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ইহাদের জয় পরাজয়ই পাপ পুণ্য নামে অভিহিত। ঐ ব্যক্তি পুণ্যবান, যাহার রূহ্‌ দুষ্প্রবৃত্তির উপর আরোহণ করত আপনাকে সৎপথে চালনা করিতে সক্ষম এবং ঐ ব্যক্তি পাপী, যে দুষ্প্রবৃত্তিদ্বারা পরাজিত।

---

(১) স্বর্গবাসী।

ঘোড়দৌড়ের চিত্রে রূহ কে আরোহী এবং নফছকে ঘোটক কল্পনা করা হইয়াছে। রূহের উপর ঐশীপ্রতিভা চন্দ্রকিরণের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে। যখন নফ্‌ছ জয়যুক্ত ও রূহ পরাজিত হইয়া পড়ে, তখন পতনোন্মুখ রূহের উপর নফ্‌ছের ছায়া বা প্রভাব বিস্তৃত হয়। সুতরাং রূহ নফ্‌ছের কালিমাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই ঘন কালিমার আবরণ হেতু রূহ ঐশ-কিরণ অনুভব করিতে পারে না। ইহাই সংসারে পাপের জয় নামে আখ্যাত। আরোহী বা রূহ্‌ যখন ঘোটককে পূর্ণ ক্ষমতাধীন রাখিতে সক্ষম হয়, তখন উহার উপর পূর্ণ কিরণ সম্যক্‌ বিস্তৃত হয়। চিত্রের উর্দ্ধে পুণ্যের জয় ও উহার পার্শ্বে পাপের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা পরমাত্মার আমর বা আদেশ, উভয়ই সদৃশ বস্তু। কেবল উহাদের মধ্যে পুণ্যত্বের ও অপুণ্যত্বের তারতম্য, সুতরাং সহজ বোধের জন্য রূহ্‌ ও ঐশীপ্রতিভা শুভ্রবর্ণে ও নফ্‌ছ বা দুষ্প্রবৃত্তির প্রভাব কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, কল্‌বের কালিমা রূহ্‌ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহা দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণের ফল। পৃথিবী হইতে বাষ্পযোগে জলীয় পদার্থ যেমন মেঘের সৃষ্টি করে, সেইরূপ এনছান দুষ্প্রবৃত্তিদ্বারা কালিমা সৃষ্টি করত পবিত্র কল্‌বকে তমসাচ্ছন্ন করে ও ঐশ-প্রভাব হইতে বঞ্চিত থাকে। এই বঞ্চনা বা আবরণ তাঁহার অনুগ্রহের অভাবহেতু নহে। ইহা মানুষের সুচেষ্টার অভাব সম্ভূত। খোদাওন্দ করিম মানুষের সহায়তার জন্য সকলকে বিবেকশক্তি দান করিয়াছেন। ঐ শক্তির সাহায্যে মানুষ সদসৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগদ্বারা অসৎ হইতে বিরত থাকিয়া 'সৎ'এর অনুসরণ করিতে পারে। যিনি যত সদাচারী তিনি ততই বিভুপ্রেমের অধিকারী। যে যতই অসদাচারী, সে ততই
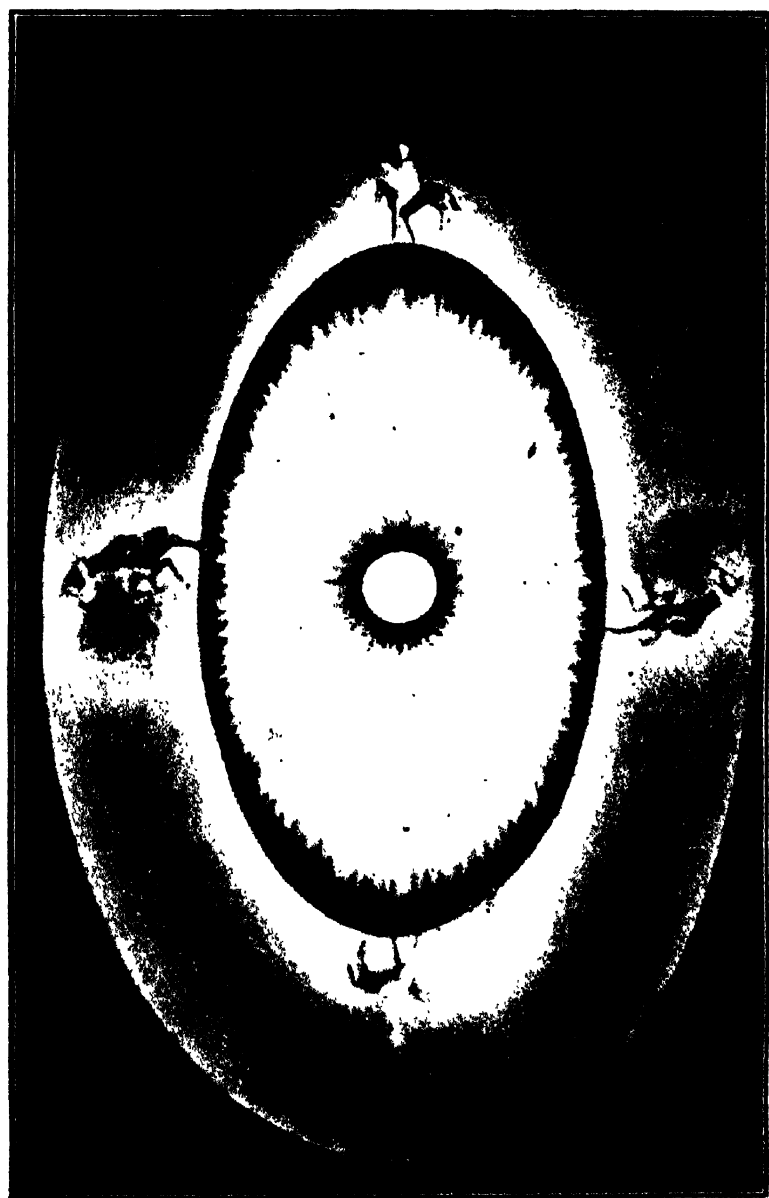
বিভুপ্রেম হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। যে রূহের কালিমা যত অধিক তাহার ঐশ-প্রভাবের অনুভূতিও তত অল্প। যে রূহ্‌ শরীয়ত অভ্যাস-দ্বারা মারফতের তথ্য আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, যে রূহ্‌ আমিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সার্ব্বজনিন প্রেমে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে, যে রূহ্‌ জড় ও অজড় ভেদ করিয়া স্রষ্টার নৈকট্যলাভ করিয়াছে,সেই রূহ্‌ পূর্ণ ঐশ-প্রভাব অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইছ্‌লাম পাপপুণ্যের জয়পরাজয় এন্‌ছানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এখানেই ইছ্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব।

ইছ্‌লাম কেবল ভূলোক লইয়াই সীমাবদ্ধ নহে। ভূলোক ও দ্যুলোক উভয়ই ইহার পরিধির অন্তর্গত। যিনি ইছ্‌লামের আদেশ পূর্ণভাবে পালন করিতে সমর্থ হন, তিনি ভূলোক হইতে বেহেস্তী-শক্তি অর্জ্জন করেন এবং দেহত্যাগের পর এ শক্তির ক্রমিকবিকাশ করিতে থাকেন। ইহার অনন্ত বিকাশ রূহ্‌কে অনন্তসুখের অধিকারী করে। হিন্দুধর্ম্ম একত্বকে বহুত্বে পরিণত করে। খৃষ্টধর্ম্ম একত্বকে ত্রিত্বে পরিণত করে। ইছ্‌লামই একত্বকে সংরক্ষণ করিয়া মহাসত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ইছলামের অভ্যুদয় এবং রোজ হাসর পর্য্যন্ত ইহার ক্রমবিকাশ। ইছ্‌লামই একমাত্র সত্য ও পবিত্র ধর্ম্ম।

জন্মান্তর বাদ খণ্ডন।

ইছ্‌লাম পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে না। খৃষ্টধর্ম্মও পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে না। হিন্দুধর্ম্ম কার্য্যের পরিণতিকেই উচ্চস্থান প্রদান করে এবং উহার ফলাফলের উপর পুনর্জ্জন্ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত করে। ইছ্‌লাম সুকার্য্য ও কুকার্য্য মানে বটে, কিন্তু ফলাফলের জন্য দয়াময়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। হিন্দুধর্ম্মানুসারে যে পর্য্যন্ত পাপের সমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত জন্মের ক্রম চলিতে থাকিবে। হিন্দুধর্ম্ম সৃষ্টিকর্ত্তাকে

মানে বটে, কিন্তু তাঁহার অনন্ত দয়া, অনন্ত মাহাত্ম্য ও অনন্ত বিচারের প্রতি লক্ষ্য করে না। বৌদ্ধধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় পুনর্জন্ম স্বীকার করে, কিন্তু ইহার নির্ব্বাণবাদ হিন্দুজন্মান্তর বাদ হইতে পৃথক। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ নির্ব্বাণ অর্থে দেহান্তর প্রাপ্তির অবসান বুঝিয়া থাকে কিন্তু ইছ্‌লামের "ফানা" বলিতে এই নির্ব্বাণ বুঝায় না। মানবীয় ইচ্ছা-শক্তিকে মহাপ্রভুর ইচ্ছার উপর সমর্পণ করাকে 'ফানা' বলে। ইহা একের সহিত অপরের মিলন। ইহা অবসান অর্থবোধক নহে। হিন্দুশাস্ত্রে সমস্ত কার্য্য ও কল্পনার মূলে কর্ম্মবাদ নিহিত আছে। এই শাস্ত্রানুসারে আত্মা একটী অবিনশ্বর প্রকৃত বস্তু। উহা নশ্বর দেহমধ্যে স্থাপিত। মৃত্যুর পর মানবাত্মা কর্ম্মফলানুযায়ী এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে, তা সে মানব দেহই হউক, কিংবা পশুদেহই হউক। এইরূপ দেহ পরিবর্ত্তন অসংখ্য বার চলিতে থাকে এবং পরবর্ত্তী দেহ পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কার্য্যের উপর নির্ভর করে।

হিন্দুধর্ম্ম মনে করে যে, পূর্ব্বজন্মের সুকার্য্যের ফলে মানব পরজন্মে উচ্চপদের অধিকারী হয়। প্রকৃত পক্ষে পদের উপর সুখ প্রাপ্তি নির্ভর করে না। অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও ধনশালী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সুখশান্তি লাভ করিতে সক্ষম। মানসিক প্রসাদের নামই সুখ। দৈহিক ও সামাজিক অবস্থার উপর সুখ দুঃখ নির্ভর করে না। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্রবংশ সম্ভূত। তাঁহারা দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া মহা সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। যীশুখৃষ্টও দরিদ্রগৃহে জন্মিয়াছিলেন। ত্যাঁ হজরত রাজরাজেশ্বর হইয়াও অতি দীনভাবে কালাতিপাত করিয়া পরম সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। পুনর্জন্ম বাদিগণ যেনমস্ত লোককে ছোট বলিয়া ঘৃণা করেন, যাহারা

পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দরিদ্রগৃহে জন্মলাভ করিয়াছে মনে করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে ধনাধিপ হইতেও সুখী ও হৃষ্টচিত্ত, তাহা কি তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন? অনেকে যাঁহারা 'নেতা' নামে পরিচিত ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু দেশবিদেশে সম্মানিত, তাঁহাদের মধ্যেও যে কলুষ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা কি তাঁহারা অনবগত? হৃদয় কলুষিত থাকিলে যে প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায় না, তাহা কি তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত? দেহের সৌষ্টব, মানসিক জ্ঞানের বিকাশ, উচ্চশ্রেণীতে জন্ম, উচ্চপদের অধিকার প্রভৃতি প্রকৃত সুখের কারণ নহে। আধ্যাত্মিক সুখ দরিদ্রালয়েও সম্ভবপর, অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও সম্ভবপর, অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যেও সম্ভবপর। অনেকে অন্ধত্বকে পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের ফল-ভোগ বলিয়া মনে করেন। দেবেন্দ্রনাথ অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি সকলের নিকট মহর্ষি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ অন্ধ না হইলে তিনি এত উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইতে পারিতেন না। তিনি যদি সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্টব-সম্পন্ন হইতেন, তিনি যদি ইন্দ্রিয়জনীন সুখের জন্য লালায়িত হইতেন তাহা হইলে কখনও দয়াময়ের সান্নিধ্য লাভ করত আধ্যাত্মিক সুখের অধিকারী হইতে পারিতেন না। তাই বলি, অনেক সময় কোন ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা প্রকৃত সুখের পূর্ণতা আনয়ন করে। যাহাকে আমরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করি, তাহা সুখের মূলীভূত কারণও হইতে পারে। অনেকে পার্থিব সম্পদ্ ও বিলাসিতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও চিরতরে মহা পাপের আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার অনেকে দারিদ্র্য, শোক ও অভাবের হস্তে নিষ্পীড়িত হইয়াও সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে শিক্ষাকরে ও অপরের সুখের জন্য আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত হয়। এতদ্দৃষ্টে বলিতে পারা যায়, বাহ্য দুঃখ অনেক

সময় আভ্যন্তরীণ সুখ-ভোগের কারণ হয়। পূর্ব্বজন্মের পাপের উপর দারিদ্র্য বা কষ্ট নির্ভর করে না। যিনি যে অবস্থায় থাকেন, যদি আপনাকে পরম পিতার সেবকত্বে উৎসর্গ করিতে পারেন তবেই তিনি সুখী হন। জন্মান্তর-বাদ মানিতে ইছ্‌লাম রাজী নহে। ইহাতে ধর্ম্মবিশ্বাস দুর্ব্বল হয়। সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্তপ্রেমের উপর নির্ভর জন্মে না। মানব এক জীবনেই দয়াময়ের সান্নিধ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং কুপ্রবৃত্তির আশ্রয় লইলে শাস্তির উপযোগী হইতে পারে। যদি কার্য্যের উপরেই আমাদের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তবে দয়াময়ের দয়ার আবশ্যক হয় না। মানব কর্ম্মফলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিত।

পুনর্জন্ম বাদের আর একটী ভীষণ ফল এই যে, লোকে বিপদে পতিত হইলে বা দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইলে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে অগ্রসর হয় না। তাহারা পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মদোষে নিষ্পীড়িত মনে করিয়া সৌভাগ্য প্রসন্ন করিতে উদ্যোগী হয় না। ইহাদ্বারা সমাজের অমঙ্গল সাধিত হয়। কোন সভ্য জগতে এই নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

এই নীতির আর একটী দুর্ব্বলতা এই যে, মানব পূর্ব্ব জন্মকৃত দোষ অনবগত থাকায় ইহজন্মের শাস্তির প্রকৃত কারণ স্থির করিতে অক্ষম থাকে। শাস্তির উদ্দেশ্য যে, অপরাধী শাস্তি পাইয়া সৎপথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিবে। কেবল যদি শাসনই থাকে, অপরাধের জ্ঞান না থাকে, তবে সে শাসন উপাদেয় হয় না। আমরা পুত্র কন্যাকে শাসন করিয়া সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করি। পরম পিতারও ঠিক সেই রীতি। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আমাদের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া শাস্তি প্রদান করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইতে পারে? দুঃখের বিষয়, কর্ম্মবাদিগণ এই বিষয় আদৌ চিন্তা করেন না। তাঁহারা

বলেন,অসৎ কার্য্যের ফলে মানব পশুর আকার ধারণ করিতে বা একশ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে জন্ম লাভ করিতে পারে। কিন্তু এক জন্মে সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া অন্য জন্মে দায়িত্বহীন পশুর আকার ধারণ করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, তাহা আদৌ বোধগম্য নহে।

কুকাজ করিবার কল্পনা করিলেই বিবেক নিষ্পীড়িত হইতে থাকে এবং কুকার্য্যের পরক্ষণেই দারুণ অনুতাপ ভোগ করে। কর্ম্মবাদিগণ পাপের পরবর্ত্তী অনুশোচনা দেখাইতে অক্ষম। যুক্তি তর্ক এই নীতি মানিতে প্রস্তুত নহে। ইছ্‌লাম মানবের স্বাধীনতা স্বীকার করে, মানব ইচ্ছা করিলে আপনাকে সৎপথে চালিত করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে দুষ্প্রবৃত্তিরও অনুসরণ করিতে পারে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলের জন্য তাহাকে নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে হয় না। ইছ্‌লাম সৎকার্য্যের প্রশংসা করে, কিন্তু অপরাধের জন্য দয়াময়ের উপর আপনাকে ছাড়িয়া দেয়। যিনি দয়ার আকর, তিনি চিরজন্মের জন্য মানবকে দুঃখের নরক-যন্ত্রণা প্রতিদান দিয়া সুখী হইতে পারেন না। মানবকে একবারমাত্র পরীক্ষা করিয়া তিনি তাহাকে অনন্ত কৃপাধামে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন। দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কিছুকাল শাস্তিপ্রদান করত তাহার রূহ্‌কে আধ্যাত্মিক প্রসাদ ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লন। তদীয় অনন্ত দয়া তিনি সকল মানবকে অর্পণ করেন। নারকী বলিয়া তাঁহার দয়া সীমাবদ্ধ হয় না। যিনি অনন্ত, তাঁহার তুলনা সান্তের সহিত অসম্ভব। আমরা অপরাধ করি সত্য, কিন্তু আমাদের কার্য্য সান্তের পরিধির অন্তর্নিবিষ্ট। যাঁহার প্রেম অনন্ত, যাঁহার কৃপা অনন্ত, যাঁহার মাহাত্ম্য অনন্ত, তাঁহার নিকট ঘৃণ্য অপরাধীও মুক্তির আশা করিতে পারে। ইছ্‌লামের এই শিক্ষা, এই দীক্ষা। ইছ্‌লাম সান্তকে অনন্তের সহিত মিলাইয়া দেয়। অন্যধর্ম্ম অনন্তকে সান্তে পরিণত করিতে চেষ্টা করে।

তক্‌দির বাদ।

ইছ্‌লাম তক্‌দিরবাদ শিক্ষা দেয়, কিন্তু অদৃষ্টবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। দুঃখের বিষয়, সাধারণতঃ তক্‌দির অদৃষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই অপপ্রয়োগের জন্য বিরুদ্ধবাদিগণ ইছ্‌লামের উপর নানা দোষারোপ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তক্‌দিরকে অদৃষ্ট নামে আখ্যাত করা যায় না। অদৃষ্ট অর্থে আমরা এই বুঝি যে, মানুষের ভবিষ্যৎ এক অখণ্ডনীয় বিধি-লিপির স্বরূপ। তাহার কপালে ভবিতব্য পূর্ব্ব হইতেই লিখিত আছে এবং তাহার পরিবর্ত্তন কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। 'ষ্টোইক' সম্প্রদায়ের মতানুসারে জগতের প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি লৌহশৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ। ইঁহারা প্রকৃতির মধ্যে কেবল কার্য্য কারণ সম্বন্ধ দেখিয়াই ক্ষান্ত হন, অন্য কোন নিয়ামকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই শিক্ষা হইতেই অদৃষ্টবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। অদৃষ্টবাদী প্রকৃতিমধ্যে প্রবুদ্ধ চেতনা উপলব্ধি করেন না, ইঁহারা অন্ধ ভবিতব্যতা বিশ্বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এই অদৃষ্টবাদ জড়বাদ প্রসূত। ইহা হইতেই নাস্তিকতার উৎপত্তি।

ইছ্‌লাম নাস্তিকতার ঘোর বিরোধী। একত্বেই ইহার স্থিতি। জড়বাদিগণ উপাসনার আবশ্যকতা মনে করে না। অথচ উপাসনা ইছ্‌লামের অন্যতম স্তম্ভ। সুতরাং ইছ্‌লাম নাস্তিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। অদৃষ্টবাদিগণ অদৃষ্টের উপর সুখ দুঃখের ভার আরোপ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন। পৃথিবীর উন্নতির জন্য ভ্রূক্ষেপ করেন না। ইহাতে সংসারের অমঙ্গল ঘটে, জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ হয়, ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়। ইছ্‌লাম অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিলে কখনও এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইত না। কোরআনে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না যে, মানুষের কাজ কর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত। কোরআনে

লিখিত আছে, "ইহা আল্লার প্রতি আরোপ করা যায় না যে তিনি লোকদিগের প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কুপথে চালনা করেন; তিনি তাহাদিগকে স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারা সাবধান থাকিবে।" (৯—১১৫)। কোর্‌আনের আদেশ মতে মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে শাসনাধীন রাখা আবশ্যক। কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া অনুচিত। ইছ্‌লাম আত্মত্যাগ শিক্ষা দিয়া খোদাওন্দ করিমের ইচ্ছার উপর মানবকে ছাড়িয়া দেয়।

এই নির্ভরই ইছ্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব। যেখানে নির্ভর আছে, সেখানে অদৃষ্টের স্থান নাই। কোর্‌আনের প্রতিস্থানে আল্লাহ্‌তায়ালাকে রহমান্‌ ও রহিম নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় মোছলেম "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই বিশ্বাসই মুক্তির দ্বারোদ্‌ঘাটক! আঁ হজরত আদর্শপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সুতরাং মোছলেম অদৃষ্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না।

মানুষ সাধারণতঃ স্বকৃতদোষ অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া স্বীয় অপরাধের ভার লাঘব করিতে চায়। দুষ্কার্য্যের প্রতিফল কঠোর আত্মগ্লানি। ইহা হইতে নিষ্কৃতির জন্যই লোক সাধারণতঃ কেছমতের উপর দোষারোপ করিতে শিখে, স্বয়ং অপরাধী একথা সহজে মানিতে চায় না। ইহারাই অদৃষ্টের আড়ালে আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে ইছ্‌লামে এইরূপ শিক্ষা নাই। অদৃষ্টবাদী সদসৎ উভয়ই সৃষ্টিকর্ত্তার উপর আরোপ করে কিন্তু মোছলেম কেবল সৎকেই তাঁহাতে আরোপ করে এবং অসৎকে আপনাতে আরোপ করে। কোর্‌আন ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। "হে মানব, সকল মঙ্গল খোদাতায়ালা হইতে আগত হয়, এবং যে বিপদ্‌ তোমার উপর আপতিত হয়, তাহা তোমা হইতে আগত।"

ইছ্‌লামের বিধি অনুসারে প্রত্যেকেরই সদসৎ বিবেচনার ক্ষমতা আছে। ইচ্ছা করিলেই অসৎকে পরিত্যাগ এবং সৎকে অবলম্বন করা যায়। অদৃষ্টবাদী এই তথ্য মানিতে নারাজ। কোর্‌আন বলিয়াছে "আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের শাস্তি এবং সু-কার্য্যের পুরস্কার দেন।" অদৃষ্টবাদী মানুষের কার্য্যাবলী স্বতঃ প্রাণোদিত মনে করিয়া শাস্তি ও পুরস্কারের আশঙ্কা ও আশা চিরতরে বিদায় দেয়। অদৃষ্টবাদ সৃষ্টিকর্ত্তাকে "মালেকে ইয়াওমেদ্দিন" (১) আখ্যা প্রদান করিতে পারে না। অদৃষ্টবাদ মানুষের দায়িত্ব ঘুচাইয়া দিয়া পৃথিবী হইতে নৈতিক জীবনের প্রধান উৎস দূরীভূত করে, ক্রমিক উন্নতির পদে কুঠারাঘাত করে।

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই কঠোর নিয়মাধীন। উহারা এই অনন্ত বিধানের ব্যভিচার করিতে অসমর্থ। কোর্‌আনে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে ঃ—"সূর্য্য তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নির্দ্দিষ্ট গতিবিধি করে। ইহাই জ্ঞানময় ও শক্তিময়ের নির্দ্ধারিত নিয়ম এবং চন্দ্রের জন্য আমরা বিভিন্ন কলা আদেশ করিয়াছি যে পর্য্যন্ত ইহা পুরাতন শুষ্ক তালবৃন্ত সদৃশ না হয়। সূর্য্যের অনুমতি নাই যে, চন্দ্রকে অতিক্রম করে কিংবা রাত্রি দিনকে অতিক্রম করে ; এবং উহারা সকলেই শূন্যমার্গে ভাসমান।" ইহাদ্বারা প্রতীত হয় যে, পৃথিবীর গতির ন্যায় সূর্য্যের ও গতি আছে। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নিয়মের অধীন। ইহা দ্বারা প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী সকলেই মানবের উপকার সাধন করিতে নির্দ্দিষ্ট। এই নির্দ্দিষ্ট নীতির নামই তক্‌দির। ইহা অদৃষ্ট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তক্দিরে গুপ্ত ইচ্ছা নিহিত আছে। অদৃষ্ট এই ইচ্ছাশক্তি স্বীকার

(১) বিচার দিনের প্রভু।

করিতে পরাঙ্মুখ। সমস্ত জগতের মধ্যে উদ্দেশ্যের স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়। ঘড়ির প্রত্যেক অংশ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত; তাহারা আপনা হইতেই চলিয়া থাকে এবং অংশগুলি নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধনে পরস্পর নিয়োজিত থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালাই এই নিয়োজক। এই নিয়োজনাকেই তক্‌দির বলা হয়। কোর্‌আনে উল্লেখ আছে, "তোমার প্রভুর গান কর, যিনি সৃষ্টি করেন, অবশেষে সম্পূর্ণ করেন; এবং যিনি (বস্তুনিচয়কে) নির্দ্দেশানুসারে চালনা করেন।" এই আদেশ তক্‌দিরবাদের পোষকতা করে। সৃষ্টিকর্ত্তা খামখেয়ালের সহিত এই পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন। মানবও এই সাধারণ নীতির অধীন। তাহার ক্রিয়া-কলাপ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনহেতু নিয়মিত। মানব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠজীব, উহারই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর আবশ্যক। অটুট প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমস্ত সৃষ্টবস্তু স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত, নিয়ামক ইহাদিগের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন। তিনি মানুষকে বিবেক, দুষ্প্রবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি, আত্মা ও শরীর দান করিয়াছেন। শরীরের মধ্যে হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকাশয় নির্দ্ধারিত নির্দ্দেশানুসারে আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, তদ্দ্বারাই শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় এবং আত্মা, জ্ঞান বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা পূর্ণ করে। এই নির্দ্দেশই তক্‌দির নামে অভিহিত। ইহা অ-দৃষ্ট হইলেও অদৃষ্টবাচ্য নহে। মানবের সমস্ত কার্য্যের মূলে সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা লক্ষিত হয়। কার্য্যকলাপ প্রকৃতির নিয়মমত ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ইছ্‌লাম মানবকে স্বীয় কার্য্যের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দেয় না। কোর্‌আনে আদেশ আছে, "প্রভো, তুমি ইহাকে (পৃথিবী ও

আকাশকে) বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কর নাই। তোমার জয় হউক, আমাদিগকে নরকাগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর।" সৃষ্টিকৌশল চিন্তা করিলে মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, ইহাতে স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। প্রত্যেক বস্তুই মানবের কোন না কোন মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট। মানুষ যতই জ্ঞান লাভ করিবে, ততই স্রষ্টার জয়গান কীর্ত্তন করিবে। মানব কুকার্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে, সেই ভয়ে নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। মানব বিচার-শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা আপনাকে অসৎপথ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; বিবেককে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যাদেশের আবশ্যক হয়। একমাত্র বিবেক মানবকে কৃতিত্বে পৌঁছাইতে পারে না। তাহার পরিচালনার জন্য প্রত্যাদেশ ও মহাপুরুষের আবির্ভাব উভয়ই আবশ্যক। এই তিনটী বস্তুর দ্বারা মানব জগতের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা এই সমস্ত নিয়মদ্বারা মানবের কার্য্যকলাপ পরিচালনার সহায়তা করিয়াছেন। ইহারা সকলেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করত স্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। ইছলাম ইহারই নাম তক্দির দিয়াছে।

অদৃষ্টবাদিগণ বলিতে চান যে, পৃথিবীর মধ্যে নানাবিধ অমঙ্গল বর্ত্তমান ; যথা :—রোগ, শোক, মৃত্যু, অভাব প্রভৃতি। এমন কোন লোক দৃষ্টিগোচর হয় না, যে কখনও বিপদাপন্ন হয় নাই। যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখ বর্ত্তমান। অভাব অভিযোগ দেখিয়া অদৃষ্টবাদিগণ বলিতে চান যে, এই গুলির প্রত্যেকটীই সৃষ্টি কর্ত্তার আদেশ সম্ভূত। তাঁহারা বুঝেন না যে, বিপদই শান্তির কারণ। অদৃষ্টবাদী সৃষ্টি কর্ত্তাকে কঠোর নির্যাতক মনে করেন। মোছলেম বিপদের মধ্যে সুখের আকর

আবিষ্কার করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দেয় এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণের সাহায্যে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীবন ধন্য করে। এই আপাত অমঙ্গলের জন্য স্রষ্টাকে দায়ী করা মূর্খতা! বীজের মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে। বীজের গঠন ও ঐ শক্তির উন্মেষ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। উপযুক্ত মৃত্তিকা ও জলবায়ু এবং উপযুক্ত সার প্রভৃতির উপর বীজের উন্মেষ ও পরিপুষ্টি নির্ভর করে। ইহার কোনটীর ত্রুটী হইলে পরিপুষ্টির ত্রুটী হইবে কিন্তু তাহার জন্য সৃষ্টি কর্ত্তাকে দায়ী করা অর্বাচীনতা। বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কাজ করিতে থাকে; কখনও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। এই ব্যতিক্রমের অসংঘটনকে তক্‌দির বলা যাইতে পারে। সুতরাং তক্‌দির সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তিমত্তা অস্বীকার করে না। করুণাময় মানবকে বিচারশক্তি দান করিয়াছেন। বিচার শক্তিকে চালনা করা না করা মানবের ক্ষমতাধীন। যদি কেহ অসৎপথে উহার চালনা করে, তবে সেই ব্যক্তিই কার্য্য ফলের জন্য দায়ী। ইছ্‌লাম এই দায়িত্ব স্বীকার করে ও অন্তর্নিহিত মহানিয়ম উপলব্ধি করিয়া করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করে। ইছ্‌লাম আদেশ করিয়াছে:—"আল্লাহতালার জন্য আমরা, তাঁহাতেই আমরা প্রত্যাগমন করিব।" এই আশাবাণী মোছলেমকে পৃথিবীর কঠোরতার মধ্যে ধীর ও স্থির রাখিতে সক্ষম হয়। ইহার সহিত খৃষ্টধর্ম্মের আদেশ পাঠকবর্গ একবার তুলনা করিয়া দেখুন, "তুমি ধূলির মানুষ ধূলিতে ফিরিয়া যাইবে।" একটি নীতি মানবকে প্রেমময়ে লীন করে এবং অপরটি নগণ্য ধূলায় পরিণত করে। ইছ্‌লামের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও উহার গন্তব্য স্থান সকলের আকাঙ্ক্ষা, তাই আপাত অমঙ্গলে নিপতিত হইয়াও মোছলেম অনন্ত সুখের আশা পরিত্যাগ করে না। এই আশাই তাহাকে পৃথিবীর মধ্যে সঞ্জীবিত রাখিয়া কৃতকার্য্যতার সহায়তা

করে। ইছলাম অমঙ্গলকে আশীর্ব্বাদ আখ্যা প্রদান করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। অমঙ্গল মানবকে সাহসিকতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণের উন্মেষ করিবার সুযোগ করিয়া দেয় এবং অন্তরাত্মার যে সমস্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহার পরিপুষ্টি করিবার উপায় করিয়া দেয়। আত্মার উন্নতির জন্য সম্পদ্‌ ও বিপদ উভয়ই বিঘ্নজনক। সম্পদও মানবের একটী প্রধান পরীক্ষার স্থল। সম্পদের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া যে সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, সে অতীব মহৎ। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, "তোমার সম্পদ্‌ ও তোমার সন্ততি কেবল পরীক্ষার স্থল এবং আল্লাহ্‌তায়ালাই তিনি, যাঁহার নিকট হইতে পুরস্কার আইসে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষের জন্যই বিপদ্‌ ও সম্পদের সৃষ্টি। উভয়ের উদ্দেশ্য এক। পাত্রভেদে করুণাময় বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরীক্ষা যাহা দ্বারাই হউক না কেন, উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই মহাসুখের অধিকারী হওয়া যায়। মানুষ নির্ব্বোধ, তাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া পরীক্ষাযন্ত্রের দোষগুণ বিচার করে। সুখদুঃখের বিপর্য্যয় দ্বারা মোছলেম স্বীয় ভবিষ্যৎ গঠন করে। অদৃষ্ট মানবের গঠিত, মানব অদৃষ্টগঠিত নহে। ইছ্‌লাম যাহাকে তক্‌দির বলে, তাহা অদৃষ্ট নামবাচ্য নহে। নিয়ামকের যে নিয়ম হইতে মানবের সুখদুঃখ প্রসূত হয় তাহাকে তক্‌দির বলে।

অদৃষ্টবাদিগণ সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানবের কার্য্যাবলীর কারণ মনে করেন। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি সকলকেই সৎপথে চালিত করিতে পারিতেন। সমস্ত মানব একধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানবগণ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদের মধ্যে চরিত্রের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কেহ কেহ আদেশ বাণীর কোন বিশেষ অংশ হইতে অদৃষ্টবাদ সপ্রমাণ করিতে চাহেন।

কথিত আছে বিরুদ্ধবাদিগণ স্বীয় মত সমর্থনার্থ—"আল্লাহ তাহাদিগের অন্তঃকরণের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষু ও কর্ণের উপর পর্দার দ্বারা আবরণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি আছে (২—৬, ৭)।" এই উক্তির বিপরীত অর্থ করেন। শরীরের কোন অংশ যদি ব্যবহৃত না হয়, তবে কিছুকাল পরে সেই অংশ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়। সেইরূপ মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলিকে প্রয়োগ না করিলে ঐ গুলি ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। ইহাদের অব্যবহার জন্য সৃষ্টি কর্ত্তা দায়ী নহেন। তবে তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমভাবে দেখিতে পান। তাঁহার জ্ঞানের অতীত কিছুই নাই। প্রত্যেকে কিরূপে স্বীয় বৃত্তি গুলি পরিচালিত করিবে এবং তাহার ফলই বা কি ঘটিবে তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার অজ্ঞাত নহে। তাঁহার জ্ঞান মানবের জ্ঞানের ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। দেশ ও কাল তাঁহার জ্ঞানকে অবরোধ করিতে পারে না। আমরা যাহাকে ভবিষ্যৎ মনে করি, তাঁহার নিকট তাহা বর্ত্তমান স্বরূপ। ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর জ্ঞানকে কার্য্যাবলীর কারণ বলিয়া মনে করা ভ্রম। মানবের কার্য্যাবলী তাঁহার জ্ঞানগোচর হইলেও তাঁহার নির্দ্দেশ প্রসূত নহে। মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাই ভবিষ্যৎ কার্য্যের ফলাফল অনুধাবন করিতে অক্ষম। অনন্তজ্ঞান এই অক্ষমতা হইতে মুক্ত। মানব ভবিষ্যতে স্বীয় ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যে সকল কার্য্য করিবে, তাহার ফলাফল তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে ভাসমান। যখন মানবও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারে ও ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা অপরাপরকে চমৎকৃত করিতে পারে, তখন স্রষ্টার পক্ষে ইহা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে। ভবিষ্যদ্বক্তাকে যখন আমরা ঐ ঘটনাবলীর কারণ বলিয়া মনে করি না, তখন স্রষ্টাকে মানব মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অর্ব্বাচীনতা বই কিছুই নহে।

সমগ্র জগৎ একই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জগতের প্রত্যেক অনু পরমাণু সেই উদ্দেশ্য সাধনজন্য সাহায্য করিয়া আসিতেছে। মানব জগতের একটী জীব, তাহারও জগতের উদ্দেশ্য পালনে অংশ আছে। সে স্বীয় প্রবৃত্তি গুলির চালনাদ্বারা জাগতিক উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে। মানবের শরীর, মন ও আত্মা সৃষ্টি কর্ত্তার নির্দ্ধারিত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইলেও সে সুকার্য্য বা কুকার্য্য করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। পার্থিব অবস্থা বিপর্য্যয়ে সম্পদ্ বিপদের আগম, তাহার প্রবৃত্তি গুলির পূর্ণ অভিব্যক্তির সহায়তা করে। মানবের নিয়মিত শক্তিগুলির উপর স্রষ্টা পদে পদে হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি থাকিলেও মানবকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন। সুতরাং মানবই স্বকৃতকার্য্যের ফলাফল জন্য দায়ী। মানবের প্রবৃত্তি গুলি বিশেষ নিয়মে নিয়মিত না হইলে জগতের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইত না, স্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। দায়িত্বপূর্ণ মানবের সুনিয়মিত প্রবৃত্তিগুলির যথেচ্ছ চালনাকে অদৃষ্ট বলা যায় না। ইহা তক্দির নামে অভিহিত। অদৃষ্ট স্বর্গের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ নহে। তক্দির মানবকে পশু হইতে অধ্যাত্মতার শেষ শিখরে উন্নীত করিতে সমর্থ হয়। মানব স্বীয় গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক জীবের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে এবং অবশেষে মহাপ্রভুর নৈকট্যসাধন করিয়া তাঁহাতে লীন হইয়া যায়। ইহাই ইছ্লামের শিক্ষা, ইহাই ইছ্লামের দীক্ষা।

ইছ্লামের পূর্ণত্ব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইছ্লাম কেবলমাত্র একটী নীতি বা পদ্ধতির নাম নহে। কার্য্যই ইছ্লামের পরিচায়ক। যিনি কার্য্যদ্বারা পরিচয় না দেন তিনি প্রকৃত মোমেন নামবাচ্য নহেন। প্রকৃত পক্ষে ইছ্লামকে

ঈমান ও কার্য্য এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায় না, যেহেতু ঈমান কার্য্যসংশ্লিষ্ট, কার্য্য ঈমানসংশ্লিষ্ট। একটী অপরটী হইতে পৃথক নহে। যে পর্য্যন্ত কার্য্যদ্বারা ঈমানের পরীক্ষা না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত ইছ্‌লামের মাহাত্ম্য বোধগম্য হয় না। ইছ্‌লাম আঁ হজরতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ইছ্‌লামের জলন্ত দৃষ্টান্ত, তিনি ইছ্‌লামের গৌরবরবি, তিনিই ইছ্‌লামের মহাআদর্শ পুরুষ। ইছ্‌লাম তাঁহা হইতে পৃথক ছিল না, তিনিও ইছ্‌লাম হইতে পৃথক ছিলেন না। ইছ্‌লামের পরিপুষ্টি দেখিতে হইলে, ইছ্‌লাম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাঁহারই জীবনী অনুকরণীয়। তিনি ইছ্‌লামের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতি ফেয়েল, প্রতিগতি, প্রতিবাক্য, প্রতিইঙ্গিত ইছ্‌লামের অর্থবোধক ছিল। তাঁহার পূর্ণ জীবনী যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইছ্‌লামের পরিচয় জানিয়াছেন। তাঁহার জীবনী যিনি অনুসরণ করিয়াছেন তিনিই মোছ্‌লেম নামের উপযোগী হইয়াছেন। ইছ্‌লাম সম্বন্ধে যত পুস্তকই লিখিত হউক, কোন পুস্তকই তৎসম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান দিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহার আদর্শই কেবল এই জ্ঞানের বিকাশ সাধনে সমর্থ। কি বালক, কি যুবক, কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেরই আঁ হজরতের জীবনী পাঠ করা উচিত এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ যতদূর সম্ভব অনুকরণ করা বিধেয়। যিনি সমন্তঃকরণে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে চেষ্টা না করিয়াছেন, তিনি অপূর্ণ আছেন। কেবল ঈমান আনিলে, কেবল কলেমা পাঠ করিলে, কেবল পীরের 'বায়েত' (১) গ্রহণ করিলে মোছলেম হওয়া যায় না। ঐ নামের উপযোগী হইতে হইলে ঈমানকে সঞ্জীবিত করা আবশ্যক। ঈমানকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ অত্যাবশ্যক। তিনি একাধারে রাজাধিরাজ ছিলেন, তিনি সমাজনীতির

(১) দীক্ষা।

একমাত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন, তিনি সৈনিকপুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি শরিয়তের 'বাণী' (১) ছিলেন, তিনি মারফতের কুঞ্জিকা ছিলেন, তিনি ভ্রাতৃবৎসলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তিনি বিনয়ের আকর ছিলেন, তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অবতার ছিলেন।

ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণ কেবলমাত্র প্রত্যাদেশ আনিয়াছিলেন এবং সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরিচালনার জন্য কতিপয় নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের জীবনীতে ঐ নিয়মগুলি সম্যক কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আঁ-হজরত কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ শিক্ষক স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী একটী দর্পণ স্বরূপ। উহাতে উদারতা, মহানুভবতা ক্ষমাশীলতা, সাহসিকতা, নম্রতা ও সহিষ্ণুতার ছবি বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনী 'কোর্‌আন্‌' শরিফের একটী বৃহৎ তফছির স্বরূপ। কোরআন্‌-পাকে যে সমস্ত সদ্‌গুণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনীতে তাহা বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। কোর্‌আন্‌-পাকে যে সমস্ত দোষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনীতে তাহার সম্পূর্ণ বর্জ্জন পরিলক্ষিত হইত। কোর্‌আন্‌-মজিদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবগতির জন্য তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ মোছ্‌লেমের একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল।

তিনি একাধারে স্নেহময় পিতা, প্রেমিক স্বামী, হৃদয়বান বন্ধু, সূক্ষ্ম ও সদ্বিচারক, সুনিপুণ সৈনিক, আইনজ্ঞ সুশাসক এবং শাসননীতি-কুশল রাজাধিরাজ ছিলেন। পুঞ্জীভূত গুণবত্তা তাঁহাতেই বিদ্যমান ছিল। তিনি অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় কেবল মৌখিক শিক্ষা দিয়া বিরত হন নাই, স্বীয় কার্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি সকলের আদর্শ বলিয়া

(১) প্রবর্ত্তক।

সম্মানিত হইতেন। তাঁহার মাহাত্মের কথা ইউরোপীয় লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রেটবৃটেনের হিগিনস্‌, ডেভেনপোর্ট, বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ্‌ ও কার্‌লাইল, জার্ম্মাণির গ্রীম্‌ ও ক্রেইল এবং ইটালির সিটনির নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা একমুখে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথমাংশে যে সমস্ত রীতি নীতি বর্ণিত হইয়াছে, ঐগুলি দৃষ্টান্তচ্ছলে আঁ হজরতের জীবনী মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে। বীজ যেমন বৃক্ষাকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ফলফুলে শোভিত হয় তেমনি ইছ্‌লাম তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। পুরাকালে যে সমস্ত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপে ইছ্‌লামের কিয়দংশের মাত্র আভাস পাওয়া যায়। উহার পূর্ণত্ব আঁ-হজরতের জীবনীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনিই ইছ্‌লামের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই এই পুস্তকের সহিত তাঁহার পবিত্র জীবনী প্রদত্ত হইল।

আদর্শ মহাপুরুষ।

আরবদেশ—আরবদেশ এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এইজন্য ইহাকে প্রাচীন পৃথিবীর কেন্দ্র বলা হয়। আরবের প্রায় চতুর্দ্দিক্‌ জলবেষ্টিত বলিয়া ইহাকে "জজিরাতুল আরব" বা আরব উপদ্বীপ কহে। পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য এইস্থান সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট। এই জন্যই প্রধান প্রধান পয়গম্বরগণ এইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্ব্বে পারস্যোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে এশিয়া মাইনর। ইহার আয়তন সমগ্র ইউরোপের এক চতুর্থাংশ এবং লোকসংখ্যা এক কোটির অধিক। আরবদেশ প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি স্বরূপ, এদেশের অধিকাংশস্থান

নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময়; তরু, লতা, তৃণ, গুল্মাদির চিহ্নও নাই; কোথাও নদ, নদী বা হ্রদ নাই। প্রচণ্ড রৌদ্র, বালুকারাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, একমাত্র উষ্ট্রের সাহায্যে এই ভীষণ মরুক্ষেত্র দিয়া লোক গমনাগমন করে। বৃষ্টি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে 'ছামুম' নামক প্রাণনাশক বায়ু প্রবাহিত হয়। বিদেশ হইতে পণ্যজাতের আমদানী না হইলে আরবীয় লোকের প্রাণরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। উপকূলভাগে ও অভ্যন্তরের কোন কোন স্থান কিঞ্চিৎ উর্ব্বর, তথায় বৃক্ষাদি জন্মে ও লোকের বসতি আছে।

আরব দেশে ৫টী বিভাগ যথা:—(১) হেজাজ (২) উত্তর আরব (সিরিয়া) (৩) ইমেন (৪) নজ্‌দ্‌ (৫) ওমান।

(১) হেজাজ:—ইহার অর্থ প্রতিবন্ধক। হেজাজের পর্ব্বতশ্রেণী যাতায়াতের প্রধান অন্তরায় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। আরবের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতময় প্রদেশই উক্ত নামে অভিহিত। এই প্রদেশেই পবিত্র মক্কা, মদিনা ও বিখ্যাত জেদ্দা নগরী অবস্থিত। জেদ্দা নগরী মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি এখানে মানবের আদি জননী বিবি হাওয়ার সমাধি দৃষ্ট হয়। মক্কা ও মদিনার জন্যই হেজাজের প্রাধান্য। কথিত আছে হজরত আদম আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট একটী উপাসনা গৃহের স্থান নির্দ্দেশজন্য বহুবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইনি ও হজরত হাওয়া এই হেজাজ ভূমিতেই তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীর উপত্যকায় বাস করিতেন। আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশানুসারে বায়তোলমামুরের নিম্নস্থ ধরাতল ফেরেস্তাগণের উপাসনার স্থান মনোনীত হইল। ইঁহারা আসিয়া সময় সময় এইস্থানে উপাসনা করিতেন। কথিত আছে হজরত আদম এইস্থানে বিংশতিবার হজ্জ করিয়াছিলেন। হজরত শীছ্‌ ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিও এই

পবিত্রস্থানে হজ্জ করিতেন। হজরত আদম হইতে মক্কা তীর্থস্থান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। আদম সন্ততিগণ যথায় তথায় বাস করিয়া এই স্থান দর্শন করিতে আসিত। আবেস্তা গ্রন্থে কাবা আদমের গৃহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হজরত নুহ যখন নিনিভি নগরে একত্ববাদ প্রচার করিতেছিলেন তখন মহা প্লাবন উপস্থিত হইয়া পাপাচারে পূর্ণ পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়াছিল। হজরত নুহ্ ঐশপ্রেরণায় একটী বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া তদীয় পুত্র ও পুত্রবধুগণ সহ ৮০ জন লোক উহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং যুগ্ম যুগ্ম প্রাণী ও উদ্ভিদবীজ সঙ্গে লইলেন। ছয়মাস পরে তরঙ্গ মালার মধ্যদিয়া তিনি আর্ম্মেনিয়ার আরারাট পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিলেন। এই মহাপ্লাবনে কাবার চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। হজরত নুহের একাদশ বংশ নিম্নস্থ প্রপৌত্র হজরত ইব্রাহিম ইরাক প্রদেশস্থ বাবল্ নগরে পৌত্তলিক গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ব স্রষ্টার বিদ্যমানতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত আদম যে স্থানে প্রথম উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তথায় হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্ তায়ালার প্রত্যাদেশ অনুসারে সশিশু বিবি হাজেরাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহিম এবং তদীয় শিশুপুত্র হজরত ইছ্মাইল মহাপ্লাবনে বিলুপ্ত কাবার স্থলে পুনঃ কাবাগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। হজরত ইছ্মাইল মক্কা প্রদেশের শাসক ও কাবাগৃহের রক্ষক ছিলেন। হজরত ইছ্মাইলের পুত্র কেদার (যাহার নামানুসারে তৌরাতে আরবদেশ অনেকস্থলে কেদার নামে আখ্যাত হইয়াছে) এবং কেদারের অধঃস্তন বংশে ফেহের নামক জনৈক বিখ্যাতব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই উপাধি কোরেশ ছিল এবং ইঁহার সন্তান সন্ততিগণ আরবদেশে কোরেশ নামে আখ্যাত। হাসেম এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মক্কা ও কাবার কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কাবার অধ্যক্ষের সম্মান রোমের পোপ ও কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান অপেক্ষা বহুপরিমাণে অধিক ছিল। তিনি বিশেষ পবিত্রব্যক্তি ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইতেন, বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ডিক্টেটার হইতেও তিনি অত্যধিক শ্রদ্ধেয় ছিলেন। অনেকবার কাবাগৃহের জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে। তুর্কি খলিফা সোলতান মোরাদ কাবার ভিত্তির উপর মহাড়ম্বরের সহিত মর্ম্মর প্রস্তরের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া হেরমের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। মদিনা আগ্নেয়গিরি হইতে উৎপন্ন। উহা স্থানে স্থানে উর্ব্বর। তায়েফ একটী মরুস্থান। ইহার জলবায়ু স্নিগ্ধ এবং এখানে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। মক্কা হইতে ধনী ব্যক্তিগণ গ্রীষ্মকালে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তায়েফের পর্ব্বতগুলি ছয় হাজার ফিটের অধিক উচ্চ। হেজাজের প্রধান পণ্যদ্রব্য খেজুর। ইউরোপ, মেছের ও ভারতবর্ষ হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানী হয়। এখান হইতে রপ্তানি অতি অল্পই হইয়া থাকে।

(২) উত্তর আরব :—এইদেশে দামেস্ক, বেরুত, আলেপ্পো, জেরুছালেম, ইরাক, বোগদাদ, কুফা, কারবালা, বছরা অবস্থিত। সিরিয়া ও ইরাক প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

(৩) ইমেন—এইদেশ দক্ষিণভাগে অবস্থিত ও অতি উর্ব্বর। এখানে প্রচুর কাফি জন্মে। ছাবায়ীগণ এই দেশের অধিবাসী ছিল। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পারসিক সম্রাট ১ম খসরু ইমেন অধিকার করেন। খসরু ২য় পরভেজের রাজত্ব কালে এই দেশ ইছ্‌লাম গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ইহা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৪) নজ্‌দ্‌—ইহা মধ্য আরব দেশীয় মরুভূমির উত্তরে অবস্থিত। ইহা একটী মালভূমি। এখানে সুন্দর সুন্দর ঘোড়া পাওয়া যায়।

(৫) ওমান—ইহা আরবের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত। ইহার উপকূল ভূমি উর্ব্বরা। আরবেরা ইহাকে 'আল্-বাহারাইন' নাম দিয়াছিলেন। ওমানের ছোলতান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বাধীন বিবেচিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ অঃ ১৮ই নভেম্বর ছোলতানকে জি, সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল।

আরবের অধিবাসিগণ কাফি ও চাপানে বিশেষ আসক্ত। পুরুষগণ কর্ম্মঠ ও যুদ্ধ নিপুণ। বেদুইন স্ত্রীগণ পানীয় জল ও কাষ্ঠ আহরণ করে, পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে ও রন্ধন কার্য্যের সংস্থান করে। খেজুর ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের পোষাক অতি সাধারণ, কেবল মাত্র একটী লম্বা পিরহান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। সম্পন্ন লোক ব্যতীত অপর কেহ জুতা ব্যবহার করে না। কোন বেদুইন দলপতি অপর সম্প্রদায়ের লোককে স্বীয় অধিকারে প্রবেশ করিতে দেয় না।

হজরত ইছ্মাইল মক্কা নগরীতে অবস্থিতি করিতেন। প্রাচীন কালে এই নগর বক্কা নামে অভিহিত ছিল। উত্তর আরবের লোকগণ ইছ্মাইল বংশ সম্ভূত। ইমেন অর্থাৎ দক্ষিণ আরবের অধিবাসিগণ কাহ্তান (বাইবেল লিখিত যোক্‌তান্) বংশ হইতে উৎপন্ন।

মদিনাবাসী আন্‌ছারগণ ইউমেণী সম্প্রদায় ভুক্ত। মক্কাবাসী কোরায়েশগণ ইছ্মাইলী সম্প্রদায় ভুক্ত। পুরাকাল হইতে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা বদ্ধমূল ছিল। কোরায়েশগণ মদিনাবাসীদিগকে ভূমিকর্ষক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত। মদিনাবাসিগণও মক্কাবাসীদিগের সহিত অনেক সময় শত্রুতার প্রতিদান দিতে অবসর খুঁজিত। হজরত ইছ্মাইল জোর্‌হাম বংশে বিবাহ করেন। জোর্‌হাম বংশীয়গণ ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ইমেন অধিপতি কাহ্তান মধ্য আরব আক্রমণ করিয়া জোরহামও ইছ্মাইল বংশীয়গণকে পরাভূত করত স্বীয়

রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহারই পুত্র ইয়ারেব হইতে আরবের নামাকরণ হইয়াছে কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন। কালে ইছ্মাইল বংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

কোরায়েশ বংশের নছব নামা :—

হজরত ইছমাইল (আ:)র ৪০ পুরুষ পরে আদনান্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আদ্নানের বংশধর ফেহের কোরায়েশ নামে অভিহিত ছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পঞ্চম বংশধর কোছায় ৩৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন। ফেহের ও তাঁহার বংশাবলী বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা কোরায়েশ নামে অভিহিত হইতেন। কোছায় কাবাগৃহের দক্ষিণ পশ্চিমে 'দারুন্নদোয়া' নামক একটী সভাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সভাগৃহ উম্মীয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মালেকের রাজত্বকালে মছ্জেদে পরিণত হইয়াছিল। কোরায়েশগণ সমিতি গঠন করিয়া এই গৃহে কোছায়ের নায়কত্বে শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা ও মীমাংসা করিত। এই সমিতির সভ্য হইবার জন্য অন্ততঃ ৪০ বৎসর বয়স হওয়া প্রয়োজন ছিল। আঁ হজরতের সময়েও এই স্থানে কোরায়েশগণ সমবেত হইয়া জটিল বিষয়াদি মীমাংসা করিতেন। কোছায় ৪৮০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আব্দে মনাফ শাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আব্দ শমছ্ মক্কায় জল সরবরাহ ও কর আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। আব্দ শমছ তাঁহার ক্ষমতা তদীয় ভ্রাতা হাসেমকে অর্পণ করেন। হাসেম দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর শীতকালে একটি কাফেলা ইমেন দেশে ও গ্রীষ্মকালে আর একটী সিরিয়া দেশে প্রেরণ করিতেন। ৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্যাম দেশ অতিক্রম কালে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা মত্তালেব (যিনি আল ফয়েজ নামে খ্যাত ছিলেন) তাঁহার পদ অধিকার করেন। ৫২০ খৃষ্টাব্দে মত্তালেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শায়েবা (যিনি আব্দুল মত্তালেব নামে অভিহিত ছিলেন) মক্কার সাধারণতন্ত্রের নায়ক মনোনীত হইলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ ছিল। সমস্ত কোরায়েশ জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের নরপতিগণও তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি কোছায় বংশীয় ১০ জন নেতার সাহায্যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহারা শরিফ নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের পদ পুরুষানুক্রমিক ছিল। আব্দুল মত্তালেবের ১২টী পুত্র ও ৬টী কন্যা ছিল। তাঁহার পুত্র আবদুল্লা জহুরী বংশীয় দলপতি ওহাবদুহিতা সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-ললামভূতা বিবি আমেনাকে বিবাহ করেন। ইঁহারই গর্ভে ইছ্লাম-কুলতিলক পয়গাম্বর শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাচীন আরব—

আরববাসিগণ প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সাহসিকতা, বাগ্মিতা, অতিথি পরায়ণতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত। ইহারা হস্তশিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ নিপুণ। ইহারা সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কার্য্য করিত, তীর, অসি, ও বর্ম্ম প্রস্তুত করিত, বস্ত্রবয়ন ও সেলাইর কার্য্য করিত।

আরবের অস্ত্র শস্ত্র, যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধাশ্ব সর্ব্বত্র বিদিত। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সমস্ত গুণের মধ্যেও তাহাদের কতিপয় বিশেষ দোষ পরিলক্ষিত হইত। ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরববাসী অসভ্য ও দুর্দ্দান্ত বলিয়া পরিগণিত ছিল। তৎপূর্ব্বে উহারা উষ্ট্র ও মেষপাল লইয়া বেদুইনদিগের ন্যায় বিচরণ করিত। উহারা ৩২ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল

এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত। তাহারা গৃহবিবাদ, দস্যুতা, কন্যা-হত্যা প্রভৃতি পাপাচরণের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। মদ্যপানে তাহাদের এতই আসক্তি ছিল যে, শিশুগণ মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিয়াই পানাভ্যাসে রত হইত। মনুষ্যের জীবন লইয়া ক্রীড়া করা তাহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। সাধারণ কথা প্রসঙ্গে এইরূপ বিবাদ উঠিত যে, শত শত বৎসরেও তাহার মীমাংসা হইত না। তাহারা নিষ্পাপ শিশুদিগকে জীবন্ত অবস্থায় কবরস্থ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিত না। কাহাকেও জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহাদের বংশের সম্ভ্রম হানি হইবে, এই ভয়ে কন্যাদির পাণিগ্রহণে সম্মতি প্রদান করিতে তাহারা অপযশের কারণ মনে করিত। পুরুষ যথেচ্ছ বিবাহ করিতে সমর্থ হইত এবং যথেচ্ছ পরিত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। হিংসা ও বিবাদ তাহাদিগকে পশু হইতেও নিকৃষ্ট করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে কোন প্রকার জাতীয় বন্ধন ছিল না। উহারা সম্প্রদায়সমষ্টি ছিল মাত্র। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য ও স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার ছিল। সম্প্রদায়স্থ কোন ব্যক্তির উপর কেহ অত্যাচার করিত না কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর চুরি, হত্যা, দস্যুতা ও ব্যভিচার করিতে তাহারা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না। তাহাদের সামাজিকতা ও নৈতিক শাসন বড়ই শিথিল ছিল।

আরবে প্রতি বৎসর অতি ধুমধামের সহিত মেলা বসিত। ঐ মেলায় বহুলোকের সমাবেশ হইত এবং তথায় অসমসাহসিকতার পরিচয় দেওয়া হইত। মক্কাভূমির মধ্যেও একটী মেলা বসিত। ঐস্থান 'কাবা' বলিয়া আজকাল মোছ্‌লেম জগতে পরিচিত। ঐ সময় কাবাগৃহে বহু সংখ্যক প্রতিমূর্ত্তি দৈনিক পূজিত হইত। এই মেলাতে শক্তি সামর্থ্যের ক্রীড়া চলিত, কছিদা প্রভৃতি পঠিত হইত;

অসি চালনায় নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত এবং দ্বন্দ্বকলহের বীজ উপ্ত হইত। এই প্রদর্শনীতে দুশ্চারিত্র্যের এরূপ পরিচয় দেওয়া হইত, যাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ইহারা পূর্ব্বপুরুষদিগকে পূজা করিত, মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ প্রদান করিত, নরবলি দিতেও পরাঙ্মুখ হইত না। উহারা নরমাংস ভোজন করিত, প্রতিশোধ-জন্য পরাজিত শত্রুর উপর ভীষণ অত্যাচার করিত, পরকাল বিশ্বাস করিত না, পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার স্বীকার করিত না, কেবল ঐহিক ভোগসুখে আসক্ত হইয়া পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকিত।

আঁ হজরতের জন্মের প্রাক্কালে আরবের কোন স্থানে বিশেষ প্রতাপান্বিত কোন স্বাধীন রাজা ছিলেন না। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য আরবের যাযাবর জাতিদিগকে জাতীয় গঠনে গঠিত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নেজদ্‌ ও হেজাজ প্রদেশের যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতা বর্ত্তমান ছিল। আরবের অন্যান্য অংশে গ্রীক ও পারশীকদিগের যথেষ্ঠ প্রভুত্ব ছিল। ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আবিসিনিয়াবাসিগণ আরবের ছাবায়ীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে পারশীকগণ খৃষ্টানদিগকে বিতাড়িত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ঐ সময় হইতে পারশীক অধিকারের সূত্রপাত হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উহাদিগের ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও গ্রীকদিগের প্রভুত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণের সহিত কোরায়েশগণের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এইজন্য কোরায়েশগণের মধ্যে কিছু কিছু লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। মক্কার অভ্যন্তরস্থ কোরায়েশগণ বনুকায়াব শ্রেণীভুক্ত ছিল এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের কোরায়েশগণ বনু হামির সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

প্রাচীন আরবে একেশ্বরবাদ—

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রাচীন আরব হইতে পৌত্তলিকতার ধ্বজা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। হজরত আদমের পর ইনিই সর্ব্বপ্রথম একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। প্রাচীন আরববাসী ইঁহাকে নানাপ্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে সযত্ন হইয়াছিল। ঐশীশক্তির মাহাত্ম্যেই তিনি ভীষণ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পর আরবদেশ আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে থাকে। ক্রমে অধিকাংশ আরববাসী গৃহে গৃহে প্রতিমা পূজা করিতে লাগিল এবং তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠিত প্রতিমূর্ত্তিগুলির সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে উহারা জগৎ-পাতার নিকট সুপারেশ এবং অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়তা করিবে। এই সকল প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। হবল, বোত, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাছাব, ওজ্জা, লাত, মনাত প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তিগুলি বিশেষভাবে পূজিত হইত।

আঁ হজরতের প্রেরিতত্ব লাভের পূর্ব্বেও কোন কোন আরববাসী পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহারা হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইছমাইলের প্রচারিত ধর্ম্ম অনুসরণ করিত এবং ভাবী ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা করিত। ইহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মকে অসত্য মনে করিয়া পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকিত। ইহারা হানিফ নামে অভিহিত হইত। তায়েফের উম্মীয়া বিন্ আরছালাত, মক্কার জায়েদ বিন্ আমর এবং মদিনার আবু কয়েছ ও আবু আমির প্রসিদ্ধ হানিফ ছিলেন। ইঁহারা কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্গত না হইলেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন। ইঁহারা আল্লাহ্‌তাআলার একত্ব স্বীকার করিতেন এবং সর্ব্বদা আত্মার উন্নতির

জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। আঁহজরতের প্রেরিতত্ব লাভের অনতিকাল পরেই ইঁহারা ইছ্লাম গ্রহণ করেন।

আঁহজরতের বাল্যজীবন—

হজরত রছুলপাকের জন্মের পূর্ব্বে সমস্ত আরবদেশ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। প্রতি গৃহ দুষ্কার্য্যের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। যখন ঐরূপ অজ্ঞানান্ধকারে আরবদেশ আচ্ছন্ন ছিল, তখন আরবের বনি হাসেম গোত্রে বিখ্যাত কোরায়েশ বংশে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ খ্যাতনামা হাসেম শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে মক্কা ও কাবা গৃহ রক্ষা করিয়া ছিলেন বলিয়া মক্কা ও কাবার শরিফের পদ বনি হাসেমীর মধ্যে মৌরশী হইয়াছিল। আরববাসিগণ চিরকালই শরিফের পদ দখল করিয়া আসিতেছেন। যখন আঁহজরত জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতামহ আবদুল মত্তালেব কাবার শরিফ ছিলেন। আবদুল মত্তালেবের প্রকৃত নাম শায়েবা। ইনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইঁহার পিতা হাসেমের মৃত্যুর পর ইনি পিতৃব্য মত্তালেব কর্ত্তৃক মক্কায় আনীত ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই ইনি আবদুল মত্তালেব নামে পরিচিত ছিলেন। আবদুল মত্তালেবের পুত্র আবদুল্লা অত্যন্ত রূপবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রূপ লাবণ্যে সকলে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ইনি ২৪ বৎসর বয়সে ওহাবের কন্যা বিবি আমেনাকে বিবাহ করেন। ইনি রূপে গুণে তদানীন্তন নারী কুলের শিরোভূষণ ছিলেন। বিবাহের কিয়ৎকাল পরে আবদুল মত্তালেব আবদুল্লাকে সিরিয়া দেশে এক কাফেলার সহিত তেজারতে পাঠাইয়া ছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে আবদুল্লা রোগাক্রান্ত হইয়া মদিনায় কোন কুটুম্বের গৃহে অবস্থিতি করেন এবং তথায় দেহত্যাগ করেন। দারোন্নাব্কা

স্থানে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হয়। ওয়াকেয়ায়ে ফিলের (১) ৫০ দিন পরে ১২ই রবিওলআউয়াল সোমবার ২৯ শে আগষ্ট ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পয়দা হইয়াছিলেন।

পয়দাসের খোসখবর শুনিবামাত্রই দাদা আবদুল মত্তালেব দৌড়িয়া আসিলেন ও নিষ্পাপ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কাবাগৃহের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া খোদাতালার শোকরিয়া (২) আদায় করিলেন। আঁহজরতের জন্মের প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে হজরত নুহ্, ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে হজরত ইব্রাহিম, ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে হজরত মুছা, ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে হজরত দাউদ ও ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে হজরত ইছা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কয়েক দিন স্বয়ং হজরত আমেনা শিশুকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। সাত দিবস পরে আরব দেশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে

টীকা (১) ওয়াকেয়ায়ে ফিল্:—ইহা আরবের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা ৫৭০ খৃঃ সংঘটিত হয়। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক যাত্রী কাবা জেয়ারত করিতে আসিত। তদ্ধেতু মক্কা নগরীর সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজপ্রতিনিধি আব্‌রাহা ইহাতে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়। এই আব্‌রাহা ইমেন সহরে প্রতিনিধিত্ব করিত ও ইমেনের রাজধানী ছানাতে মহা আড়ম্বরের সহিত একটা গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্রমে গীর্জ্জার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাত্রিগণ তাহার রাজধানীতে জেয়ারত করিতে আসিবে। মক্কাবাসিগণ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং এই গীর্জ্জার অবমাননা মানসে জনৈক মক্কাবাসী একদা রাত্রিকালে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আব্‌রাহা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে। মক্কার কোরায়েশগণ আবিসিনিয়ার সৈন্য দেখিয়া ভয়ে স্ত্রী পুত্র লইয়া নিকটস্থ পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু সৈন্যগণ নিকটবর্ত্তী হইলে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং চটক সদৃশ ক্ষুদ্র আবাবিল পক্ষী

আবদুল মত্তালেব সমস্ত কবিলাকে (৩) দাওয়াত করিয়াছিলেন এবং অতি ধূমধামের সহিত মজলেছ অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন ও সকলের সম্মুখে শিশুর নাম মোহাম্মদ (দঃ) রাখিয়াছিলেন। লোকে এইরূপ নাম করণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আবদুল মত্তালেব বলিয়াছিলেন, "আমার পৌত্র সমস্ত পৃথিবীর প্রশংসার উপযুক্ত হইবে,"—মোহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। অন্য রাওয়ায়েতে (৪) কথিত আছে, হজরত আমেনা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মিবে ও তাহার নাম 'আহ্মদ' রাখিতে হইবে। তদনুসারে প্রসূতি সন্তানের নাম 'আহ্মদ' রাখিয়াছিলেন ঐ সময়ে আরবদেশে ধাত্রী দ্বারা শিশুসন্তানের স্তন্য পানের বন্দোবস্ত করা হইত। সম্ভবতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ আরবের এই চিরন্তন প্রথারই অনুসরণ করিয়াছেন।

বনিছায়াদের হালিমা নাম্নী রমণী এই নবপ্রসূত শিশুকে স্তন্য দানের ভার গ্রহণ করিলেন। ইনি দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য স্ত্রীলোকসহ মক্কায় আসিয়াছিলেন। প্রতিমাস অন্তর

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া উড়িয়া তাহাদের উপর ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐশ আদেশে এই প্রস্তরাঘাতে অশ্ব ও আরোহিগণ এবং হস্তীসহ আব্রাহা যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তৎপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় এবং ভীষণ প্লাবনে অগণিত সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অাঁ। হজরতের জন্মতারিখ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ঐ সনের ২০শে আগষ্ট। কেহ কেহ বলেন ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল। ৫৭০ খৃষ্টাব্দই প্রকৃত তারিখ। ৫৭১ খৃঃ ভুল বলিয়া মনে হয়।

(২) কৃতজ্ঞতা (৩) সম্প্রদায় (৪) বর্ণনা।

তিনি শিশুকে মাতা ও পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে আনিতেন। শিশুর বয়স দুই বৎসর হইলে দস্তুরমোতাবেক স্তন্যপান বন্ধ করা হইয়াছিল। হালিমা শিশুকে লইয়া মাতার নিকট আসিলেন। দূরদর্শিনী মাতা শিশুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া নিজের কাছে রাখা সঙ্গত মনে করিলেন না। পাছে সেখানকার জলবায়ু শিশুর অনুকূল না হয়, এই ভয়ে হালিমার হস্তে শিশুকে পুনরায় অর্পণ করিয়া আদেশ করিলেন, 'তুমি শিশুকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর ও উহাকে লালন পালন করিতে থাক। যখন শিশু হুসিয়ার হইবে, তখন আমি ডাকিয়া পাঠাইব।'

ইহা খোদাওন্দ করিমের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া বোধ হয় যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) শৈশবাবস্থায় সহরের বহুদূরে গ্রাম্য পর্ণকুটীরে লালিত পালিত হইয়া পরিণত বয়সে গুরুভার বহন করত ঐশ্বরিক রহস্যের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দিতে সক্ষম হন। যে বালক যৌবনকালে বিশুদ্ধ আরব্য ভাষায় খোদাতাআলার "ওহি" (প্রত্যাদেশ) জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তিনি নিরক্ষর পরিজনের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে সমাজ শিক্ষার রশ্মি তাঁহার উপর প্রতিফলিত হয় নাই। দুর্দ্দান্ত সহবাসে থাকিয়াও তিনি শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন।

হালিমা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শিশুকে আরও দুই বৎসরকাল লালনপালন করিয়াছিলেন। হালিমার গৃহে অবস্থানকালে হজরত মেষচারণ করিতেন। অন্যান্য পয়গম্বরও ইঁহার ন্যায় মেষচারণ করিয়াছেন। যাহা হউক কিছুদিন পরে হালিমা বালককে মাতার নিকট পুনরায় লইয়া আসিলেন। যখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর হইয়াছিল, তখন তিনি মাতার সহিত মদিনায় গিয়াছিলেন এবং মদিনা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননী 'আরওয়া' নামক স্থানে

প্রাণত্যাগ করেন। এই দুঃসময়ে আব্দুল মত্তালেব পৌত্রের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে আট বৎসর বয়স না হইতেই এতিম বালকের পিতামহও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপর তাঁহার পিতৃব্য আব্দে মনাফ (যিনি আবুতালেব নামে অভিহিত) তাঁহার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে কেবল মাত্র বরকত নাম্নী দাসী ও দুইটী উট এবং কতিপয় মেষ ছিল। ইহাও সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত ছিল যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া দরিদ্র এতিম বালক বালিকার দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার সুযোগ পান।

মোছ্লেম ধর্ম্মে এতিম মিছকিনের জন্য যেরূপ খয়রাতের প্রথা প্রচলিত আছে, সেরূপ অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। খোদাওন্দকরিমের ইচ্ছা পূরণ করিতেই বোধ হয় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মাতা, পিতা, পিতামহ সকলকে অকালে হারাইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া চিন্তা ও বিচার শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। জন্মভূমির উচ্চ পাহাড়, বিস্তৃত বালুকাময়ী মরুভূমি, গভীর নির্জ্জনতা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের সহায়তা করিয়াছিল। তিনি বাল্যকালে প্রায়শঃ নির্জ্জন পর্ব্বতে একাকী পরিভ্রমণ করিতেন ও স্বাভাবিক দৃশ্য হইতে শিক্ষালাভ করিতে অনেক সময় "হেরা" নামক পর্ব্বতগুহায় অবস্থিতি করিতেন ও নির্জ্জনে ঐশীচিন্তা করিতেন।

পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী

আবুতালেব স্বীয় এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রকে নেহায়েত আদর ও স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের মধ্যে মহব্বত এতই গাঢ় হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহারা পরস্পর পৃথক থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন।

বার বৎসর বয়ঃক্রমকালে আবুতালেবকে সিরিয়া দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতে হয়। তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পিতৃব্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা কাফেলার সহিত বছরা পৌঁছিলে তথায় বহিরা নামক জনৈক পাদ্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি হজরত মোহাম্মদের সহিত কথোপকথন করিয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মিষ্টভাষ, অমায়িকতা, শিষ্টাচার ও অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তিনি আবুতালেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'এই বালক কালে সমগ্র আরবের গৌরবরবি হইবে এবং আরব হইতে পৌত্তলিকতার চিহ্ন চিরতরে মুছিয়া দিবে। দেখিও, এই বালক যেন ইহুদীদিগের প্রতারণায় নিপতিত হইয়া বিনষ্ট না হয়।' ইহা ও কথিত আছে যে, উক্ত পাদ্রী ঐ বালক সম্বন্ধে ইহাও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, "মছিহ্‌ বিন্‌ মরিয়ম ইঁহারই আসিবার বার্ত্তা দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই ইঁনি খোদার রছুল এবং শেষ নবী হইবেন।" আবুতালেব পাদ্রীর এই কথা শুনিয়া অতি যত্নের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পূর্ব্বোক্ত "ছফর" হইতে মহতী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং বিশ্বপতির মাহাত্ম্য ও প্রভুত্ব প্রতি বৃক্ষ-পত্রে প্রতিফলিত দেখিতেন। এই প্রকৃতি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি অন্য কোন স্থান হইতে কোনপ্রকার শিক্ষা লাভ করেন নাই। তাঁহার সমগ্র সম্প্রদায়ই প্রায় অশিক্ষিত এবং বর্ণজ্ঞান শূন্য ছিল। সমস্ত কোরায়েশ মধ্যে আঁ হজরতের সময় মাত্র ১৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন—ওমর, ওছমান, আলী, আবুওবায়দা, তাল্‌হা, জায়েদ ইত্যাদি।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম অবতরণ—

কিছুকাল পরে কোরায়েশ বংশের সহিত 'বনি হাওয়াজেন' দিগের লড়াই হইয়াছিল। এই লড়াই আরব ইতিহাসে "হারবোল কোজ্জার" নামে অভিহিত হয়। ঐ সময় হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বয়স মাত্র ১৪ বৎসর ছিল। ইনি আবুতালেবের সহিত এই যুদ্ধে সঙ্গী হইয়াছিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম আঁ হজরত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইতি মধ্যে ইঁনি ইমেন দেশে বাণিজ্য যাত্রা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সত্যতা, সাধুতা, সদ্বিচার ও ক্ষমাগুণ দেখিয়া লোকে ইঁহাকে 'ছাদেক' (১) ও "আমিন' (২) আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

এই সময়ে খোদেজা নাম্নী জনৈকা বিধবা স্ত্রীলোক মক্কা নগরে বাস কবিতেছিলেন। ইনি বাহ্যসৌন্দর্য্য ব্যতীত অলৌকিক গুণগ্রামের আধার ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি আরও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্বামী বড়ই ধনপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর একজন কার্য্যাধ্যক্ষের প্রয়োজন হয়। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সুখ্যাতির কথা শুনিয়া বিবি খোদেজা তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) চাচার সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। বিবি খোদেজার মাল লইয়া তেজারতি করিবার জন্য তিনি ইমেন যাত্রা করিলেন এবং তাহাতে বিশেষ লাভবান হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা এবং ন্যায়পরতায় সাতিশয় প্রীত হইয়া বিবি খোদেজা উঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব

(১) সত্যবাদী (২) বিশ্বাসী।

করিলেন। ঐ সময় ইহাঁর বয়স ২৫ বৎসর ও বিবি খোদেজার বয়স ৪০ বৎসর। উক্ত প্রস্তাবের ফলে আঁ। হজরতের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর খোদেজা স্বীয় ক্রীতদাস জায়েদকে আঁ। হজরতকে দান করিয়াছিলেন। আঁ। হজরত উহাকে পাইবামাত্রই উহার মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জায়েদ (১) আজীবন আঁ। হজরতের সেবায় নিযুক্ত ছিল। তাহার পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও জায়েদ স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হয় নাই। এই ঘটনা দ্বারা আঁ। হজরতের উদারতার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইযাছিল।

বিবাহ কালে বিবি খোদেজার পূর্ব্বপক্ষ হইতে ২টী পুত্র ও ১টী কন্যা ছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আঁ। হজরত যৌবন বা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে বিবি খোদেজার পাণিগ্রহণ করেন নাই। আঁ। হজরত ইচ্ছা করিলে তৎকালীন লৌকিক নিয়মানুসারে বহু সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিতেন। বিবি খোদেজা এই বিবাহে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সমগ্র কোরায়েশ সম্প্রদায়কে ধুমধামের সহিত পান ভোজন করান। বিবাহের পর উভয়ে পনর ষোল বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা

(১) জায়েদ কলব সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। একদা তাহার মাতা উহাকে লইয়া স্বজাতীয়ের নিকট যাইতেছিল। পথিমধ্যে কতিপয় অশ্বারোহী তাহার মাতাকে ভয় দেখাইয়া জায়েদকে হস্তগত করে এবং অবশেষে বিক্রয়ার্থ ওকাজ তাহাকে বাজারে উপস্থিত করে। তথা হইতে বিবি খোদেজা উহাকে খরিদ করেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ আঁ। হজরতকে প্রদান করেন। পুত্রকে হারাইয়া জায়েদের পিতা বড়ই অস্থির হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে পিতা শুনিতে পাইল যে, জায়েদ মক্কাতে অবস্থিতি করিতেছে। পিতা তৎক্ষণাৎ আঁ। হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রের নিষ্ক্রয়ার্থ প্রদানের প্রস্তাব করে। কিন্তু জায়েদ স্বাধীনতার জন্য আদৌ উদ্বিগ্ন ছিল না। সে হজরতের নিকটেই থাকিতে পছন্দ করিয়াছিল।

নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিবি খোদেজার গর্ভে ক্রমে চারিটী কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে রোকেয়া, জয়নব, ফাতেমা ও উম্মেকুলছুম এবং পুত্রের নাম কাছেম ছিল। কাছেম শৈশবাবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বিবি খোদেজার প্রতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বিশেষ মহব্বত ছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় হজরত অন্য বিবাহ করেন নাই। বিবি খোদেজার মৃত্যুর পর অনেক সময় কথা প্রসঙ্গে তাঁহার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন ও বলিতেন যে, সর্ব্বপ্রথমে তিনি বিবি খোদেজার সাহায্য পাইয়া সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সকলের প্রথম বিবি খোদেজাই তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত আরববাসী তাঁহার শত্রুতা করিয়াছিল, তখন বিবি খোদেজাই তাঁহার একমাত্র পৃষ্ঠ-পোষিকা ছিলেন। যখন তিনি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পীড়িত হইতেন, তখন বিবি খোদেজাই তাঁহাকে আশাবাণী দিয়াছিলেন। পিতামাতার অভাব বিবি খোদেজাই অপনোদন করিয়াছিলেন। তিনি সহধর্ম্মিণী হইলেও কর্ত্রী ছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি কখনও তাঁহার অমতে কোন কার্য্যে ব্রতী হইতেন না। বিবি খোদেজা যেমন পরিণত বয়স্কা ছিলেন, তেমনি সাধ্বী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার জীবিত কাল মধ্যে (এই সময় আঁ হজরতের পূর্ণ যৌবন) তিনি কখনও দ্বিতীয় বিবাহের বিষয় মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। বিবি খোদেজা দেহত্যাগ না করিতেই আঁ হজরত ঐশী চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার "রূহানী গল্‌বা" (আধ্যাত্মিক প্রেরণা) এত অধিক হইত যে, তাহাতে মাসাধিক কাল তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য থাকিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি জাগ্রতাবস্থায়

স্বপ্ন দেখিতেন ও আত্মহারা হইতেন। যখন তিনি অত্যধিক অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখন হজরত খোদেজার নিকট দৌড়িয়া আসিতেন ও স্বীয় উদ্বিগ্নতার কথা প্রকাশ করিতেন। কখনও কখনও তিনি উন্মত্তের ন্যায় পড়িয়া যাইতেন, কখনও কখনও বা স্পন্দনহীন হইতেন। অতি শীতের দিনেও তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িত ও চেহারাতে রওনক (জ্যোতিঃ) আসিত। বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিত। যাহা হউক, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম হজরত খোদেজাই অবগত ছিলেন। ইহার পর হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কর্ম্ম জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল।

সমাজ সংস্কার—

এখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরবদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। হেরম শরিফের (পবিত্র কাবাগৃহ) প্রাচীরের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নিষিদ্ধ ছিল। কালে এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া আসিয়াছিল। মক্কা নগরীতে ক্রমে অরাজকতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দূরীকরণার্থ ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে অাঁ হজরত মক্কা নগরীতে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে ৪ জন সভ্য ছিল যথাঃ—ফজল, ফাজেল, মফাজ্জেল ও ফাজায়েল। ইহাদের নামানুসারে সমিতির নাম 'হালফোল ফজুল' রাখা হয়। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিলঃ—(১) প্রত্যেকে বিবাদ হইতে বিরত থাকিবে ও অপরের বিপদে সাহায্য করিবে। (২) দেশ হইতে দুস্ক্রিয়া দূর করিবে। (৩) মোছাফেরদিগের হেফাজত করিবে। এই আঞ্জমান কর্ত্তৃক লোকের জান ও মালের হেফাজত হইত। ইহারই অনুকরণ করিয়া ইহুদিগণ ইউরোপে Kinght hood এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোরায়েশগণ কিয়ৎকাল পরে ইহার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়াছিল। ওছমান বিন্ হারেছ ইছায়ী ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া মক্কা নগরীকে ইউনান বংশীয়দের হস্তে ন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ঐ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জন্ম ভূমিকে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর দাসত্ব হইতে রক্ষা করিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন কাবাগৃহ অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইয়াছিল, তখন মক্কাবাসিগণ উহার নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে আগ্রহান্বিত হয়। পরস্পরের মধ্যে "ছাঙ্গে আছওয়াদ" (কৃষ্ণ প্রস্তর) লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল। হজরত ইব্রাহিম খলিলোল্লার সময় হইতে এই প্রস্তরখণ্ড বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইয়া আসিতে ছিল। কে প্রথম এই প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নূতন ভিত্তি স্থাপন করিবে, তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে সকলেই এই রায় স্থির করিল যে, যিনি আগামী প্রত্যুষে সর্ব্বপ্রথম হেরম শরিফের মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারই রায় অনুসারে ফয়ছলা কস্থা হইবে। ঘটনাক্রমে সেদিন হজরত মোহাম্মদই (দঃ) সর্ব্বাগ্রে তথায় প্রবেশ করিয়া ছিলেন; সুতরাং তাঁহারই উপর মীমাংসার ভার অর্পিত হইল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, জমির উপর একটি বড় চাদর বিছাও। উহার উপর আমি স্বয়ং "ছাঙ্গে আছওয়াদ" স্থাপন করিব এবং প্রত্যেক কবিলার এক একজন চাদরের প্রান্তভাগ ধারণ করিবে ও তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। এই মীমাংসায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল।

হেরাপর্ব্বত মক্কা হইতে আরও ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। উহার উপরে একটী গুহা আছে। ইহাই 'গারে হেরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হামেসা গারে হেরায় অবস্থিতি করিয়া

নিভৃত ভাবে খোদাওন্দ করিমকে স্মরণ করিতেন এবং সর্ব্বদা অতি কাতর ভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন:—"খোদাওন্দা! তুমি জাহালতের (মূর্খতার) অন্ধকার হইতে এই দেশকে পরিষ্কৃত কর ও পৌত্তলিকতার কবল হইতে অধিবাসীদিগকে রক্ষা কর এবং সৎপথে আনয়ন কর।"

অবশেষে তাঁহার কাতর প্রার্থনা মহাদরবারে গৃহীত হইল। তাঁহার বয়স যখন ৪০ বৎসর, তখন তিনি নিশাকালে নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ ঐশ আদেশ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার উপর দিব্যজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইল। তিনি মোহাভিভূত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একখণ্ড রেশমী বস্ত্র হস্তে স্বর্গীয় দূত দণ্ডায়মান। আদেশ হইল 'পড়'। তিনি বলিলেন, 'আমি পড়িতে জানি না।' পুনরায় আদেশ হইল "সর্ব্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলা, যিনি রক্ত বিন্দু হইতে এনছানকে পয়দা করিয়াছেন, তাঁহার নাম লইয়া পড়। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মানুষকে কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছেন এবং যিনি অন্তঃকরণকে জ্ঞানরশ্মি দ্বারা আলোকিত করিতে পারেন, তাঁহারই নামে পড়"। হঠাৎ আঁ হজরতের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল এবং তিনি পড়িতে সক্ষম হইলেন। তিনি এই সময় অনৈসর্গিক প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদিক হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে একটী স্বর আসিয়া প্রবেশ করিল "মোহাম্মদ! তুমি খোদাতাআলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রছুল এবং আমি তাঁহার দূত জিব্রাইল।" রমজান মাসের ২৪শে তারিখ প্রাতে আঁ হজরত অত্যন্ত বিচলিত হইলেন ও হজরত খোদেজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার আত্মা বড়ই অস্থির ও চঞ্চল। আমাকে শীঘ্র ঠাণ্ডা পানি দাও ও আমাকে ভালরূপে আবৃত করিয়া রাখ। ইহা বলিতে বলিতেই তিনি

সংজ্ঞাহীন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি স্বীয় স্ত্রীকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে জার্ম্মান পণ্ডিতের মত—

জার্ম্মান পণ্ডিত অধ্যাপক ডিগেজি তাঁহার 'নোল্‌ডিক্‌ ফেস্‌ক্রিফ্‌ট্‌' নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি কালের ভাবাবেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:— "হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে প্রকার মোহ দ্বারা আবিষ্ট হইতেন, তাহাতে তাঁহাকে কোন ক্রমেই উন্মাদ বলা যায় না এবং তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভের পূর্ব্বে যে এই প্রকার কখনও ঘটে নাই, ইহাও নিশ্চিত।" স্পেঞ্জার সাহেব বলিয়াছেন, "হজরত মোহাম্মদ (দঃ) .... উন্মাদ ছিলেন, ইহা আদৌ বিশ্বাস্য নহে। বিংশ বর্ষাধিক কাল আমরা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) যে নিরন্তর কর্ম্ম-নিরত জীবন দেখিতে পাই, তাহা জনৈক উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যে স্থির বিচার-বুদ্ধির জন্য তাঁহার সম্প্রদায় বিখ্যাত, তাহা তাঁহার মধ্যে সম্যগ্‌ বিদ্যমান দেখিতে পাই। আত্মসম্মান-জ্ঞান, সূক্ষ্মবুদ্ধি, তৎপরতা, মানসিক সমতা এবং আত্ম কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত গুণাবলী কোন মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিতে দেখা যায় না। ঘটনাচক্রে তিনি পয়গম্বর হইতে ব্যবস্থাপক এবং শাসন-কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হন বটে, কিন্তু তিনি কেবল আল্লার রছুল, ইহার অধিক স্বীকারোক্তি কখনও কাহারও নিকট হইতে পাইতে ইচ্ছা করেন নাই; কারণ এই শেষোক্ত স্বীকারোক্তির মধ্যেই ইছ্‌লামের সমস্ত সত্য নিহিত আছে। খাঁটি আরবের ন্যায় তিনি সহজে উত্তেজিত হইতেন এবং প্রেরিতত্ব লাভের পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য তাঁহাকে

যে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহাতে এইটী এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তিনি নিজেই অনেক সময় শঙ্কা বোধ করিতেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে উন্মাদ আখ্যা দেওয়া যায় না। তাঁহার আবেশ এবং প্রত্যাদেশ যে কোন প্রকার মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রসূত নহে, তিনি স্বয়ং ইহা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার সত্যতার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ তিনি বিশ্বাস এবং বলের সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস না করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।"

ওহি বা প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিত যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ইছ্‌লামের সম্পূর্ণ অনুকূল। "আঁ-হজরতের পর জগতে অন্য কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন নাই কিন্তু দরবেশ প্রভৃতি জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তাঁহাদের নিকটেও সময় সময় এল্‌হাম হইত। এল্‌হাম ওহি না হইলেও এল্‌হাম-প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে আঁ-হজরতের বর্ণিত অবস্থার তুল্য। হঠাৎ আত্মার প্রসার হইলে ছুফিগণকে এইরূপ ভাবে ভাবাপন্ন দেখা যায়। স্পন্দন, হৃদ্‌কম্পন, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, ঘনশ্বাস প্রভৃতি এল্‌হামের আনুষঙ্গিক অবস্থা। সুতরাং আঁ হজরতের প্রত্যাদেশিক অবস্থার প্রতি সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

হজরত খোদেজার ইছ্‌লাম গ্রহণ—

হজরত খোদেজা বিনা তর্কে সর্ব্বপ্রথম স্বামীর প্রেরিতত্বে ইমান আনিলেন এবং ইছ্‌লাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জীবন কাল পর্য্যন্ত তিনি অতি বিশ্বস্তা সঙ্গিনী বলিয়া পরিগণিতা ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আদেশকে খোদাওন্দ করিমের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে আঁ হজরতের রেছালত (প্রেরিতত্ব) সম্বন্ধে

কখনও কোন সন্দেহ হয় নাই। আক্ষেপের বিষয়, জগৎ এইরূপ সহধর্ম্মিণীকে স্বামীর বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা বলিয়া রটনা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই।

দীক্ষাদান—

যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতে বিবি খোদেজা বুৎপোরস্তী (মূর্ত্তিপূজা) পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর আলী, ওরফাবিন্ বিন্‌নওফেল প্রভৃতি ইমান আনিলেন। একদা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্ব্বত গহ্বরে স্বীয় এবাদতে মস্‌গুল ছিলেন, এমন সময় আবুতালেব সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! বল ত তুমি কোন্ মজহাব অনুসারে চলিতেছ?" তাঁহার উত্তরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, "আমি খোদার মজহাবেরই অনুসরণ করি। এই মজহাব পয়গম্বরগণ ও ফেরেস্তাগণ এবং দাদা হজরত ইব্রাহিম (আঃ) মানিয়াছিলেন। খোদাতাআলা আমাকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন ভ্রান্ত লোকদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে পারি। আপনাকেও ঐ পথে আহ্বান করিতেছি এবং আপনি এই মজহাব বিস্তার হেতু আমাকে সহায়তা করুন।" তদুত্তরে আবুতালেব বলিলেন, "আমি পিতৃ-প্রপিতামহের 'দীন' ছাড়িতে চাহি না। যাহা হউক, আমি খোদার কছম করিতেছি যে, আমার জীবদ্দশায় তোমার যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" অতঃপর আবুতালেব স্বীয় পুত্র আলীকে তাঁহার মজহাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি খোদা ও তাঁহার পয়গম্বরের উপর ইমান আনিয়াছি ও আমি তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিব।" তাহাতে আবুতালেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বৎস! তুমি উঁহারই সঙ্গী হও। তিনি সতত তোমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন।"

প্রকাশ্যে ধর্ম্ম প্রচার ও শত্রুতার বীজ বপন—

ইহার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া গোলাম জায়েদ ইছ্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে আবুবকর ইমান আনিলেন। ইনি সকলের সম্মানিত ও শ্রদ্ধার্হ ছিলেন। আঁ হজরত ইঁহাকে ছিদ্দিকী (সত্যবাদী) উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইঁহার পর ওছমান ও আক্কাছ পুত্র ছায়াদ ইছ্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে মোছলমানদিগের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। প্রত্যাদেশ আরম্ভ হওয়ার তিন বৎসর পর আঁ হজরতের উপর ওহি (আজ্ঞা) আসিল, "প্রকাশ্যে ইছ্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করার সময় উপস্থিত। তুমি প্রকাশ্যে লোকদিগকে আমার অর্চ্চনার জন্য আহ্বান কর। উচ্চৈঃস্বরে কোরান পাঠ করিতে থাক।" আঁ হজরত এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া সাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতে সমুদ্যোগী হইলেন। ৪৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) গুপ্তভাবে পৌত্তলিকতা হইতে লোকদিগকে ফিরাইয়া সত্যধর্ম্মে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে একদিন কাবাগৃহের সন্নিহিত ছফা পর্ব্বতের উপর সমস্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও কবিলার লোকদিগকে এক প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিলেন। ঐ দিন হইতে শত্রুতার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আবুতালেব সম্বন্ধে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিতে লাগিল। কিন্তু ঈদৃশ ব্যবহারে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পশ্চাৎপদ হইলেন না, বরং প্রতিদিন বাজারে, ঘাটে মাঠে ওয়াজ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কঠোর ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন কোরায়েশগণ আবুতালেবের সমীপে আসিয়া অভিযোগ করিল, "আমরা আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি, অন্যথা এই বে-আদব, বেদীন (১) পাগলকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিতাম।

(১) ধর্ম্মহীন।

যদি আপনি উঁহাকে সহায়তা করেন, তাহা হইলে আসুন, যুদ্ধ করিয়া বিরোধ মীমাংসা করি।” আবুতালেব অতি কষ্টে কোরায়েশদিগকে নিবৃত্ত করিলেন, কিন্তু চুপে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে প্রচার কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। যখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দেখিলেন যে, তাঁহার চাচা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক, তখন তাঁহাকে নির্ভয়ে এই উত্তর দিলেন যে, যদি দুনিয়া উল্‌টিয়া যায়, তবু প্রাণ থাকিতে আমি এই প্রচার কার্য্য হইতে বিরত থাকিব না। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কোমল অন্তঃকরণ কোরায়েশগণের কথা শ্রবণে বিদীর্ণ হইতেছিল ও তাঁহার চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ইহার প্রভাব আবুতালেবের উপর এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে ডাকিয়া বলিলেন “বাছা! তোমার যাহা খুসী কর, আমি তোমাকে সহায়তা করিতে বিরত হইব না।” ইহার পর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পূর্ণোদ্যমের সহিত স্বীয় ধর্ম্ম বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কোরায়েশগণও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাঁহার শত্রুতা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সৌভাগ্যক্রমে আবুতালেব ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সাহায্য নিবন্ধন শত্রুগণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিল না। ইহার পর শত্রুগণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে পার্থিব প্রলোভন দ্বারা ভুলাইতে চেষ্টা করিল। উহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, “আপনি অতি সদ্বংশ-সম্ভূত কিন্তু আপনি বিনা কারণে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য সংঘটন করিতেছেন। আপনি আমাদের পূজ্য মূর্ত্তিগুলিকে উপহাস করেন এবং আমাদের পিতা, পিতামহকে বিধর্ম্মী, মোসরেক (অংশ-বাদী) ও গোমরাহ্‌ (মূর্খ) আখ্যা দেন। আপনার নিকট আমাদের এই বিনীত অনুরোধ, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহা উচিত কি না? তৎপর কোরায়েশগণ

বলিল, "যদি আপনি ধন, মান, সম্ভ্রম পাইতে চান, তাহা হইলে আমরা সকলে সমবেত চেষ্টা দ্বারা আপনাকে অগণিত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিব; আর যদি আপনি ইজ্জৎ চান, তাহা হইলে আমরা আপনাকে আমাদের ছর্‌দার করিয়া সম্মানিত করিব এবং আপনার মর্জ্জীর বিরুদ্ধে কখনও কোন কাজ করিব না। যদি আপনার রাজত্ব আবশ্যক হয়, তবে আমরা আপনাকে আমাদের ছোলতানের পদে অভিষিক্ত করিব। আর খোদা নাখাস্তা (খোদা না করুন), আপনার উপর যে জেন ছওয়ার হইয়াছে, যদি সে স্বীকার না করে, তবে আমাদিগকে জেন তাড়াইবার অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়; ইহাতে যে খরচ পড়িবে, তাহা আমরাই সরবরাহ করিব।" উহার উত্তরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরান শরিফ হইতে কয়েকটি আয়েত শুনাইলেন। তাহার অর্থ এই:—"এই পয়গাম (আদেশ) খোদা রহমানের-রহিম হইতে আসিয়াছে, ইহা তোমাদের শুনিবার উপযুক্ত। তোমাদের সহজ বোধগম্য হইবার জন্য ইহা তোমাদের মাতৃভাষা আরবী জবানে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সুখসংবাদ অনুগ্রহের পরিচায়ক ও আজাবের ভীতি প্রদর্শক।" আক্ষেপের বিষয়, এই কথা শুনিয়া কোরায়েসগণ মুখ ফিরাইল এবং অতিদম্ভের সহিত বলিল, এই কথা আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। ভাল, আপনার যাহা খুসী করুন। আমরা বুঝিয়া লইব।" ওহি আসিল "আয়্ পয়গম্বর, বল আমি তোমাদের ন্যায় একজন মামুলী এন্‌ছান। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, আমার উপর এলাহির পয়গাম আসিয়াছে। তোমাদের একই মাবুদ। তাঁহারই প্রতি আকৃষ্ট হও। তাঁহাকেই পূজা কর এবং তাঁহারই নিকট ঐ সমস্ত লোকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, যাহারা সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করে, খোদার রাহে খরচ না করে, আর জিনহাসরকে বিশ্বাস না করে। যে সমস্ত লোক খোদার উপর

ইমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য্যে রত আছে, উহাদের জন্য অসীম সুখ ও শান্তি প্রতীক্ষা করিতেছে।”

কোরায়েশদিগের প্রতিনিধি যখন এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিল, তখন তাহার উপর এম্‌নি আছর হইল যে, তাহার মুখ দিয়া একটী শব্দও বহির্গত হইল না। হয়রান্ হইয়া কোরায়েশদিগের নিকট গিয়া সে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিল ও তাহার যে ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিল। যখন কোরায়েশগণ ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন তাহারা মোছলমানদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চাচা আবুলাহাব জানী দুষ্মন হইয়া দাঁড়াইল। আবুলাহাবের স্ত্রী জঙ্গল হইতে কাঁটা আনিয়া হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চলিবার পথে পুতিয়া রাখিত। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পা জখম হইয়া যাইত। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অক্লেশে সহ্য করিতেন এবং অপরের কষ্ট নিবারণের জন্য রাস্তা হইতে কাঁটা উঠাইয়া ফেলিতেন।

যখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরানপাক আবৃত্তি করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সকলে মিলিয়া এতই সোরগোল করিত যে, তাঁহার ওয়াজ (বক্তৃতা) শ্রুতিগোচর হইত না। যখন তিনি আজেজ (লাচার) হইয়া ফিরিয়া যাইতেন, তখন কোরায়েশগণ তাঁহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিত। উহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইত।

একদা কয়েক জন লোক তাঁহাকে একাকী পাইয়া পরিবেষ্টন করত তাঁহার গলদেশে কাপড়ের রশি দিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। যখন তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িল, তখন হঠাৎ আবুবকর দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। এইজন্য আবুবকরকে তাহারা এইরূপ মারপিট করিয়াছিল যে, তিনি বেহুস্ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন।

আঁ হজরতের পিতৃব্য হামজার ইছ্‌লাম গ্রহণ—

আবুজহল ও তাহার অনুচরবর্গ আঁ হজরতকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিতে থাকে। কেহ প্রহারে নিযুক্ত হয়, কেহ কুৎসিত গালি দেয়, কেহ বা কঠিন আঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করে। হজরতের পিতৃব্য হামজা এই সকল নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া একদা আঁ হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। তৎপর আঁ হজরত তাঁহাকে অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাহ্‌তাআলার শরণাপন্ন হইতে আদেশ করেন। পিতৃব্য হামজা ইছ্‌লাম গ্রহণ করিলেন ও আঁ হজরতের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। হামজা ইছ্‌লাম গ্রহণ করিলে কোরায়েশগণ একটু ভীত হইয়া পড়িল, কিন্তু অল্পকাল পরেই দ্বিগুণবেগে শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অকাতরে নিজের যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। তাঁহার সঙ্গীদের উপর যুছিবৎ দেখিলে তিনি অস্থির ও দিশাহারা হইয়া পড়িতেন। যে সমস্ত গরীব লোক দীন ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের উপরও বিপদ বর্ষিত হইতে লাগিল। কোরায়েশগণ উহাদিগকে জঙ্গলে লইয়া গিয়া নগ্নদেহ করিয়া তপ্ত বালুকার উপর শয়ন করাইত এবং বক্ষের উপর গুরুভার প্রস্তর চাপাইয়া দিত। দারুণ গ্রীষ্মে তাহারা ছট্‌ফট করিত ও প্রস্তরের চাপে তাহাদের জিহ্বা বহির্গত হইত। এই কষ্টে অনেকেরই প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইত। কেহ কেহ অসহ্য যন্ত্রণার ভয়ে ইছ্‌লাম পরিত্যাগ করিত। এই সমস্ত মোমেনদিগের মধ্যে আকাছ নামক একব্যক্তি ছিলেন। উঁহার হাত পা বাঁধিয়া দুরন্ত কোরায়েশগণ তাঁহাকে তপ্ত বালুকার উপর শোয়াইয়া তাঁহার বক্ষের উপর প্রকাণ্ড প্রস্তর উঠাইয়া দিয়াছিল ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে গালি দিতে আদেশ করিল। উঁহার বৃদ্ধ পিতার উপরও তাহারা এই পাশবিক ব্যবহার করিয়াছিল।

ইঁহার বিবি "ছামেয়া" এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া উহার স্বামী ও পুত্রের অব্যাহতির জন্য কাতরস্বরে প্রার্থনা করিল। পাপিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তগণ এই নিষ্পাপ স্ত্রীলোকটীকে তাহার পুত্র ও স্বামীর সম্মুখে উলঙ্গ করিয়া নিদারুণ ঘৃণ্য ব্যবহার করিয়াছিল। অবশেষে এই অমানুষিক যন্ত্রণায় উক্ত পুণ্যবতী স্ত্রীলোকটীর জীবন বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। আবিসিনিয়াবাসী বেলাল উন্মীয়া বিন্ খালাকের গোলাম ছিলেন। ইনি আঁ হজরতের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি সকল যুদ্ধেই আঁ হজরতের সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারই উপর রসদ পর্য্যবেক্ষণের ভার ন্যস্ত ছিল। ইনি ইছ্‌লাম কবুল করিলে ইঁহার প্রভু তৎপ্রতি নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিয়াছিল। ইঁহার গলায় রশি দিয়া টানিবার আদেশ দেওয়া হইত এবং কখন কখন তপ্ত বালুকার উপর ইঁহাকে শয়ন করাইয়া বক্ষে প্রস্তরের চাপ দেওয়া হইত। এই সকল কষ্টের মধ্যেও তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' বলিয়া চীৎকার করিতেন, কিন্তু কখনও ইছ্‌লাম পরিত্যাগ করিতে রাজি হন নাই। ইঁহার কষ্টের কথা শুনিয়া হজরত আবুবকর স্বয়ং নিষ্ক্রয় দ্বারা ইঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। হজরত ওছমান যখন ইছ্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃব্য তাঁহারও হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে ঐরূপ বিশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। মোট কথা ইমানদার মোছ্‌লেমদিগের উপর ধারাবাহিক যন্ত্রণার সূত্রপাত হইল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সঙ্গীদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া মৃতপ্রায় হইতেন। তাঁহার হৃদয় এই 'বেগুনাহ্' দরিদ্র মোমেনদিগের জন্য জর্জ্জরিত হইত। অতঃপর এইরূপ যন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার কোন উপায় না দেখিয়া তিনি উহাদিগকে "হাবশ দেশে" (আবিসিনিয়ায়) হিজরত (১) করিবার জন্য আদেশ দেন। হজরত

---

(১) হিজরত শব্দের অর্থ পলায়ন নহে। ইহার অর্থ আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে অবস্থান করা। যে সমস্ত দেশে খৃষ্টীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

মোহাম্মদের (দঃ) আদেশ পাইয়া ৮০ জন মোছ্‌লেম স্ত্রী পুরুষ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল। এই হিজরত ৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে নবুয়তের ৫ম বর্ষে ঘটিয়াছিল। ইহাই প্রথম হিজরত বলিয়া অভিহিত। আঁ হজরতের জামাতা হজরত ওছমান সস্ত্রীক এবং আঁ হজরতের পিতৃব্য জাফর এই মোহাজেরিন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দুই তিন দিন গমন করিবার পর তাঁহারা জেদ্দা বন্দরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আবিসিনিয়া দেশীয় দুইখানা অর্ণবপোত তথায় নঙ্গর করিয়া আছে। তাঁহারা ইহাতে আরোহণ করত আফ্রিকায় উপনীত হইয়া তত্রত্য খৃষ্টান ভূপতি নজ্জাশীর (Negas) নিকট পৌঁছিলেন।

বাদশাহ নজ্জাশীর বিচার—

যখন কোরায়েশগণ অবগত হইল যে, মোছলমানগণ হাব্‌স্‌ দেশে হিজরত করিয়াছে, তখন তাহারা উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল ও আবিসিনিয়ার বাদ্‌শাহ্‌ নজ্জাশীর নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিল যে, তাহাদের কতকগুলি গোলাম মক্কা ভূমি হইতে পলায়ন করিয়া হাব্‌স্‌ দেশে আশ্রয় লইয়াছে। উহাদিগকে গেরেপ্তার করিবার দাবী করায় হাবসের খৃষ্টবাদী নজ্জাশী উপাধিধারী রাজা উহাদিগকে তলব করিলেন ও কোরায়েশদিগের অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। এই অভিযোগ শুনিয়া হজরত আলীর সোদর জাফর বিন্‌ আবুতালেব

সেই সমস্ত দেশ হইতে বহু মোছ্‌লেম অন্যত্র গিয়া বসবাস করিয়াছে বা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। অনৈক্য, অসামঞ্জস্য বা বিরাগ বশতঃ লোকে একদেশ হইতে অন্য দেশে প্রস্থান করে। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনকে পলায়ন না বলিয়া বর্জ্জন বা প্রবাসন বলিলে ঠিক হয়। যে ব্যক্তি হিজরত করে, তাহাকে 'মোহাজের' বলে।

জবাব দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বাদশাহ! আমরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম, আমরা মূর্ত্তিপূজা করিতাম। কুৎসিত বাক্য বলিতাম, অখাদ্য ভক্ষণ করিতাম, আমাদের মধ্যে সুবিচার ও মনুষ্যত্বের চিহ্ন ছিল না। খোদাওন্দতাআলা তাঁহার অসীম অনুগ্রহ বলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আমাদের রছুল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। উঁহার সুবিচার, সত্যনিষ্ঠা, ও ভদ্রতা প্রভৃতি গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। উঁনি খোদাওন্দ করিমের নিকট হইতে আমাদের মুক্তির জন্য আদেশ আনিয়াছেন, "খোদাকে বিশ্বাস কর, তাঁহার সঙ্গে অপরকে শরিক করিও না, প্রতিমা পূজা করিও না, সত্যবাদিতা অবলম্বন কর, আমানত (গচ্ছিত বস্তু) খেয়ানত (আত্মসাৎ) করিও না, স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর, প্রতিবাসীকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিও না, স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিও, এতিমের মাল খাইবে না, পবিত্রতা ও পরহেজগারীর (নিষ্ঠাচার) সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর, খোদার এবাদত কর, তাঁহার স্মরণে খানা পিনা, আহার, বিহার পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাও, খোদার রাহে গরীব মিছ্‌কিনকে খয়রাত কর।" হে বাদ্‌শাহ, ইহাই আমাদের রছুলের শিক্ষা। আমরা রছুলের উপর ইমান আনিয়াছি এবং উঁহার শিক্ষা অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহারই আদেশ অনুসারে আমরা বুৎপোরস্তী পরিত্যাগ করিয়াছি ও একেশ্বর পূজা করিতেছি। এইজন্য কোরায়েশগণ আমাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা দান করিয়াছে। ইহার ফলে আমরা পরিবারবর্গ সহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এখন আপনার বিচার ও দয়ার উপর আমরা নির্ভর করিতেছি। আপনি আমাদিগকে তাহাদের জুলুম হইতে রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা।'

জাফরের এই বিলাপোক্তি শুনিয়া বাদশাহের হৃদয় আর্দ্র হইল এবং তাঁহার অন্তঃকরণ রছুলে আকবরের অন্যান্য শিক্ষা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল। বাদশাহ জাফরকে বলিলেন, তোমার রছুলের উপর যে সমস্ত আদেশ আসিয়াছে, তৎসমুদয় হইতে কিছু কিছু পড়িয়া শুনাও। এই কথা শুনিয়া জাফর ছুরা মরিয়ম হইতে কয়েকটি আয়াত (বাক্য) শুনাইলেন। তাহার সৌন্দর্য্য বাদশাহের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিল যে, বাদশাহের নয়ন হইতে দর দর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, যে নূর (দিব্যজ্যোতিঃ) হজরত মুছা (আঃ) দেখিয়াছিলেন, ইহা ঐ নূরের ছটা। তৎপর তিনি কোরায়েশগণকে ডাকিয়া পরিষ্কারভাবে বলিলেন যে, তোমাদের অভিযোগ অগ্রাহ্য হইল। তোমরা হাবস্‌ হইতে চলিয়া যাও। বাদশাহ অতঃপর আরবের মোমেনদিগকে সানন্দ অন্তঃকরণে হাব্‌সে অবস্থিতি করিবার অনুমতি দিলেন।

নজ্জাশী এই নূতন "দীনের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি জাফরকে সম্মুখ হইতে বিদায় করিতেন বটে, কিন্তু পুনঃ নির্জ্জনে তাঁহাকে ডাকিয়া লইতেন ও নিজের আকিদার (ধর্ম্মবিশ্বাস) সহিত জাফরের আকিদার তুলনা করিতেন। নজ্জাশী বারংবার জাফরকে হজরত ইছা (আঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমরা তাঁহার প্রতি কিরূপ আকিদা রাখ?" তদুত্তরে জাফর বলিতেন, "তিনি খোদার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে খোদাতাআলা নবী বা রছুল করিয়া বনি ইস্রাইলের জন্য পাঠাইয়াছেন।" এই সমস্ত কথোপকথনের পর নজ্জাশী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে সত্য পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলেন ও মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "যদি আমি

রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইতাম, তাহা হইলে স্বয়ং আরবস্থানে যাইয়া ঐ আরব সম্রাটের ভৃত্য হইতাম।"

যখন মোছলমানগণ আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখনও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদিগকে নছিহত (উপদেশ দান) করিতে ছিলেন। কোরায়েশগণ তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি জুলুম করিতে লাগিল। তাঁহার খানার মধ্যে ঘাস কুটা ফেলিয়া দিত। কিন্তু তিনি খোদাতাআলার প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তাই ঐ সমস্ত মুছিবৎ ও কষ্টের প্রতি তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না, বরং যাবতীয় দুঃখ ও যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। কোন রকমের জুলুমই তাঁহাকে স্বীয় কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারিল না। অসাধারণ দৃঢ়তা ও একাগ্রতা বলে পরিশেষে তিনি জয়লাভ করিলেন।

কথিত আছে যে, যখন কোরায়েশগণ হজরত নবী করিমের উপর নানাবিধ জুলুম করিয়াও তাঁহার একাগ্রতার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাইল না, তখন একব্যক্তি (যাহাকে মোছলমানেরা অতি মূর্খতার দরুণ "আবুজেহেল" নাম দিয়াছিল) একদা স্বীয় কবিলার লোকদিগকে এক জায়গায় জমা করিয়া বলিল, "তোমাদিগের জলে ডুবিয়া মরা উচিত, কেননা তোমাদের দীনের বদ্‌নামী করা হইতেছে, তোমাদের মাবুদদিগকে গালি দেওয়া হইতেছে এবং তোমাদের মুরব্বীগণকে জাহান্নামের আগুণের ইন্ধন নামে অভিহিত করা হইতেছে, আর তোমাদের উপর কোন প্রভাব হইতেছে না? ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা অলসভাবে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে ইহা কি ভীরু ও কাপুরুষের কর্ম্ম হইবে না? আর আমরা কি তাহার কিছুই করিতে পারি না? এই অপমান আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি এই ভরা মজলিসে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে কেহ মোহাম্মদ

(দঃ) কে কতল (হত্যা) করিবে, আমি তাহাকে এই সমাজ সেবার জন্য খুব ভাল দেখিয়া ১০০টা উট পুরস্কার দিব।"

হজরত ওমরের ইছ্লাম গ্রহণ—

ঐ মজলিসের মধ্যে ওমর (যাহার সাহস ও বাহাদুরী সম্বন্ধে সমস্ত কোরায়েশ বংশে বিশেষ খ্যাতি ছিল) দাঁড়াইয়া বলিল, আমাকে পাকা কথা দাও। আমি অবশ্য এই কাজ সমাপ্ত করিব। এই কথানুসারে আবুজেহেল তাহাকে কাবার মধ্যে লইয়া গেল এবং সে কোরায়েশ দিগের বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ হোবল নামক মুর্ত্তির সম্মুখে কছম করিল। ওমরও তাহার সম্মুখে কছম করিল, যত দিন আমি এই সমাজের দুশমনকে প্রাণে বধ না করিব, তত দিন আমি বিশ্রাম করিব না; কিংবা হাত হইতে অসি রাখিব না। এই বলিয়া ওমর নবী করিমের তল্লাসে বাহির হইল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরকম্ নামক তাঁহার জনৈক বন্ধুর ঘরে বসিয়াছিলেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত মোছলমানেরাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই নূতন পুরস্কারের ঘোষণায় তাঁহারা অত্যন্ত ভীত ও চকিত হইয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করত উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শোণিত পিপাসু ওমর অসিহস্তে হজরত রছুলের প্রাণ সংহার জন্য যাইতেছিল। পথে তাহার জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে জিজ্ঞাসা করিল, এত দ্রুতগতিতে কাহার আক্রমণে যাইতেছ? তদুত্তরে ওমর তাহাকে যাবতীয় বিষয় বিবৃত করিল। সে বলিল ভাল, তুমি ইছ্লামের মুলোৎপাটনের জন্য যাইতেছ, এদিকে যে তোমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি মোছলমান হইয়া গিয়াছে, তাহার খবর রাখ কি? প্রথমে ঐ দুইজনকে কতল কর। তোমার যদি ন্যায় বিচার থাকে, তবে প্রথমে ঘরের খবর লও, পরে অপরের খবর লইও।' ইহা শ্রবণে ওমর রাগে

আগুণ হইয়া গেল এবং সর্ব্বাগ্রে তাহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতির নিধন সাধন মানসে তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। তাঁহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হজরতের খবাব নামক জনৈক বন্ধু হইতে কোরান মজিদের কয়েকটী আয়াত শ্রবণ করিতেছিলেন। ওমর দ্বারের শিকল নাড়িল। তাহার ভগ্নীপতি খবাবকে দ্বারের এক কোণে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহার ভগ্নী উঠিয়া দ্বার খুলিল বটে কিন্তু ভ্রাতার রাগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া গেল।

যখন ভগ্নী ভ্রাতাকে নিজের প্রাণ সংহারে উদ্যত দেখিল, তখন বলিল ভাই, আমরা যে জিনিষ পাইয়া আমাদের দীন বদলাইয়াছি, কাতরভাবে প্রার্থনা করি, তুমিও তাহা হইতে কিছু শ্রবণ কর। যদি ঐ আয়েতের প্রতি তুমি আকৃষ্ট না হও, তবে তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমাদিগকে কতল করিও।"

ওমর ভগ্নীর এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমাকেও তাহা হইতে কিছু শুনাও।" এই সময় খবাবকে ভিতর হইতে ডাকা হইল ও কোরান্ শরিফের কিছু অংশ পড়িবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করা হইল। খবাব ছুরা "ত্বাহার" প্রথম কয়েকটী আয়াত আবৃত্তি করিল। যাহাতে আয়াতগুলি ওমরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রত্যেক আয়েত তাহার ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ওমর ঐ আয়েত শ্রবণ করত আত্মহারা হইয়া গেল এবং আকুলভাবে বলিয়া উঠিল, উহা মনুষ্যের কালাম নয়, অন্য কাহারও হইবে।"

তৎপর তিনি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। খবাব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আরকমের (১) ঘরে

(১) অল্-আরকম্—ইনি অাঁ। হজরতের নিকট অতি পূর্ব্বে ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৬১৫-৬১৭ খৃঃ) যখন অাঁ। হজরতের উপর কোরায়েশগণ উৎপীড়ন

হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হজরত ওমর নিজ হাতে দরজার শিকল নাড়িলেন কিন্তু উৎপীড়িত মোছলমানেরা জুলুমের ভয়ে কেহই দরজা খুলিয়া দিতে চাহিল না। ইহাতে হজরত নিজ হাতে দরজা খুলিয়া দিলেন। ওমরকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, হে ওমর! তুমি আর কতদিন আমাদের শত্রু হইয়া থাকিবে? সাহসী ওমরের অবস্থা তখন অন্য রূপ; পরাজিত দুষ্মনের ন্যায় তাঁহার চক্ষে অবিরত অশ্রু বহিতে লাগিল। ঐ অবস্থায় তিনি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। হজরত নবী করিম তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলী করিলেন এবং অতি মহব্বতের সহিত তাহার কপাল চুম্বন করিলেন। মোছলমানদের মধ্যে এই খবর বিজুলির মত ছড়াইয়া পড়িল। উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল। ইহাতে মোছলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর আঁ। হজরতের পিতৃব্য হাম্‌জা ইছলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যখন কোরায়েশগণ হজরতের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তখন তিনি একাকী কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়া কোরায়েশদিগকে যথেষ্ঠ ভৎর্সনা করিয়াছিলেন ও সর্ব্ব সমক্ষে আঁ। হজরতের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিপদ আদৌ গণনা করেন নাই।

আরম্ভ করিয়াছিল, তখন ইনি স্বীয় গৃহ হজরতের ও তাঁহার সঙ্গীদিগের ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। আঁ। হজরত এখানে নিরাপদে অবস্থিতি করিয়া ইছ্‌লাম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সময় হাম্‌জা ও ওমর ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ইছ্‌লাম গ্রহণের পর আঁ। হজরত আরকমের গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার গৃহ ছাফা পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। ঐ স্থানটী এখনও পবিত্র বলিয়া সম্মানিত হয়।

এই বৎসর নবুয়তের দশম বর্ষ। হজরত নবীর একমাত্র সাহায্যকারী চাচা আবুতালেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর আঁ-হজরতের অন্যতম পিতৃব্য মহাত্মা আব্বাছ ভ্রাতুষ্পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। আবু-তালেবের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হজরত খোদেজাও এন্তেকাল করিলেন। কিন্তু তিনি যতই বন্ধুহীন হইয়া পড়িতেছিলেন, ততই আল্লাহতালার প্রতি তাঁহার ভরসা বাড়িতেছিল। সুতরাং অমিত বিক্রম ও দৃঢ়তার সহিত তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

আঁ-হজরতের তায়েফগমন ও অধিবাসিদিগের উৎপীড়ন হেতু মক্কায় প্রত্যাগমন—

যখন কোরায়েশদের জুলুমের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল এবং হজরত নবীও তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার পক্ষে নিরাশ হইলেন, তখন তিনি জায়েদ-বিন্‌-হারেছকে লইয়া তায়েফে গমন করিলেন। তায়েফ মক্কা হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে পৌত্তলিকদিগের একটী প্রধান দুর্গ ছিল। আঁ-হজরতের পিতৃব্য আব্বাছ তায়েফের ভূস্বামী ছিলেন। তজ্জন্য তিনি মনে করিয়াছিলেন, তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে শত্রু হস্ত হইতে আশ্রয় প্রদান করিবে। তিনি প্রথমে কাহ্‌তান ও পরে ছকিফ বংশীয়দের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই, উক্ত স্থানবাসিগণ তাঁহার ওয়াজ শুনিয়া সেখানে তাঁহাকে অবস্থান করিতেও অনুমতি দিল না। বরং পাথর, ইট ও পাট্‌কেল ছুঁড়িয়া ও পাছে পাছে ছেলে লেলাইয়া তাহারা তাঁহাকে সহর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাঁহার হাঁটু ও পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। ঐরূপ নিঃসহায় অবস্থায় হজরত সহর হইতে কিছু দূরে এক খেজুর বৃক্ষের নীচে গিয়া বসিলেন এবং স্বীয় হাঁটু ও পা হইতে রক্ত মুছিয়া অশ্রুপূর্ণ-

পোচনে, অত্যন্ত কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে প্রভো! আমি স্বীয় দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা ও মুছিবৎ তোমা ভিন্ন আর কাহাকে জানাইব? আমার মধ্যে সহিষ্ণুতা গুণ অল্পই অবশিষ্ট আছে। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নজরে আসিতেছে না, আমি লোক মধ্যে নেহাৎ অপমানিত ও লজ্জিত হইয়াছি। আর খোদাওন্দে আলম! তোমার নাম—"আররাহ্‌মানেররাহিম" বটে। দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল করা এবং প্রপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করাই তোমার খাছ ছেফত। তুমিই বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যদাতা। এই অধম সর্ব্বদাই তোমার দয়ার ভিখারী। আমি অতি অপরাধী, কিন্তু তোমার রাহমতের পরিধি আমার অপরাধের পরিধি অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত। কেবল তোমারই কৃপারশ্মি দীন দুনিয়ার নিবিড় অন্ধকার দূর করিতে সক্ষম। তোমা ভিন্ন এইরূপ অসীম ক্ষমতা আর কাহারও নাই।"

হজরত তায়েফ হইতে হতাশ্বাস হইয়া মক্কানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার প্রতি তায়েফবাসিগণ যে অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার সংবাদ মক্কায় আসিয়া পৌঁছিল। মক্কাবাসিগণ এই সুযোগে তাঁহার প্রতি তায়েফবাসিগণের পীড়নের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া চারিদিকে রটাইতে লাগিল। হজরত পূর্ব্ব পরিচিত লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে তাহাদিগকে আহ্বান করতঃ বলিলেন, "ভাই সকল! তোমাদের দীনের প্রতি আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কেবল খোদাওন্দ করিমের প্রত্যাদেশ বাণী শুনাইতে দাও"। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিল। কেবল মাত্র "মোতুয়েম্-বিন্-আদি" নামক একজন আরব তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য সম্মুখীন হইল এবং অন্যান্য লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিল, "হে ভাই সকল! আরবদেশ স্বদেশপ্রেম ও আতিথেয়তার জন্য

চিরবিখ্যাত। যিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চান, তাঁহাকে স্থান দেওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। আমি তাঁহার দীন এখ্‌তেয়ার করি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করা বিধেয় মনে করি না। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। তাঁহার সহিত যাহারা শত্রুতা করিবে, আমিও তাহাদের সহিত শত্রুতা করিব।"

অতঃপর মোত্‌য়েম্‌ হজরতকে সহরের মধ্যে আনিয়া আশ্রয় দিল। তিনি সহরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে পবিত্র কাবাগৃহ তওয়াফ্‌ (ভক্তি সহকারে প্রদক্ষিণ) করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। উহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া মোত্‌য়েম ও তাঁহার সঙ্গিগণ হজরতের রক্ষক স্বরূপ দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহার প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতে কেহই সাহসী হয় নাই। তওয়াফ্‌ সমাপনান্তর হজরত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পরদিন মোত্‌য়েমকে সঙ্গে লইয়া বক্তৃতা করিলেন। বিরুদ্ধবাদিগণ মোত্‌য়েমের প্রতি কুপিত হইয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে হজরত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া তৎপর দিন মোত্‌য়েমের পরোক্ষে পুনরায় বক্তৃতা করিলেন এবং লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা মোত্‌য়েমের প্রতি শত্রুতাচরণ করিও না। আমি তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছি। কেবল খোদাওন্দ করিমই আমার আশ্রয়দাতা। তিনিই আমাকে সাহায্য করিবেন। তোমরা আমার জন্য মোত্‌য়েমের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিও না।" এই বলিয়া তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে জীবনের আশা একবারে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আরববাসিগণ হজরতের উপর অত্যাচার করিতে বিরত হইল না। তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহার সহিত মিলিতে না পারে এবং কেহ তাঁহার কথা শুনিতে না পায়, সেইজন্য সকলে সচেষ্ট থাকিল।

হজরতের বক্তৃতাকালে সকলে সোর গোল করিত এবং কাহাকেও তাঁহার বাণী শুনিতে দিত না।

৬১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কোরায়েশগণ ২৫ জন সভ্য লইয়া হাশেমী-দিগের বিরুদ্ধে একটী সমিতি গঠন করিয়াছিল। উহার সভাপতি ছিল আবুলাহাব (১)। সভ্যগণ সকলে মিলিত হইয়া একটী আহাদনামার দস্তখত করিয়াছিল। তাহার মর্ম্ম ছিল—"তর্‌কে মাওলাত"। তদনুসারে হাশেমীদিগের নিকট কেহ কোন প্রকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিত না এবং তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিত না। বনি হাশেমের শিশুগণ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে থাকিত। বাজারে তাহারা কোন দ্রব্যাদি পাইত না। এইরূপে তিন বৎসর কাল ধরিয়া হাশেমীগণ আবুতালেবের 'শেব' বা পর্ব্বত মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল। অবশেষে আমর পুত্র হেশাম আবুউম্মিয়ার পুত্র জোবায়েরকে অনুরোধ করিয়া উক্ত আহাদনামার খণ্ডন করেন। ইহার ফলে হাশেমীগণ সামাজিক মুক্তিলাভ করিয়া মক্কানগরে প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হন। আঁ-হজরতের উপর শত্রুগণ যেরূপ কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছে এবং তিনি যেরূপ ক্ষমাশীলতা ও সহ্যগুণের পরিচয় দিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

তোফয়েল বিন্ ওমরের ইছ্‌লাম গ্রহণ—

যাহা হউক, সত্যতার ক্ষমতা অলৌকিক। এই সময়ে মক্কানগরে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। ইনি কবিলায় দওজ সম্ভূত। ইহাঁর নাম তোফায়েল-বিন্-ওমর। ইহার অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত রইছ (বিশিষ্ট ব্যক্তি) উপস্থিত হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি হজরতের সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গকে তিনি বলিলেন,

(১) আবুলাহাবের প্রকৃত নাম আব্দুল ওজ্জা ছিল। আঁ-হজরতের পরম শত্রু ছিল বলিয়া তাহাকে আবুলাহাব অর্থাৎ নরকের পিতা নাম প্রদত্ত হইয়াছিল।

"ইঁহার বক্তৃতার অলৌকিক ক্ষমতা, যিনি শুনেন, তাঁহার উপর যাদুর ন্যায় কার্য্য করে। আমার দীন তুনিয়া ইনি বরবাদ করিয়া দিয়াছেন।" হজরতের কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য স্বীয় কর্ণ কুহর তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে ইনি হজরতের নামাজ-গাহে পৌঁছিয়াছিলেন। হজরতের উচ্চারিত "কালামে এলাহি" তদীয় বন্ধ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি মুগ্ধ হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ হজরত সমাপে উপস্থিত হইলেন এবং অতি মনোযোগের সহিত কালাম পাক শুনিতে লাগিলেন। হজরত নামাজ অন্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তোফায়েলের উপর তাঁহার উচ্চারিত ঐশবাণী এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি পূর্ব্ব শক্রতা ভুলিয়া গিয়া হজরতের পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্দরে প্রবেশ জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন। হজরত তোফায়েলকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিলেন। তোফায়েল দীন ইছ্‌লাম এখ্‌তেয়ার করিলেন। ঐ দিন হইতে সত্যতার বীজ মক্কাবাসি-দিগের মধ্যে উপ্ত হইল। তোফায়েল সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও ক্ষমতাশালী নেতা ছিলেন। তাঁহাকে ইছ্‌লাম গ্রহণ করিতে দেখিয়া মক্কাবাসিগণ ভীত হইয়া পড়িল। তুর্ব্বল মোছলেমগণ সাহসে বুক বাঁধিল এবং নবোৎসাহে মাতিয়া উঠিল। কোরায়েশগণ হজরতকে উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত হইল না। হজরত যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার মস্তকোপরি কাঁটা নিক্ষেপ করা হইত। গৃহে ফিরিয়া আসিলে ফাতেমা অশ্রুসিক্ত নয়নে, শ্রদ্ধেয় পিতার শরীর ও মস্তক পরিষ্কার করিয়া কণ্টকাদি উঠাইয়া ফেলিতেন এবং উভয়ে নয়নজলে বক্ষসিক্ত করিতেন।

বিবি আয়েষার পাণিগ্রহণ—

হজরতের তুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য হজরত আবুবকর সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গৃহিনী না

থাকায় হজরত আবুবকর তাঁহার কন্যা আয়েষাকে আঁ-হজরতের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

হজরত আবুবকরকে আঁ-হজরত অতি প্রিয়পাত্র মনে করিতেন এবং তাঁহার এই প্রস্তাবে উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও আকর্ষণ বর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া তিনি উহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখনও আয়েষা বালিকা, হজরত আয়েষা জীবনকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে আঁ-হজরতের সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে জনৈক মোছলেম স্ত্রী ছাওদা ও তাঁহার স্বামীর উপর কোরায়েশগণ অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। দারুণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া উভয়েই আবিসিনিয়ায় হিজ্‌রত করিয়াছিল। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী দেহত্যাগ করিল। বিধবা স্ত্রীকে বিপন্না দেখিয়া অন্যান্য লোক তাঁহাকে মক্কায় পৌছাইয়া দিল। ছাওদা অনন্যোপায় হইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইল এবং স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার দাসী হইয়া কাল যাপন করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিল। সে বলিল, "আমি বিধবা ও বৃদ্ধা নারী, আমার বিবাহের সাধ নাই, তবে হুজুরের হেরম মধ্যে দাখেল হইয়া গৌরবান্বিত হইবার একান্ত বাঞ্ছা। যদি অনুগ্রহ হয়, তবে জীবন সার্থক মনে করিব।"

ছাওদার প্রার্থনানুসারে তাঁহার স্বামিত্ব গ্রহণ।

হজরত ছাওদার কথা না-মঞ্জুর করিতে পারিলেন না। তাঁহারে নিঃসহায় ও বিপন্ন দেখিয়া স্বীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ উদারতা ও পরদুঃখকাতরতা ইতিহাসে বিরল। প্রকৃত পক্ষে হজরত খোদেজার পরে হজরত আয়েষাই আঁ-হজরতের একমাত্র সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এক্ষণে আঁ-হজরতের বয়স ৫০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর মধ্যেই

তিনি অন্যান্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাণিগ্রহণকে যিনি কামাতুরতার কাজ বলিয়া মনে করেন, তিনি যে সত্যের অপলাপ করেন, তাহা সহজবোধ্য।

৬২০ খৃষ্টাব্দে আঁ-হজরত কয়েকজন সওদাগরকে নছিহত করিতে ছিলেন। ঐ সময় ৬ জন মদিনাবাসী উপস্থিত হইয়া তাঁহার নছিহতে শরিক হইয়াছিল। উহারা হজরতের সত্য ও সাধুবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া ইমান আনিল এবং মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া হজরতের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল যে, মক্কা ভূমিতে সত্যবাণী প্রচার করিবার জন্য জনৈক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। আরও প্রচার হইল যে, তথাকার অধিবাসিদিগের মধ্যে যে সমস্ত ঝগড়া বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, তিনি সহজে তাহা মিটাইয়া দিতেছেন এবং ব্যুৎপোরস্তীর মূলোচ্ছেদের জন্য ও সত্যতার রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য এবং খোদার দিন তামাম দুনিয়াতে প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া পরবর্ত্তী বর্ষে আরও ৮৩ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোক উহাদের সহিত মক্কায় উপস্থিত হইল এবং আঁ হজরতের নিকট পৌছিয়া "দীনবরহক্" (সত্যধর্ম্ম) সম্বন্ধে নছিহত শুনিল। ইহারা ও হজরতের নিকট নিম্নলিখিত সত্ত্বে বায়েত গ্রহণ করিল যে, তাহারা খোদার সহিত অন্য কাহারও শরিক করিবে না, চুরি, জেনা, ফেছক (১) ও ফজুর (২) পরিত্যাগ করিবে, মাছুম কন্যাদিগকে কখনও জেন্দা-দর-গোর (৩) করিবে না, কখনও মিথ্যা বলিবে না ও আজীবন সৎপথ অনুসরণ করিবে। ইহারা যখন মদিনায় প্রত্যাগমন করিল, তখন আঁ-হজরত ইহাদের সহিত

(১) পাপ, (২) দুষ্ক্রিয়া, (৩) জীবিতাবস্থায় কবরস্থ।

মোছাব নামীয় একজন নকীব (১) প্রেরণ করিলেন। ইনি মদিনায় দীন-বরহক্ প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে এক বৎসরের মধ্যে বনিআউছ ও বনি খজ্‌রজের বহু সংখ্যক লোক ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

যখন মক্কাবাসিগণ আঁ-হজরতকে নানাপ্রকার যাতনা দিতেছিল, তখন তাঁহার উপর খোদাতালার বিশেষ অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইয়াছিল।

মে-রাজ শরিফ
নবুয়তের দশমবর্ষ।

হজরত বোরাকে (২) আরোহণ করিয়া ফলকুল আফ্‌লাকে (৩) পৌছিয়া খোদাতালার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং বেহেস্ত এবং দোজখের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, ইহাই মে-রাজ বলিয়া অভিহিত। এই ঘটনা লইয়া বিরুদ্ধবাদিগণ নানা প্রলাপ বকিয়া থাকেন। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সেণ্টপলের সপ্তম স্বর্গে উত্থান যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মে-রাজ কেন অসত্য বা অবিশ্বাস্য হইবে। আঁ-হজরত সত্যবাণী প্রচারের দ্বাদশ বর্ষে মে-রাজের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। কোর্‌আন্ পাকে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। উহাতে খোদাওন্দ করিম বলিয়াছেন, "আমি আপন কুদ্‌রতের নমুনা উহাকে কিছু প্রদর্শন করি"।

একদা রজনীযোগে আঁ-হজরত বিবি আয়েষার পার্শ্বে নিদ্রিত ছিলেন, হঠাৎ দ্বারদেশে শব্দ হইল। তিনি উঠিয়া দেখিলেন, ফেরেস্তা জিব্রাইল বোরাক লইয়া দণ্ডায়মান। হজরত তাহাতে ছওয়ার হইয়া জেরুশালেমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত মুছা (আঃ) ও হজরত ইছার (আঃ) সাক্ষাৎ পাইলেন। ছালাম আলায়কুমের পর তাঁহারা একত্রে নামাজ আদায় করিলেন। তৎপরে জেরুশালেম পরিত্যাগ করিয়া তিনি জিব্রাইলের সহিত দিব্য জ্যোতির

(১) প্রচারক, (২) দ্রুতগামী স্বর্গীয় অশ্ব বিশেষ, (৩) সংকোচ্চ আকাশ।

সিঁড়ি দিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিলেন। বেহেস্তে পৌছিয়া ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) আঁ-হজরতকে একে একে তথাকার সকল অবস্থা দেখাইলেন। কোটী কোটী দিব্য জীবকে খোদাওন্দ করিমের প্রশংসা গীতি আবৃত্তি করিতে শুনিলেন। তৎপরে আঁ-হজরত ফেরেস্তা জিব্রাইলসহ জেরুশালেমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তথা হইতে পুনরায় মক্কায় উপনীত হইলেন।

একটু চিন্তা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, সকল যুগেই মহাপ্রভু দয়া পরবশ হইয়া তাঁহার খাছ বান্দাদিগকে স্বীয় মাহাত্ম্য দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বপ্নের অবস্থা অবগত আছেন। প্রত্যেকে অনুধাবন করিতে পারিবেন যে, নিদ্রাকালে রূহ্ পৃথিবী হইতে অতি উচ্চে ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ অনৈসর্গিক ঘটনা অবলোকন করিতে পারে এবং অনেক সময় অন্যান্য পাক রূহের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া কথোপকথন করিতে এমন কি, উহার অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে ঐশী-শক্তির প্রভাবে মুক্ত-আত্মার পক্ষে ইহা কোনরূপেই অসম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিক ইহার তথ্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির অন্তরালে এবম্প্রকার ঘটনা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই মে-রাজে আঁ-হজরত আধ্যাত্মিক উচ্চতা ও পূর্ণ মারফত হাছেল করিয়াছিলেন। হজরত মুছাও (আঁ) ইহা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

আঁ-হজরত মদিনাবাসিদিগকে বিদায় করিয়া মক্কাতে যে সমস্ত মোছলমান ছিল, শত্রুদিগের নির্য্যাতন ভয়ে একে একে সকলকে মদিনায় রওয়ানা করিলেন। কেবলমাত্র আঁ-হজরত প্রিয় অনুচর হজরত আবুবকর ও হজরত আলীকে লইয়া পরিবারবর্গসহ মক্কাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ৬২২ খৃষ্টাব্দে ৭৫ জন মদিনাবাসী এক

কাফেলার সহিত মদিনায় পৌছিল এবং নিঝুম রাত্রে আসিয়া আকাবা (১) পর্ব্বতের উপর আঁ-হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করত সদন্তঃকরণে ইছলাম কবুল করিল এবং আঁ-হজরতকে মদিনায় তশ্‌রীফ্‌ লইবার জন্য অনুরোধ করিল। যখন এই সংবাদ কোরায়েশগণ অবগত হইল, তখন তাহারা নেহাৎ ব্যতিব্যস্ত হইল। ইছলাম বিস্তৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য যুক্তি পরামর্শ আটিতে লাগিল। কেহ আঁ-হজরতকে সংহার করিবার প্রস্তাব করিল। প্রাচীনকালীন আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি কাহাকে হত্যা করিলে নিহত ব্যক্তির সমস্ত সম্প্রদায় ঘাতকব্যক্তির সম্প্রদায়ের উপর শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইত। এইজন্য কোরায়েশগণ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, যদি আঁ-হজরতকে হত্যা করা হয়, তবে বনি হাশেম একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদিগের উপর প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আবুজেহেল যুক্তি করিল যে, প্রত্যেক পরিবারের দুই এক ব্যক্তি আঁ-হজরতকে হত্যা করিতে সহায়তা করিবে যেন ভবিষ্যতে কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সুযোগ না পায়। আবু জেহেলের এই প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করিল এবং কোরায়েশগণ রাত্রিকালে হজরতের গৃহের সম্মুখে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা যুক্তি আঁটিল, হজরত নামাজের জন্য প্রত্যুষে যখন ঘরের বাহিরে আসিবেন, সকলে একযোগে তাঁহাকে বধ করিবে। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া জনৈক জাননেছার (২) খাদেম হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত জ্ঞাপন করিল। হজরত আলি (রাঃ) আঁ-হজরতের সঙ্গী ছিলেন। দস্যুদিগের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আঁ হজরত গৃহের পশ্চাৎ

(১) আকাবা—মিনা ও মক্কার মধ্যবর্ত্তী একটী পর্ব্বতের নাম। এইস্থানে আঁ-হজরত মদিনাবাসিদিগকে সর্ব্বপ্রথম দীক্ষা দিয়াছিলেন। (২) প্রাণ-উৎসর্গেচ্ছু।

হইতে বহির্গত হইয়া হজরত আবুবকরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ছওর পর্ব্বতের গুহা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে হজরত আলি (রাঃ) আঁ হজরতের অতি যত্নের সবুজ রংএর খের্‌কা (ঢিলা পির্‌হান্‌) পরিধান করিয়া তাঁহারই শয্যোপরি শয়ন করিলেন। শত্রুগণ গবাক্ষ হইতে হজরত আলীকে শয়ান দেখিয়া তাঁহাকে আঁ-হজরত মনে করত প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রাতঃকালে কোরায়েশগণ জানিতে পারিল যে, গৃহের মধ্যে হজরত আলী শয়ান এবং আঁ-হজরতের পরিবর্ত্তে তিনিই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার জীবন লইতে বিরত হইল। কিন্তু রোষ পরবশ হইয়া শত্রুগণ বলিল, যে মোহাম্মদের (দঃ) মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিবে, সে শত উষ্ট্র পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইবে। এই কথা শুনিবামাত্রই আঁ-হজরতের জীবন লক্ষ্য করিয়া চারিদিকে লোক ছুটিল। ক্রমে শত্রুগণ ছওর পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রুদিগের পদবিক্ষেপ শব্দে হজরত আবুবকর ভীত হইয়া আঁ-হজরতকে বলিলেন, “আমরা এখানে মাত্র দুইজন নিঃসহায় ব্যক্তি আছি। অদ্য আমাদের বিপদ সম্মুখীন।” তাহাতে আঁ-হজরত উত্তর করিলেন, “আমাদের সহিত তৃয় আর এক ব্যক্তি আছেন; তিনি মহাবলশালী ও অসহায়ের সহায়।” শত্রুগণ গুহার নিকটে আসিয়া দেখিল যে, গুহার প্রবেশ মুখে একটী পারাবতের নিলয় আছে এবং তদুপরি মাকড়সার জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। উহাতে শত্রুগণের বিশ্বাস হইল যে, গুহামধ্যে কোন লোক প্রবেশ করে নাই। তখন উহারা অন্য পথ অবলম্বন করিল। খোদাওন্দ করিম প্রকৃতই মহাশক্তিশালী ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা। তাঁহারই আদেশে ও জালের অক্ষুন্ন অবস্থা দেখিয়া শত্রুগণ প্রস্থান করিল। আঁ-হজরত তিন দিবস পরে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া হজরত আবুবকরসহ একটী ক্ষুদ্র রাস্তা অবলম্বন করিয়া এছরেব অভিমুখে

দ্বিতীয় হিজরত ৬২২ খৃঃ।

যাত্রা করিলেন। উহার তিন দিন পরে হজরত আলী (রাঃ) ও তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন, ইহাই দ্বিতীয় হিজরত বলিয়া আখ্যাত।

৬২২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ৫ই রবিয়ল আউয়াল সোমবার এই হিজরত ঘটিয়াছিল। এই বৎসরের মহররম মাসের প্রথম তারিখ শুক্রবার হইতে হিজরী সন গণনা করিয়া আসা হইতেছে। খলিফা ওমর হজরত আলীর পরামর্শ মতে ঐ সময় হইতে হিজরী সন গণনা করেন, যেহেতু তখন হইতে মোছলেম সাম্রাজ্যের প্রথম সূত্রপাত সংঘটিত হয়। অন্যান্য পয়গম্বরগণও ঈদৃশরূপ হিজরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হজরত মুছা (আঃ) ফেরাউন বাদশার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া আরবে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ৪০ বৎসর যাবৎ বনি ইস্রাইলগণ সহ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। হজরত দায়ুদও বাদশাহ ছামুয়েলের ভয়ে আরবে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আঁ হজরত মদিনার এক ক্রোশ দূরস্থিত কোবা নামক স্থানে ছায়েদ-বেন-খায়ছনার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি সর্ব্বপ্রথম মসজিদ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করেন এবং বনি ছালেমের সহিত ছালাতল্ জুম্মা সম্পাদন করেন। হজরত আলী (রাঃ) অতি কষ্টে রাত্রি দিন চলিয়া আসিয়া ঐ স্থানে আঁ-হজরতের সহিত মিলিত হইলেন। ৪ দিবস পরে ১২ই রাবউল আউয়াল রোজ জুম্মা ৬২২ খৃষ্টাব্দে আঁ-হজরত মদিনায় প্রবেশ করিলেন। মদিনাবাসী তাঁহার আগমন সংবাদে পুলকিত হইয়া দলে দলে আসিয়া পৌঁছিল। যে দিন তিনি কোবা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন, মদিনাবাসিগণ স্ত্রী পুরুষ, যুবক, প্রৌঢ়, বালক ও শিশু সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎ জন্য সারি সারি খাড়া ছিল। হজরত উষ্ট্রীর উপর ছওয়ার হইয়া সানন্দ চিত্তে ছালাম লইতে লইতে অগ্রসর হইতে ছিলেন। উষ্ট্রীর লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "যেখানে আপনা হইতে উহা বসিয়া যাইবে, আমি সেইখানেই অবস্থিতি করিব।" অবশেষে উষ্ট্রী এক দরিদ্র

গৃহের অনতি দূরে গিয়া বসিয়া পড়িল। ইঁহার নাম আয়ুব আনছারী। তিনি তৎক্ষণাৎ হজরতের মাল আছবাব উঠাইয়া অতি প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং আপনাকে কৃত কৃতার্থ মনে করিলেন।

যেখানে উষ্ট্রী আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, ঐ স্থানেই মসজিদে নবুবীর প্রবেশ দ্বার স্থাপিত হইয়াছে। যখন আঁ-হজরত মদিনায় পৌঁছিয়া রেছালত (প্রত্যাদেশ) ঘোষণা করিলেন, তখন ইহুদিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল "যদি আপনি যীশুকে প্রতারক বলিয়া অভিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে মছী বলিয়া গ্রহণ করিব।" অন্য পক্ষে খৃষ্টানগণ আসিয়া বলিল, "যদি আপনি যীশুকে খোদার পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তবে আমরা আপনাকে যীশুর স্থলবর্ত্তী ও প্রধান শান্তিদাতা বলিয়া গ্রহণ করিব।" এই সময় হেজাজের খৃষ্টানগণ অল্প সংখ্যক ও দুর্ব্বল ছিল, কিন্তু ইহুদিগণ বহু সংখ্যক ও ক্ষমতাপন্ন ছিল। আঁ-হজরত ইচ্ছা করিলেই সহজে ইহুদি-দিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু কোরায়েশদিগের সম্মুখীন হইতে পারিতেন এবং ইহুদিদিগের সাহায্যে সমস্ত আরবের একাধীশ্বর হইতে পারিতেন, কিন্তু সত্যপরায়ণ রছুল ইহুদিদিগকে সাহায্য না করিয়া বরং যীশুখৃষ্ট ও তদীয় মাতার বিরুদ্ধে ইহুদিগণ দ্বারা যে সকল অপবাদ রটিত হইয়াছিল, তিনি তাহা রদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইহুদিগণ তাঁহার শত্রু পক্ষে যোগদান করিল। অন্য পক্ষে আঁ-হজরত খৃষ্টানদিগকে বলিলেন যে, যীশুখৃষ্ট খোদার পুত্র বা তাঁহার অংশীদার ছিলেন না। তিনি অন্যান্য পয়গম্বরদিগের ন্যায় একজন পয়গম্বর ছিলেন মাত্র। ইহাতে খৃষ্টানগণও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। আঁ-হজরত কেবল সত্যতার পক্ষপাতী হইয়া সত্যতাই ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

মদিনাবাসী আনছার (১) ও মক্কার মোহাজের (২) দিগের মধ্যে সখ্যস্থাপন এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনোদ্দেশে সমিতি গঠন :—

মক্কা হইতে যে সমস্ত লোক হিজরত করিয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। মদিনার আনছারগণ উহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। আহার, বিহার ও অবস্থানের কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করেন নাই। আঁ-হজরত ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়া একদা আন্‌ছারদিগকে আহ্বান করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। উহার ফলে আনছারগণ মোহাজেরদিগকে ভ্রাতৃত্বে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের সুখে দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ ও তাঁহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। তদবধি মোহাজের ও আনছার ইছ্‌লামের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রতিদিন ইছ্‌লামের গৌরব বর্দ্ধন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মদিনা নগরীতে মোহাজের ও আন্‌ছার লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ঐ সমিতি কর্ত্তৃক আঁ-হজরত মদিনা নগরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রধান শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি শাসনভার গ্রহণ করিয়াই মদিনাবাসিদিগকে এক ফরমান পাঠাইয়া দিলেন। উহাতে সকলের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। বিশেষ আদেশ ছিল যে, "মদিনাবাসীরা ইহুদিদিগের সহিত কোন প্রকার বিবাদ বিসংবাদ করিবে না। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ হজরতের নিকট বিচারের জন্য পেশ করিতে হইবে।" তৎপরে যে সমস্ত কওম শান্তিপ্রিয় মোছলমানদের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদিগের বিরুদ্ধে

সমিতির প্রতি ফরমান।

(১) সাহায্যকারী (মদিনাবাসী) (২) দেশত্যাগী (মক্কাবাসী)।

যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য তিনি আদেশ দিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে সাবধান করিয়াছিলেন, যেন কেহ শত্রুর বিরুদ্ধে শঠতা বা মিথ্যা ব্যবহার না করে, কোন স্ত্রীলোক বা বালক বালিকাকে হত্যা না করে, পুরুষদিগের প্রতিশোধ জন্য পর্দাস্থিত নির্দ্দোষ স্ত্রীজাতির উপরে কোন অত্যাচার না হয়, পীড়িত ব্যক্তির প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার না ঘটে, নির্ব্বিবাদ লোক-দিগের গৃহাদি বিনষ্ট করা না হয়, খেজুর বৃক্ষে হস্তক্ষেপ কিংবা কোন প্রকার জীবনোপায়ের দ্রব্যাদির ব্যাঘাত করা না হয়।

অমোছ্‌লেমদিগের সাপক্ষে ফরমান।

অতঃপর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের সাপক্ষে আর একটী ফরমান প্রেরণ করিলেন। হিজরতের নয় বৎসর পরে ঐ ফরমান প্রেরিত হয়। ইহাতে আদেশ ছিল যে, "খৃষ্টধর্ম্মীদের সম্পত্তি, ধর্ম্ম ও জীবনের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না, তাহাদের ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে কিংবা তাহাদের দাবী ও অধিকার লইয়া কোন প্রকার বিরোধ করা হইবে না, কোন পাদ্রীকে স্থানচ্যুত করা হইবে না। তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে পারিবে, তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি বা ক্রুশ বিনষ্ট করা হইবে না। তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার অত্যাচার স্বরূপ কর বা সৈন্যদিগের জন্য খোরাক গ্রহণ করা হইবে না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ পূর্ব্বের ন্যায় কাহারও প্রতি অত্যাচার করিবে না, তাহাদের প্রতিও কোনরূপ অত্যাচার করা হইবে না। কোন গীর্জ্জা ধ্বংস করিয়া মস্‌জেদ কিম্বা কোন মোছলেমের বাসস্থানে পরিণত করা হইবে না। খৃষ্টীয় স্ত্রীলোক মোছলেমকে বিবাহ করিয়াও স্বীয় ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে।" আঁ-হজরত এই ফরমান দ্বারা সাম্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে খৃষ্টানগণকে যেরূপ স্বাধীনতা দেওয়া

হইয়াছিল, খৃষ্টানগণ খৃষ্টান শাসক হইতেও তদ্রূপ স্বাধীনতা কখনও পাইতে সমর্থ হয় নাই। আঁ-হজরতের প্রেরিত ফরমানের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। নিঃসন্দেহ আল্লা অতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদ্বারাই সমস্ত পয়গম্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অবিচারের প্রমাণ নাই। আবদুল্লার পুত্র আল্লার প্রেরিত মোহাম্মদ তাঁহার জাতির ও ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের উপর এই দলিল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাই সমস্ত খৃষ্টান জাতি এবং তাহাদের আত্মীয়ের প্রতি জিম্মা ও সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি স্বরূপ; তাহারা উচ্চবংশীয় হউক অথবা নিম্নবংশীয় হউক, সন্ন্যাসী হউক বা অন্যবিধ হউক, আমার যে কোন ব্যক্তি আমার এই দলিলে লেখা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে, সে খোদার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিবে এবং সম্মানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবে, সে রাজাই হউক, রাস্তার লোকই হউক, অথবা অন্য কেহই হউক।

২। যখনই কোন তাপস পর্য্যটন কালে কোন পর্ব্বত, পাহাড় বা গ্রামে কিংবা অন্য কোন বাসের উপযুক্ত স্থানে, সমুদ্রের উপর অথবা মরুভূমির উপর, আশ্রম, গীর্জ্জা অথবা প্রার্থনা গৃহমধ্যে অবস্থান করিবে, আমি তাহাদের এবং তাহাদের সম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ তাহাদের মধ্যে থাকিব এবং আমার সমস্ত লোকজনসহ সাহায্য ও রক্ষা করিব, যেহেতু তাহারা আমার নিজের লোকের অংশ বিশেষ এবং আমার সম্ভ্রম স্বরূপ।

৩। আমি এতদ্দ্বারা আমার সমস্ত কর্ম্মচারীকে আদেশ করিতেছি যে, তাহারা ইহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মকর কিংবা কোন প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবে না। যেহেতু তাহাদের উপর কোন প্রকার বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

৪। তাঁহাদের বিচারক বা গভর্ণর পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও

অধিকার থাকিবে না। তাহারা কর্ম্মচ্যুত না হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।

৫। পথিমধ্যে পরিভ্রমণ কালে কেহ তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে পারিবে না।

৬। তাহাদিগকে গির্জ্জা হইতে বঞ্চিত করিবার কাহারও অধিকার থাকিবে না।

৭। আমার যে কোন ব্যক্তি, আমার আদেশগুলির যে কোনটী ভঙ্গ করিবে, সে আল্লার হুকুম ভঙ্গ করিবে।

৮। তাহাদের বিচারক, শাসনকর্ত্তা, ভিক্ষুক, চাকর, শিষ্য কিংবা আশ্রিত কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার ধর্ম্মকর কেহ আদায় করিবে না কিংবা তাহাদিগকে কোন প্রকারে নির্য্যাতন করিবে না, যেহেতু তাহারা উভয়ে এবং নিজস্ব সকলেই আমার সনদের অন্তর্গত।

৯। যাহারা শান্তভাবে একটী পর্ব্বতের উপর বাস করে, তাহাদের আয় হইতে মোছলেমগণ কোন প্রকার জিজিয়া বা কোন প্রকার কর গ্রহণ করিবে না কিম্বা কোন মোছলমান তাহাদের কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না, যেহেতু তাহারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য কায়িক পরিশ্রম করে।

১০। যখন ফসলের প্রাচুর্য্য হইবে, তখন অধিবাসিগণ তাহাদের প্রাপ্য হইতে এক অংশ তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হইবে।

১১। যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে নির্জ্জনবাস হইতে বাহির করিয়া আনিবে না কিংবা তাহাদিগকে যুদ্ধে যোগদান করিতে অথবা জিজিয়া দিতে বাধ্য করিবে না।

১২। যে সমস্ত খৃষ্টান স্থানীয় অধিবাসী এবং যাহারা তাহাদের ধন ও বাণিজ্য হইতে জিজিয়া দিতে সক্ষম, তাহাদিগের নিকট হইতে সঙ্গত অপেক্ষা অত্যধিক গ্রহণ করিবে না।

১৩। ইহা ব্যতীত তাহাদিগকে অন্য কিছু দিতে আল্লার স্পষ্ট আদেশানুসারে বাধ্য করা হইবে না।

১৪। যদি কোন খৃষ্টান স্ত্রীলোক মোছলেমকে বিবাহ করে, তবে উক্ত মোছলেম তাহার স্ত্রীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার গির্জ্জা বা উপাসনা বা ধর্ম্মবিধি হইতে বাধা প্রদান করিবে না।

১৫। কেহ তাহাদিগকে তাহাদের গির্জ্জার পুনঃ সংস্কার করিতে বাধা দিবে না।

১৬। যদি কোন খৃষ্টান গির্জ্জা বা আশ্রমের মেরামত জন্য বা তাহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত অন্য কোন কাজের জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করে, মোছলেমগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

১৭। যে কেহ আমার এই ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে কিংবা ইহার বিরুদ্ধ বিশ্বাস করিবে, সে নিশ্চয়ই খোদা এবং রছুল হইতে মোরতেদ (বিদ্রোহী) হইবে। যেহেতু আমি তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা অনুসারে ইহা দান করিতেছি।

১৮। কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না। বরং মোছলেম-গণ তাহাদের সাপক্ষে যুদ্ধ করিবে। যদি মোছলেমগণ বহির্দ্দেশস্থ খৃষ্টান-দিগের সহিত শত্রুভাবদ্ধ থাকে, তবে স্থানীয় অধিবাসী কোন খৃষ্টানকে তাহাদের ধর্ম্মের জন্য তাহাদিগের সহিত ঘৃণিত ব্যবহার করিবে না।

১৯। ইহা দ্বারা আমি আজ্ঞা করিতেছি যে, আমার কোন লোক নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণকারী মোছলেমগণ খোদাতায়ালা ও তাঁহার রছুলের অবাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

উপরের লিখিত ফরমানে খৃষ্টানদিগকে যে সব অধিকার প্রদান করা

হইয়াছিল, উহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইছলাম ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য কোন প্রকার বাধ্য বাধকতা করে নাই। (১)

---

(১) ইছলাম খৃষ্টধর্ম্ম হইতে সভ্যতা বিস্তারে অধিকতর সহায়তা করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম অধিককাল যাবৎ লোকের উপর প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ইছলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বরতা, প্রেতপূজা, নরমাংস ভোজন, নরবলী, শিশুহত্যা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি অপসারিত হইয়াছে। নবধর্ম্মাবলম্বীগণ পরিস্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে শিখে এবং আত্মসম্মানের উন্মেষ হয়। অতিথি সেবা ধর্ম্মকার্য্য মধ্যে গণ্য হয়। সুরাপান, জুয়াখেলা, অশ্লীলবাক্য, ব্যভিচার প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অলসতার পরিবর্ত্তে পরিশ্রমশীলতা আসে এবং বিশৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে মিতাচার ও সুনিয়ম দৃষ্ট হয়। পশু ও ক্রীতদাসের প্রতি নিষ্ঠুরতা দূরীভূত হয় এবং বৈরভাবের পরিবর্ত্তে শান্তি স্থাপিত হয়। ভ্রাতৃভাব, দানশীলতা ও জাতীয়তার উন্মেষ হয়। বহুবিবাহ ও তজ্জনিত দোষ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইছলাম জ্ঞানার্জ্জন, সত্যপ্রিয়তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও আত্মসংযম শিক্ষা দেয়। মোট কথা, ইছলামের প্রভাব সর্ব্বধর্ম্ম হইতে অধিক।

হজরত ইছা (আঃ) সামাজিক ব্যভিচার হইতে শিষ্যদিগকে বাঁচাইবার জন্য অনশনব্রত অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আঁ-হজরত সংসার-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ন রাখিয়া সামাজিক উপদ্রব দূরীকরণার্থ যে সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সকল জাতির প্রশংসনীয়। ইছলাম নৈতিকভ্রষ্টতা ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ধর্ম্মের কূটতর্কের পরিবর্ত্তে সরল সহজবোধ্য নীতির আদেশ করিয়াছে, তাপশ্চর্য্যের পরিবর্ত্তে পুরুষকার সৃষ্টি করিয়াছে।

মধ্য যুগে ছারাছেনদিগের বিরুদ্ধে খৃষ্টানগণ ক্রুছেড বা ধর্ম্মযুদ্ধের দোহাই দিয়া মোছলেমদিগের প্রতি যে পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে ইছলামের গৌরব ও উদারতা সহজেই অনুমিত হইবে। জনৈক লেখক বলিয়াছেন, "ক্রুছেড বা খৃষ্টিয় ধর্ম্মযুদ্ধ

ইতিহাসের একটী উন্মত্ত পৈশাচিক দৃষ্টান্ত। তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্টানগণ মোছলেমদিগের প্রতি নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিয়াছিল। ইউরোপের ধন ও জন নিঃশেষ হইয়াছিল এবং সমাজ দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে, ক্ষুধায় ও রোগে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ক্রুছধারিগণ চিন্তার অতীত দুষ্কার্য্য দ্বারা স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল।"

অন্য পক্ষে ইছলামীয় সাম্রাজ্যের সূচনা হইতেই খৃষ্টানগণ সাম্য ও সদয় ব্যবহার উপভোগ করিয়া আসিতেছিল। তাহারা অবাধে ধর্ম্ম পালন করিতে পারিত। তাহারা সামাজিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহারা যথেচ্ছ বিদেশে যাতায়াত ও বৈদেশিকদিগের সহিত পত্র বিনিময় করিতে পারিত। তাহারা মোছলেমদিগের ন্যায় ধন সম্পত্তি অর্জ্জন ও বৃদ্ধি করিতে পারিত। মোছলেমদিগের ন্যায় তাহারাও তুল্যভাবে সাধারণ আফিসে প্রবেশাধিকার পাইত। খৃষ্টীয় যাত্রীগণ প্যালেষ্টাইনে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিত। গির্জ্জা ও খৃষ্টীয় আশ্রম সর্ব্বত্র নির্ম্মিত হইতে পারিত। মোছলেম শাসনে উহাদিগের তীর্থযাত্রার নানাবিধ অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর খৃষ্টানগণের মধ্যে যে সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ছিল, ছারাছেনগণ তাহার মীমাংসা করিয়া শান্তির পথ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন। জেরুশালামে পাদ্রীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহার উপর মোছলেমগণের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। খৃষ্টানগণ বাণিজ্যের জন্য বিশেষ সুযোগ ভোগ করিত। যখন ক্রমে ক্রমে খৃষ্টীয় যাত্রীসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন যাত্রীদিগের মধ্যে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। চুরি ও অসদ্ব্যবহারের সাধারণ বৃত্তান্তগুলি নানাপ্রকারে রঞ্জিত হইয়া ইউরোপে পৌঁছিতে লাগিল এবং উহার ফলে ধর্ম্মযুদ্ধের আদেশ হইয়াছিল।

১০৯৫ সনে পোপ হুকুম দিয়াছিলেন যে, যে সকল খৃষ্টান বিধর্ম্মী মোছলেমদিগকে যীশুর সমাধিস্থান হইতে তাড়াইতে পারিবে, তাহারা পাপ হইতে মুক্ত পাইবে এবং যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা স্বর্গে আরোহণ করিবে। এই আদেশে লক্ষ লক্ষ লোক ধর্ম্মের নামে উত্তেজিত হইয়া নূতন নূতন দেশ অধিকার ও তৎসহ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার লালসায় এবং প্রাচ্যদেশীয় মদ্য ও গ্রীকদেশীয় সুন্দরী রমণীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল। ধনলিপ্সা, কাম, যশঃলালসা খৃষ্টান যোদ্ধাগণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রুসপরিহিত যোদ্ধা গণ, মামলা, মোকদ্দমা ও করদান হইতে নিষ্কৃতি পাইত এবং পাদ্রীগণ তাহার দেহ রক্ষার জন্য বাধ্য থাকিত। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে চিরন্তন সুখ, সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি ও প্রায়শ্চিত্ত হইতে নিষ্কৃতির প্রলোভন দেওয়া হইত। ইহার ফলে উহারা শত্রুর ক্রোড়স্থ শিশুকেও হত্যা করিতে এবং উহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে কিংবা পৈশাচিক ব্যবহার করিতে বিরত হইত না। ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে জনৈক জার্ম্মাণ পাদ্রীর নেতৃত্বে আর এক দল খৃষ্টান সৈন্য পবিত্র তীর্থভূমিকে ব্যভিচার-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল, লুণ্ঠন, হত্যা ও বলৎকার ইহাদের দৈনন্দিন কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।

পাঠকবর্গ, একবার মোছলেম ধর্ম্মযুদ্ধের সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মযুদ্ধের তুলনা করিয়া দেখুন। মোছলেমগণ কিরূপ সাম্যের আদর্শ ও খৃষ্টানগণ কিরূপ পৈশাচিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা একবার অনুধাবন করুন। 'History of the Saracens' নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার যে লোমহর্ষক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ইছলামের সহিষ্ণুতার বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। পৃথিবীর কোন জাতি অত্যুৎপীড়িত হইয়া এরূপ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্ত এযাবৎ দেখাইতে সমর্থ হয় নাই।

ক্রুছেড বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ এবং মৎ প্রণীত মোছলেম জগতের ইতিহাসে প্রদত্ত হইয়াছে।

নবদীক্ষিত মোছলেমগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ—যে সমস্ত লোক মোছলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার লওয়া হইত যে, তাহারা আল্লাহতায়ালা ব্যতীত আর কাহাকেও পূজা করিতে পারিবে না। শিশুহত্যা, দস্যুবৃত্তি বা স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। যে সমস্ত বিজিত লোক দাসরূপে গৃহীত হইত, তাহাদের প্রতি সদাচারের বিশেষ আদেশ ছিল। তাহাদিগকে কেহ মুক্তি প্রদান করিলে তাহাকে খোদাতালার বিশেষ আদরণীয় মনে করা হইত। এই সমস্ত বিজিত লোককে ক্রয়বিক্রয় করিতে বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকাতে যেরূপ দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল, কোন মোছলমান দেশে তাহার অনুমতি ছিল না। ইছলামে পিতামাতাকে পুত্রকন্যা হইতে, ভাই বেরাদরকে বা আত্মীয় স্বজনকে অন্যান্য ভাই বেরাদর বা আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করা বিশেষ নিষেধ ছিল। মোছলেম দাসদাসী পরিবার শ্রেণীভুক্ত হইয়া পারিবারিক সকল অধিকারে অধিকারী হইত; আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে, ক্রিয়াকর্ম্মে, বিবাহাদিতে মনিব ও গোলাম মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল না। এখানে বিচার্য্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মোছলেমগণ বিজিত লোকদিগের প্রতি কিরূপ মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর অধুনা ইউরোপীয় সভ্যজগতে জেতা ও বিজিতের মধ্যে কত মর্ম্মভেদী অত্যাচারকাহিনী শ্রুতিগোচর হয়। পোলছ (Poul) দাসত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন এবং আঁ হজরতও দাসত্ব মুক্তি সম্বন্ধে কি আদেশ করিয়াছেন, একবার তুলনা করিয়া দেখুন। পোলছ বলিয়াছেন, "হে ক্রীতদাস, যিনি তোমার শরীরের মালেক, সর্ব্বান্তঃকরণ ও ভয়ের

সহিত সেইরূপ ভাবে তাঁহার আদেশ পালন কর, যেমন মছীর আদেশ পালন করিয়া থাক।" (এফিথিউন বাব ও দরছ ৫)।

ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, খৃষ্টধর্ম্ম দাসত্বের পোষকতা করে। এই ধর্ম্মানুসারে দাস প্রভুর সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন ও অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় হস্তান্তরিত হইতে পারে। তাহার প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহারের কোন উল্লেখ নাই। এই সম্বন্ধে ইছলামের আদেশ অনুধাবন যোগ্য :—(১) ইছলাম প্রভু ও দাসকে একত্রে আহার বিহারের অনুমতি দেয়; (২) ইছলাম প্রভুকে দাসীর পাণিগ্রহণ করিতে অনুমতি দেয়; (৩) বিবাহিতা দাসীর সন্তানসন্ততিকে পিতার সম্পত্তির অধিকারী করে; (৪) দাস সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণেও অধিকারী; (৫) সে প্রভুর সহিত একত্র নামাজ পড়িতে এবং সর্ব্ববিধ সামাজিক অধিকারে অধিকারী হইতে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উচ্চ গৌরব লাভ করিতে সক্ষম; (৬) দাসকে মুক্তিদান করিলে বিশেষ পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়—যথা :—(ক) নাজাতের উপায়, (খ) পাপের প্রায়শ্চিত্ত, (গ) গোণার কাফ্‌ফারা ইত্যাদি। ইছলামীয় রাজত্বের রাজস্বের অষ্টমাংশ দাসত্ব মুক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট।

ইউরোপ ১৯শ শতাব্দীতে দাসমুক্তির জন্য কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিশেষ হৈ চৈ উঠাইয়াছিল। ইউরোপবাসিগণ কখন চিন্তা করে নাই যে, ইছলাম দাসত্ব মুক্তির জন্য ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কি সুন্দর ধর্ম্মবিধি প্রণয়ন করিয়াছে এবং দরিদ্রের সাহায্যের জন্য কত অধিক ব্যয়সঙ্কুল উদারনীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

মদিনাশরিফের নামকরণ—ইতঃপূর্ব্বে মদিনা "এছরব" নামে আখ্যাত ছিল। আঁ হজরতের আগমনের পর হইতে উহা মদিনা সহর নামে অভিহিত হইল। প্রকৃত পক্ষে মদিনার আবাদ ইছলামের প্রারম্ভ হইতেই সুরু হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে উহা পৌত্তলিকতা ও অসভ্য-

তার অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। এক্ষণে আঁ-হজরত মদিনাবাসিদিগের এবাদত (উপাসনা) গৃহের স্থান নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মদিনায় উপস্থিত হইয়া যেস্থানে তাঁহার উষ্ট্রী সর্ব্ব প্রথমে বসিয়াছিল, সেই স্থানে তিনি এবাদতগাহ্ মনোনীত করিয়াছিলেন। এই স্থানটী দুইটী এতিম বালকের অধিকারভুক্ত ছিল। উহার পার্শ্বে একটী কবরস্থান ছিল। যদিও উহারা মূল্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি আঁ-হজরত চাঁদা উঠাইয়া তাহাদিগের প্রাপ্য আদায় করিয়াছিলেন। তৎপরে মসজেদের কার্য্য শুরু হইল। সমস্ত মোসলেম ভাই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। খোদ হজরত উহাদিগকে সাহায্য করিতেন এবং স্বয়ং অন্যান্য সাধারণ মজুরের ন্যায় কাঁচা ইট দিয়া গাঁথনির কাজ করিতেন। মছজেদটীর কোন ধূমধাম ছিল না। উহার ছাদ খজুর পত্র দিয়াই গঠিত হইয়াছিল। হজরত মিম্বরের (১) ৩য় সিঁড়ির উপর কখনও বসিয়া কখনও বা খাড়া হইয়া ওয়াজ করিতেন।

মসজেদে নববীর পত্তন

আঁ হজরতের সর্ব্বপ্রথম খোত্‌বা পাঠ—আঁ হজরত সর্ব্বপ্রথম নিম্নলিখিত খোত্‌বাটী পড়িয়াছিলেন :—"আয় লোক! তোমরা মউতের পূর্ব্বে "নেক আমল" করিয়া পরকালের সম্বল গুছাইবে। অন্যথা খোদার কছম একিন জানিবে, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ভীষণ বিপদ মধ্যে পড়িবে। যেমন মেষপালক ব্যতীত মেষগুলি এদিক ওদিক ছুটিয়া যায়, হাসরের দিন তোমাদেরও ঐরূপ অবস্থা হইবে। আপন আপন রক্ষার জন্য কাহারও আশ্রয় পাইবে না। খোদাওন্দ করিম জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমার কোন পয়গম্বর কি তোমাদের নিকট আসে নাই? বা তোমাদের নিকট আমার কোন পয়গাম পৌছায় নাই?

(১) বক্তৃতা মঞ্চ।

আমি কি তোমাদিগকে প্রভূত কল্যাণের দ্বারা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করি নাই ? তবে কেন তোমরা "নূহ নবীর বংশধরদিগের" প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর না ? তোমরা স্বীয় মঙ্গলের জন্য কি কোন বস্তু মউতের পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ ? তখন এন্‌ছান ডাইনে বামে তাকাইবে, কিন্তু কোন বস্তু দেখিতে পাইবে না। তাহারা পুনরায় যখন সম্মুখে তাকাইবে, তখন জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নজরে আসিবে না। তাই বলি, পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হও। খেজুরের দানা হইতে অন্ততঃ এক টুক্‌রা খোদার রাহে দিয়া কেন নেকী অর্জ্জন করিতেছ না ? যদি ইহাও কাহারও সম্বল না থাকে, তবে কেবল মিষ্ট কথাদ্বারা কেন নেকীর অংশী হইতেছ না ? জানিবে পরলোকে এক নেকীর পরিবর্ত্তে শত নেকী প্রদত্ত হইবে এবং তোমাদের উপর খোদা-তায়ালার ছালামতি (শান্তি), রহমত্ (করুণা), বরকত (প্রাচুর্য্য) আসিবে।"

দ্বিতীয় খোত্‌বা :—খয়রাত সম্বন্ধে হজরতের আর একটী হৃদয়গ্রাহী খোত্‌বা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—"যখন খোদাওন্দ করিম জমি পয়দা করিয়াছিলেন, তখন উহা কাঁপিতেছিল। উহাকে মজবুত করিবার জন্য উহাতে পাহাড় সন্নিবেশ করিলেন। ইহাতে ফেরেস্তাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, খোদাওন্দ ! দুনিয়াতে পাহাড় হইতেও কোন মজবুত বস্তু আছে কি না ? জওয়াব আসিল হাঁ, পাহাড় হইতে লৌহ মজবুত, যেহেতু উহাদ্বারা পাহাড়ের পাথর চূর্ণ বিচূর্ণ করা যায়। পুনরায় ফেরেস্তাগণ প্রশ্ন করিলেন, খোদাওন্দ ! লৌহ হইতে কোন মজবুত জিনিষ আছে কি না ? আবার জওয়াব আসিল—লৌহ হইতে অগ্নি অধিকতর তেজস্বী ও মজবুত, যেহেতু উহাতে লৌহ বিগলিত হয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল, খোদাওন্দ ! অগ্নি হইতেও কোন জোরওয়ার (শক্তিশালী) বস্তু আছে

কি না? পুনরায় উত্তর আসিল, হাঁ, অগ্নি হইতে পানি জেয়াদা জোরওয়ার, যেহেতু পানিদ্বারা অগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল, পানি হইতে জোরওয়ার আর কোন বস্তু আছে কি না? আবার জওয়াব আসিল, হাওয়া, যেহেতু হাওয়া পানি উছলিয়া দেয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল, খোদাওন্দ! হাওয়া হইতেও জোরওয়ার কোন বস্তু আছে কি না? আবার জওয়াব আসিল, হাঁ, খয়রাত, যাহা এক হস্তে প্রদান করিলে অপর হস্তে সন্ধান পায় না। খয়রাত মহব্বত হইতে পৃথক নহে। খয়রাত হইতে মহব্বত পয়দা হয়। আবার মহব্বত হইতে খয়রাতের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়। এনছানের প্রতি ভ্রাতৃত্ব স্থাপনকে খয়রাত বলে। প্রতি পুণ্য কাজকে খয়রাত বলে। মিষ্টভাষাকেও খয়রাত বলে। পথিকের জন্য রাস্তা সুগম করাকে খয়রাত বলে। ভ্রান্তকে সৎপথে আনয়ন করাকেও খয়রাত বলে। পিপাসার্ত্তকে পানীয় দান করাকেও খয়রাত বলে। ইছলামের প্রতি হামদর্দ্দি ও সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শন মানুষের প্রধান সম্পত্তি। কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার সম্পত্তি কি ছিল? কিন্তু ফেরেস্তাগণ জিজ্ঞাসা করেন, মৃতব্যক্তি দুনিয়াতে কি কি খয়রাত করিয়াছিল? এই সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেক ইহুদি ও নাছারা মোছলেম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

ছালমান্ ফার্‌ছির ইছ্‌লাম গ্রহণ ঃ—ইনি ইস্পা-হানের অন্তর্গত জনৈক গ্রাম্য ধনবান কৃষক সন্তান। ইঁহার পিতা অগ্নিপূজক ছিলেন। ইনি সত্যধর্ম্মের অনুসন্ধানে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে আঁ হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ইছলাম গ্রহণ করেন। ইঁহার ইতিহাস পরিশিষ্টে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইল।

যখন মোছলেমদিগের হেফাজত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না, তখন আঁ-হজরত সাংসারিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। এযাবৎ সংসারের প্রতি খেয়াল করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। তদীয় গার্হস্থ্য কার্য্যাদির কোন শৃঙ্খলা ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত আঁ-হজরতের বিবি ছওদা, কন্যা ফাতেমা ও ওম্মে কুলছুম এবং হজরত আবুবকরের কন্যা আয়েষা ও আছমা মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এইক্ষণে বাসগৃহ ও মসজিদ নির্ম্মিত হইলে আঁ-হজরত স্বীয় ও হজরত আবুবকরের পরিবারবর্গ আনাইবার জন্য মক্কায় দুইটী উষ্ট্র পাঠাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বেলাল, হাম্‌জা, ও জয়েদ প্রভৃতি গুপ্তভাবে ও হজরত ওমর প্রকাশ্যভাবে সশস্ত্র মদিনায় পৌঁছিয়াছিলেন।

হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর—(হজরত আলীর সহিত হজরত ফাতেমার শুভ পরিণয়)

হজরত ফাতেমার সহিত হজরত আলীর শুভ পরিণয় সংঘটিত হইল। ঐ সময়ে হজরত আলীর বয়স ২২ বৎসর, হজরত ফাতেমার বয়স ১৫ বৎসর ছিল। এই বিবাহে কোন আড়ম্বর ছিল না। যৌতুকও অতি সামান্য রকমের ছিল। আঁ-হজরত কন্যাকে মাত্র দুইটী এজার, একটী আটা পিসিবার চাক্‌তি, দুইটী মাটীর কলসী, একটী মাটীর লোটা, আর একটী বিছানা দিয়াছিলেন। হজরত আলী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত করিবার জন্য জেরা (সাংগ্রামিক পরিচ্ছদ বা লৌহবর্ম্ম) বিক্রয় করিয়া জেয়াফতের ছামান করিলেন।

আঁ-হজরত মুক্তদাস ও প্রিয় সহচর জায়েদের সহিত এক পরমাসুন্দরী সম্ভ্রান্ত বংশীয় আত্মীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। জায়েদের স্ত্রী স্বীয় বংশ-গৌরব ভাবিয়া সর্ব্বদা মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেন। উভয়ের মধ্যে কলহের উদ্রেক হইল, পত্নীর ঘৃণা সহ্য করিতে না পারিয়া জায়েদ হজরতের নিকট

আসিয়া তালাকের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। আঁ-হজরত তাঁহার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়া স্বীয় স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং খোদাতালার ভয় রাখিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু যখন গর্ব্বিণী স্ত্রীর দারুণ অভিমান অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন জায়েদ স্ত্রী জয়নবকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। জায়েদের এই ব্যবহারে আঁ-হজরত ক্ষুব্ধ হইয়া জয়নবকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে উপদেশ দিলেন। জয়নবের অভিভাবকগণ তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের জন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে আত্মীয় স্বজনের কটুবাক্য হইতে জয়নবকে রক্ষা করিবার জন্য আঁ হজরত স্বয়ং তাঁহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

তালাক বা প্রয়োজনানুসারে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ ইছলাম ধর্ম্ম অনুমোদন করে। ইহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে তালাকের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহার যে প্রভূত উপকারিতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ বিরুদ্ধ ভাব ঘটিলে অর্থাৎ একজন অন্য জনের জীবন নাশের চেষ্টা করিলে কিম্বা পতি বা পত্নী চিররোগী হইলে বা দুরারোগ্য বাতুলতায় আক্রান্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি এরূপ অবস্থায় ত্যাগ করা না যায়, তাহা হইলে উভয়েরই জীবন কষ্টদায়ক হইয়া উঠে।

(১) ফতেমা (৬০৬—৬৩২) হজরত খোদেজার গর্ভজাত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কন্যা। তিনি ৬০৬ অব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ তাঁহাকে চারিজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোকের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে হজরত আলীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি হজরত আলীর একমাত্র স্ত্রী ছিলেন।

মুছায়ী ধর্ম্মে সকল অবস্থাতেই স্ত্রী বর্জ্জন প্রথা প্রচলিত আছে। ইছায়ীগণও ব্যভিচার দোষে স্ত্রীবর্জ্জন আইনসঙ্গত মনে করেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত স্ত্রীবর্জ্জনকে আঁ-হজরত দোষাবহ বলিয়াছেন।

আঁ-হজরত মছজেদের নিকট বিবি আয়েষা ও বিবি ছাওদাকে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উভয়কে সমচক্ষে দেখিতেন এবং উভয়ের নিকট সম নির্দ্দিষ্ট কাল যাপন করিতেন। আন্‌ছার, মোহাজের, ইহুদী, নাছারা প্রভৃতি সকলেই হজরতের নিকট আসিয়া সাংসারিক কাজকর্ম্মের পরামর্শ লইত। হজরত উহাদিগকে সমবেত করিয়া সকলের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইতেন যে, কেহ কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না, এবং শত্রু আসিলে সকলেই তাহার বিপক্ষে খাড়া হইবে এবং আপোষে প্রত্যেকের বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া দিবে। যদি তাহারা আপোষে কৃতকার্য্য না হয়, তবে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবে এবং একবাক্যে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার মীমাংসা কার্য্যে পরিণত করিবে।

সামাজিক শৃঙ্খলাসম্পাদন

ইহুদীগণের শত্রুতার মূলতত্ত্ব:—প্যালেষ্টাইন বনি ইস্রাইলদিগের বাসভূমি। উহারা হজরত এয়াকুবের বংশধর। হজরত দাউদের সময় জেরুশালেম সমগ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। পরে ইহুদিরাই তথায় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত করে। ইহুদিয়া প্রদেশবাসিগণ বনি ইস্রাইলদিগের সমধর্ম্মাবলম্বী হইলেও দেশের নামানুসারে ইহুদি নামে অভিহিত হয়। ইহুদি ও বনি ইস্রাইল জাতি সমভাবে সমগ্র প্যালেষ্টাইন জুড়িয়া বাস করিতে থাকে। পরে বাবিলনরাজ বখ্‌ত্‌ নছরের সময় (খৃঃ পূঃ ৫৯৯) ইহুদিরাজ্যের পতন হয় এবং ইহুদিয়া বাবিলন রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। তদনন্তর প্যালেষ্টাইনের মধ্যে পারস্যরাজগণের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়, (খৃঃ পূঃ ৫৩৮)। তৎপরে গ্রীকরাজ আলেক-

ভাণ্ডারের অভ্যুত্থানে প্যালেষ্টাইন গ্রীসের পদানত হয় (খৃঃ পূঃ ৩২৩) তৎপরে রোমকরাজগণের ক্রমাগত অত্যাচারে ও তাড়নায় এবং করভারে প্রপীড়িত হইয়া অনেক ইহুদি জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া চিরস্বাধীন মরুময় আরবদেশে বাস করিয়া আসিতেছিল। সেকালে ইহুদিগণই প্রাচীন সভ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। তৎকালীন আরবজাতির তুলনায় আরবের ইহুদি জাতি সর্ব্বপ্রকারে উন্নত ছিল। ইহাদের সমাগমে আরবজাতি বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

ইমনের ইহুদিগণ কাহ্‌তান বংশসম্ভূত ছিল। ইমেন যখন জলপ্লাবিত হইয়াছিল, তখন উহারা মদিনায় আসে। ইহারা আওছ ও খাজরাজ দুই ভাইএর খান্দান হইতে উৎপন্ন। ক্রমে এই দুই খান্দান মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে।

ফলে উহারা কোরায়েশদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু সাহায্য পায় নাই। অবশেষে আঁ-হজরতের অভ্যুদয়ের কথা শুনিয়া উহাদের কয়েকজন মক্কায় পৌছিয়া আঁ-হজরতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। ইহারাই আনছার নামে অভিহিত।

ইহুদিদিগের মধ্যে কয়েক সম্প্রদায় ছিল:—বনি নজি, বনি কাউনকা, বনি কোরায়জা। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কেল্লা ছিল। কুশীদ গ্রহণ ও বাণিজ্য ইহাদের ব্যবসায় ছিল। ইহুদিগণ বনি ইছমাইলের মধ্যে জনৈক নবী পয়দা হওয়ার সংবাদ জানিত এবং তাহারা তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইহারা মনে করিয়াছিল, তিনি ইহুদিদিগের নির্য্যাতন দূর করিবেন এবং উহাদের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন। মদিনায় হজরতের শুভাগমন শুনিয়া ইহারা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন উঁহারা দেখিল যে, ইনি মছীকে সত্যবাদী স্বীকার করিতেছেন, মছীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইছলামের অঙ্গ বিশেষ বলিতেছেন এবং

হজরত মছীর বুজর্গী বর্ণনা করিয়া ইহুদিদিগকে ন্যায়ের চক্ষে দোষী প্রমাণ করিতেছেন, তখন ইহুদিগণ যেমন ইছায়ীদিগকে হিংসা করিত, সেইরূপ আঁ-হজরতকেও শত্রুরূপে দেখিতে লাগিল। অন্য পক্ষে ইছায়ীগণ মনে করিয়াছিল যে, জনৈক নবী-ভবিষ্যতে জন্মিয়া পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করিবেন, মছীর সত্যতা প্রমাণ করিবেন এবং ইহুদিদিগের বিরুদ্ধে ইছায়ীদিগের পোষকতা করিবেন, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, ইনি খোদার পুত্রত্ব, ত্রিত্ব ও রোহবানিয়তের (সন্ন্যাসব্রত) বিরুদ্ধবাদী, তখন ইহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে চলিতে লাগিল।

মদিনাবাসী আবদুল্লা-বেন-ওবাই (যিনি একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিবার আশা রাখিতেন) হজরতকে সমস্ত শ্রেণীরই সম্মানিত নায়ক হইতে দেখিয়া হিংসা পোষণ করিতে লাগিলেন এবং মক্কাবাসিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। মক্কাবাসিগণ মদিনায় হজরতের নায়কত্বের কথা শুনিয়া বড়ই বিচলিত হইল। আবদুল্লা-বেন্-ওবাই মক্কাবাসিদিগকে সাহস দিলেন যে, যদি তাহারা মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ সাহায্য প্রদান করিবেন।

কোরায়েশগণের যুদ্ধের আয়োজন—মক্কানগরীতে কোরায়েশগণ একতাবদ্ধ হইয়া ইছলামের মূলোৎপাটন করিবার জন্য, যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে একই সময় আক্রমণ দ্বারা মদিনাবাসিদিগকে বিধ্বস্ত করিবার ও চিরতরে ইছলামের নাম ও নেশান উঠাইয়া দিবার জন্য শত্রুগণ বদ্ধপরিকর হইল।

এদিকে দরিদ্র মদিনাবাসিগণ যুদ্ধের আয়োজনের খবর পাইয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। মোহাজেরগণ প্রার্থনা করিতে লাগিল, "খোদাওন্দ! আমরা দরিদ্র মোহজেরগণ মাতৃভূমি ও আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে কয়েকটী শিশু ও স্ত্রীলোক সহ আশ্রয় লইয়াছি, তথাপিও

শত্রুগণের দ্বেষ, হিংসা বিদূরিত হয় নাই। এখানেও আমাদিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা। এখানেও অনাথা স্ত্রীলোক ও এতিম বালকদিগকে হত্যা করিবার অভিলাষ। খোদাওন্দ! আমাদের অপরাধ এই যে, আমরা কেবল তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমরা সাংসারিক সুখসম্ভোগ সবইত তোমারই নামের জন্য পদদলিত করিয়াছি। খোদাওন্দ! আমরা দূরদেশে আসিয়া ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক। খোদাওন্দ! তোমার হবিবের (বন্ধুর) নায়কত্বে কয়েকটী ক্ষুদ্রপ্রাণ নির্ব্বাসনব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তবুও কি শত্রুগণের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই? আমরা তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তোমারই কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। খোদাওন্দ! যখন তোমার হবিবের শরণাগত হইয়াছি, তখন জীবনের সংশয় করি না। একমাত্র সত্য অবলম্বন করিয়া, একমাত্র ইমানকে সাক্ষী রাখিয়া, আমরা নিজকে শত্রুর করালগ্রাসে নিক্ষেপ করিব। খোদাওন্দ! তুমি শক্তি দাও, আমরা শত্রুর সম্মুখীন হই।"

এইরূপ স্থির করিয়া মোহাজের ও আনছারগণ শ্যাম দেশ হইতে যে সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বাধা দিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

আবু ছুফিয়ান শত্রুপক্ষের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। আবুতালেবের মৃত্যুর পর মক্কার শাসনভার ইহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, মোছলেমগণ এই যুদ্ধে স্বস্ব জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সম্মুখীন হইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া আবুজেহেলকে আরও সহস্র সৈন্য এই যুদ্ধে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। আবুজেহেল সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইল। আবু ছুফিয়ান অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া মক্কায় প্রত্যাগমন

করিল। হজরত মোছলেম সৈন্যদিগের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তিনি সমবেত সৈন্যদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খোদাওন্দ করিমের দরগায় মোনাজাত করিলেন :—"আয় খোদাওন্দ! এখন তোমার সাহায্য প্রেরণ কর। কয়েকটী নির্ব্বাসিত রূহকে আশ্রয় দাও। যদি এই মুষ্টিমেয় বিপন্ন মোছলেমগণ শত্রুহস্তে নিহত হয়, তবে তোমাকে পূতমনে এবাদত করিবার কেহ থাকিবে না।" এই মোনাজাতের পর হজরত অতি পারদর্শিতার সহিত সৈন্যগণকে বদর নামক যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করিয়া সুবিধাজনক স্থানে তাঁবু গাড়িবার আদেশ দিলেন। এই প্রথম যুদ্ধে হজরত যে সমর-নৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালের নামজাদা সেনানায়কদিগেরও অনু-করণীয়। এই যুদ্ধ ৬২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। মোছলেম পক্ষে মাত্র ৩১৩ জন সৈনিক ছিল। তন্মধ্যে মোহাজের ৬০, আন্‌ছার ২৪০ জন ছিল। যুদ্ধের জন্য মাত্র ২টী ঘোড়া ও ৬০টী উট প্রস্তুত ছিল।

বদরযুদ্ধে নায়কত্ব ৬২৪ খৃঃ

শত্রুপক্ষ হইতে ৩ জন তেজস্বী সৈনিক দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া মোছলেম-গণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। মোছলেমদিগের পক্ষ হইতে হামজা (রাঃ), আলী (রাঃ) ও ওবায়দা (রাঃ) উহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুপক্ষের সৈনিক ত্রয় হত হইল। উহার ফলে সমস্ত শত্রুর মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

সকলেই জীবন পণ করিয়া মোছলেমদিগের সম্মুখীন হইল। ভীষণ বেগে উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সত্য ও অসত্যের ভীষণ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রকৃতিও ভীষণভাব ধারণ করিয়া অনাশ্রয় মোছলেমদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল। শীতের কঠোরতার

মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বিদ্যুৎ কড় কড়. শব্দে শত্রুগণের বক্ষে ভয় জন্মাইয়া দিল। তন্মধ্যে বৃষ্টিধারা শীতের আতঙ্ক বাড়াইয়া দিয়া শত্রু-পক্ষকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অবশেষে মক্কাবাসিগণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। উহাদের সেনানায়ক আবুজেহেল নিহত হইল। কোরায়েশ-দিগের ৭০ জন নেতা নিহত হইল এবং ৭০ জন মোছলেমদিগের হস্তে বন্দী হইল। মক্কাতে যে "দারুন্নদোয়া" নামক সমিতি ছিল, তাহার ১১ জন সভ্য এই যুদ্ধে হত হইয়াছিল এবং ৩ জন ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তৎকালীন যুদ্ধনীতির রীত্যানুসারে শত্রুপক্ষ হইতে কেবল মাত্র ২টা শোণিত পিপাসুকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। শত শত আশ্রয়হীন দরিদ্র মোছলমানকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পাতিত করিবার জন্য ইহারা বড়ই উৎসুক ছিল এবং একত্বের নিশান চিরতরে পৃথিবী হইতে ঘুচাইবার জন্য ইহাদের অদম্য উৎসাহ ছিল। যাহা হউক, হজরত দয়াপরবশ হইয়া এই ভীষণ সংগ্রামে অন্যান্য দুর্দ্ধর্ষসৈনিকদিগকে মোছলেম-দিগের অনিচ্ছা সত্বেও অব্যাহতি দিয়াছিলেন! কেবল মাত্র তাহাদের নিকট হইতে এইমাত্র অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল যে, উহারা কখনও মোছলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না। যাহারা অঙ্গীকারে অস্বীকৃত ছিল, তাহাদিগকে বন্দীভাবে মদিনানগরীতে প্রেরণ করিবার আদেশ হইল কিন্তু তৎসহ মোছলেমদিগের উপর হুকুম জারি হইল যে, কোন কারণেই বন্দিদিগের উপর নির্য্যাতন করা হইবে না। তাহাদিগের আহার বিহার সম্বন্ধে বিশেষ তাকিদ করা হইয়াছিল এবং এইরূপ আদেশ ছিল যে, যদি বন্দিগণ মোছলেমদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং মোছলেম বালকদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অভিমত প্রকাশ করে, তবে অল্প-কাল পরে তাহাদিগকে মদিনা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। যে সমস্ত বন্দী মক্কানগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা মোছলেমদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি করিয়াছিল।

"খোদা মোছলেমদিগকে সুখে রাখুক। উহারা বদর হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন কালে আমাদিগকে ঘোড়-ছওয়ার হইয়া যাইতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং পদব্রজে গিয়াছিলেন। আমাদিগকে স্বীয় ময়দা ও রুটী প্রভৃতি অর্পণ করিয়া নিজে কেবল খেজুর খাইয়া তৃপ্ত ছিলেন।"

মালে গণিমতের (১) বণ্টন—শত্রু পক্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য মোছলেমগণ হস্তগত করিয়াছিল, সেই সমস্ত বণ্টন করিবার জন্য হজরত কঠোর আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তদবধি যুদ্ধে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের পঞ্চমাংশ খোদার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইত অর্থাৎ এতিম ও অভাবগ্রস্তদিগকে দান ও সাধারণ শুভ কাজে উহা ব্যয় করা হইত।

অবশিষ্ট অংশ সৈনিকদিগকে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিজিত শত্রুকে কিরূপ যত্ন ও সহানুভূতির চক্ষে দেখা হইত আর অধুনাই বা কিরূপ ব্যবহার হয়, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হইয়া পার্লামেণ্টের সাহায্যে ভূমণ্ডলের প্রধানতম বিচক্ষণ সমরনীতিবিশারদ পণ্ডিতবর্গের পরামর্শে যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আর সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে একটী মাত্র উম্মি (নিরক্ষর) মোছলেম নায়কের আদেশমত যুদ্ধ বিগ্রহের যে সমস্ত নিয়ম অতি কঠোরতার সহিত পালিত হইয়াছিল, তাহার তুলনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কত অধিক। শিক্ষার বলে বলীয়ান শত শত বুদ্ধি একত্রে চালিত হইয়া জগতের প্রপীড়িত লোকদিগের উপর কি সুব্যবস্থা হইয়াছে, আর তৎকালীন তিমিরাচ্ছন্ন, পর্ব্বতমালা বেষ্টিত বিস্তৃত মরুভূমির অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রেরিত একটি মাত্র মস্তিষ্ক-প্রসূত নিয়মাবলী কিরূপ প্রশংসিতভাবে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অনুধাবন করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে

(১) বিজিত হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি।

যে, ঐ প্রেরিত পুরুষ স্বীয় শিক্ষা বা মস্তিষ্ক-প্রসূত জ্ঞানের প্রয়োগ করেন নাই, বরং তিনি যে মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে অনৈসর্গিক ব্যবস্থানীতির গঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জঙ্গে বদরের পূর্ব্বে মোছলমানদিগের যুদ্ধ করিবার অনুমতি ছিল না। ইছলাম ছলম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ ছোলেহ (শান্তি) যে ধর্ম্ম পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে চায়, সে ধর্ম্ম কখনও রাজ্যাধিকার হেতু অন্যের উপর জুলুম করিবার অনুমতি দেয় না। কোরায়েশগণ যেরূপ সশস্ত্র যুদ্ধ সজ্জা করিয়া আসিয়াছিল, যদি মোছলমানেরা তদ্রূপ যুদ্ধেচ্ছু হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, তবে উহাদের মছজিদ্, ইছায়ীদিগের গির্জ্জা, ইহুদি-দিগের এবাদতগাহ, অগ্নিপূজকদিগের মন্দির ভূমিসাৎ হইত এবং সমগ্রজাতি একত্রে নিষ্পেষিত হইত।

যখন মদিনাশরিফে বদরের জয়গীতি চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছিল এবং মোছলেমদিগের মধ্যে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছিল, তখন হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, বদরের জয়দিনে হজরতের কন্যা "রোকেয়া" মদিনাশরিফে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে হজরত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন এবং মোছলেমদিগের আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে হজরতের অপর কন্যা "জয়নব" মক্কাভূমিতে বহুকষ্টে শত্রুদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া মদিনা নগরীতে পৌঁছিলেন। ইহাতে হজরতের শোকভার কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইল। "রোকেয়ার" মৃত্যুর পরে তদীয় স্বামী হজরত ওছমান বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হজরত ওমর তাঁহার কন্যা হাফ্‌ছাকে হজরত ওছমানের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যাটির প্রকৃতি চঞ্চলা ছিল, তাই হজরত ওছমান তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।

ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হজরত ওমর আঁ-হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিলেন। আঁ-হজরত হাসিয়া উত্তর দিলেন, তুমি ব্যস্ত হইও না, হাফ্‌ছার (১) জন্য ইহা অপেক্ষা ভাল বন্দোবস্ত হইবে এবং ওছমানও তাঁহার অভিপ্রেত সঙ্গিনী পাইয়া সুখী হইবে। এই বলিয়া তিনি হজরত ওমর ও হজরত ওছমান উভয়কে আশাতীত রূপে সুখী করিবার জন্য স্বয়ং হাফ্‌ছার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন এবং স্বীয় কন্যা ওম্মেকুলছুমকে হজরত ওছমানের হস্তে অর্পণ করিতে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। ইহার ফলে হজরত ওমর ও হজরত ওছমান উভয়েই সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আঁ-হজরত বিবি হাফ্‌ছার উপর এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁহারই হেফাজতে কোর্‌আন্‌ মজিদের আয়েত সকল রাখিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

বিবি হাফ্‌ছার পাণিগ্রহণ

হজরত ওছমানের সহিত আঁ-হজরতের কন্যা ওম্মেকুল-ছুমের বিবাহ

বদরের যুদ্ধে ওবেদার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা স্ত্রী জয়নবের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে গ্রহণ কিংবা ভরণ পোষণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। আঁ-হজরত জয়নাবকে নিঃসহায় ও অনাথিনী দেখিয়া বিবাহ করেন। বিবাহের ২।৩ মাস পরে বিবি জয়নাব ইহসংসার ত্যাগ করেন।

বিবি জয়নাবের পাণিগ্রহণ

এই বৎসর ১৫ই রমজান তারিখে হজরত আলীর পুত্র ইমাম হাছন ভূমিষ্ঠ হন। আঁ-হজরত নবজাত শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁহার মস্তকের কেশের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা দরিদ্র দিগকে দান করিয়া নবকুমারের নাম হাছন রাখিলেন।

ইমাম হাছনের জন্ম

(১) হাফ্‌ছা—ইঁহার প্রথম স্বামী কোরায়শী কোনায়েছ অপুত্রক অবস্থায় বদর যুদ্ধের পর পরলোকগমন করিয়াছিলেন। আঁ-হজরতের পক্ষ হইতেও ইঁহার কোন সন্তানাদি জন্মে নাই।

ওম্মেছালেমা কোরায়েশদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে স্বামীর সহিত আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তিনি মদিনায় আসিলে সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। অবশেষে আঁ-হজরত সদয় হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন।

ওম্মেছালেমার পাণিগ্রহণ

এদিকে মক্কাবাসিগণ বদরের পরাজয়ে বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং প্রতিহিংসা লইবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। একদিন হজরতকে কোন বৃক্ষতলে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া জনৈক কোরায়েশ প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল এবং একাকী তাঁহাকে ভূতলশায়ী দেখিয়া মনে করিল, অসির একটী আঘাতে তাঁহার শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া চিরতরে ইছলামের ধ্বজা পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দিবে। কিন্তু হঠাৎ সে ভাবিল, নিদ্রাগত ব্যক্তিকে হত্যা করা কাপুরুষতার পরিচায়ক। তাই হজরতকে জাগরিত করিয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে সে বলিল, "এখন তোমাকে কে বাঁচাইবে?" হজরত আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিলেন 'ঐ পবিত্র এলাহী।' এই কথা শুনিতেই কোরায়েশের সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর কাঁপিতে লাগিল এবং তরবারী তাহার হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল। অমনি হজরত তরবারী লইয়া তাহার সম্মুখে খাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্, এখন তোকে কে রক্ষা করিবে?" সে বলিল, "কেহ নহে।" তখন আঁ-হজরত বলিলেন, "হতভাগ্য বল্, ঐ আল্লাপাক"। তৎপরে হজরত উহাকে তরবারী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "সর্ব্বদা ঐ জাতপাকের উপর নির্ভর করিবে এবং বিনা

অদ্বিতীয় ক্ষমাশীলতা

কারণে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে কখনও নির্য্যাতন করিবে না। হজরতের এইরূপ অসাধারণ দয়া ও উদারতা দেখিয়া কোরায়েশ স্তম্ভিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ আঁ-হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ইছলাম গ্রহণ করিল। ইহার পর হইতে সে আজীবন হজরতের সেবা ও সাহায্যে নিযুক্ত ছিল।

কেবল মক্কাবাসিগণ মোছলেমদিগের শত্রু ছিল তাহা নহে। মদিনা-বাসী ইহুদিগণও শত্রুতা আরম্ভ করিল। যে দিন আঁ-হজরত মদিনায় উপস্থিত হন, সেদিন বনি কোরায়জা, বনি নজির, বনি কাউনকা প্রভৃতি দলস্থ ইহুদিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। আঁ-হজরত তাহাদের গৃহে গমন না করিয়া আবু আয়ুবের গৃহে অবতরণ করিলেন বলিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা আঁ-হজরতের ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল; মদিনার কয়েকজন খৃষ্টান কেবল ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহুদিগণ যখন দেখিল যে, মোছলেমগণ দিন দিন বলশালী হইতেছে এবং শিক্ষা সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন হিংসায় তাহাদের সর্ব্বশরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। মোছলেমগণ পরাক্রান্ত হইলে উহাদের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহাদের উচ্ছেদ জন্য তাহারা নানা উপায়, কৌশল ও ষড়যন্ত্র অবলম্বন করিল।

আঁ-হজরতের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহারা নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। একদা কোন বস্তীতে একদল ইহুদি ছলনা করিয়া হজরত ও তাঁহার আছ্‌হাবদিগকে প্রাণে মারিবার উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। হজরত বুঝিতে পারিয়া কৌশল ক্রমে তথা হইতে তাহাদের অগোচরে প্রস্থান কারয়াছিলেন। ইহাতে ইহুদিগণ বিফল মনোরথ হইয়া মোছলেমদিগের প্রতি প্রকাশ্যে শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিল। ঐ কবিলার সর্দ্দার বাদশাহ হারেছ মদিনাবাসীদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য লোকজন

সহ যাত্রা করিলেন। হজরত এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য সামন্ত সহ উহাদের সম্মুখীন হইলেন এবং পথি মধ্যে উহাদিগকে পরাজিত করিলেন। বাদ্‌শাহও তৎসহ তাঁহার লোকজন পলায়ন করিল। দুই শত লোক বন্দী হইল। যুদ্ধে শত্রুগণ হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সৈন্যগণ মধ্যে বণ্টন করা হইল। বাদ্‌শাহ হারেছের কন্যাও বন্দিনী হইয়াছিল। এক দিন কন্যাটী হজরতের সম্মুখে আসিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া বলিল, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, আমার আত্মীয় স্বজনও বন্দী হইয়াছেন। যদিও আপনার ধর্ম্ম হইতে আমার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক, তথাপি আপনার দয়া দাক্ষিণ্য আমার একমাত্র ভরসা। আমি আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। ইহা শুনিয়া হজরতের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। কিন্তু সামরিক আইনের বিরুদ্ধাচরণ অসঙ্গত মনে করিয়া তিনি আপনার পক্ষ হইতে সমস্ত দাবী বুঝাইয়া দিয়া বাদ্‌শাহ কন্যা জাবেরিয়াকে নিষ্কৃতি দিলেন এবং একটী বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়া বাদ্‌শাহজাদীকে তাহার পিতার সমক্ষে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। ইত্যবসরে বাদ্‌শাহ হারেছ অনেক মূল্যবান জিনিষ পত্র লইয়া মদিনাভিমুখে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন যে, ঐ জিনিষের পরিবর্ত্তে হজরতের নিকট হইতে স্বীয় কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করিবেন। পথি মধ্যে কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং কন্যার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। হজরতের ব্যবহার ও মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং কন্যাকে লইয়া হজরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন। জেতা ও বিজিত সমভাবে যে মহাপুরুষের হৃদয় অধিকার করিতে পারে, সেই মহাপুরুষকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়া বাদশাহ আত্মাহারা হইলেন এবং মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ইমান ভিক্ষা করিলেন এবং স্বীয় কন্যাকে তাঁহার দাসীত্বে প্রদান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

আঁ-হজরত বাদশাহ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈন্যগণ মধ্যে খবর হইয়া গেল যে, শাহজাদীর সহিত হজরতের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ শাহজাদীর আত্মীয় স্বজনকে নিষ্কৃতি দিবার অভিমত প্রকাশ করিল। হজরত এই সংবাদ পাইয়া প্রস্তাবিত বিবাহে আর অমত প্রকাশ করিলেন না।

শাহজাদী জাবেরিয়ার পাণিগ্রহণ ও বাদশাহ হারেছের ইছলাম গ্রহণ

শাহজাদী জাবেরিয়া অন্তঃপুরে দাখিল হইলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন নিষ্কৃতি পাইল। বাদশা হারেছ হজরতের এবংবিধ মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সানন্দে দীন ইছলাম গ্রহণ করিলেন।

আঁ-হজরত কাউনকা ইহুদিদিগের সঙ্গে এইরূপ সন্ধি বন্ধন করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার দলের লোকদিগের প্রতিকূলাচরণে নিবৃত্ত থাকিবে, মোছলেমদিগকে কোন শত্রু লক্ষ্য করিলে তাহারা মোছলেম দিগের বিপক্ষ হইয়া উক্ত শত্রুর আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হইবে না। নিয়মানুসারে চলিলে মোছ্‌লেমগণ ইহুদিদিগের বিপক্ষতাচরণ করিবে না। অন্যথাচরণ করিলে ইহুদিদিগের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও আত্মীয় স্বজনের প্রাণ বিনাশ করা হইবে। বদরের রণক্ষেত্র হইতে আঁ-হজরতের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত উপরি উক্ত ইহুদিগণ কর্ত্তৃক এই সন্ধির নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছিল। যখন কাউনকা বংশীয় লোকেরা দেখিল যে, জয়শ্রী মোছলেমদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, তখন তাহারা ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইল এবং সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিল। একদা কোন মোছলেম যুবতী বাজারের দোকানে উপবিষ্ট ছিল, জনৈক ইহুদি তাহার

কনিকাবংশীয়দের সহিত যুদ্ধ

পশ্চাৎ ভাগ হইতে বস্ত্র ছিন্ন করিয়া ফেলে। স্ত্রীলোক নগ্নাবস্থায় লজ্জিত হইয়া মোছলেমদিগের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। অন্য দিকে কবি কাব মোছলেম স্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে অশ্লীল কবিতা রচনা করিয়া শত্রুতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহার সম্প্রদায় মোছলেমদিগের সাহায্যের জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিল কিন্তু ইহার উত্তেজনায় ক্রমে সাম্প্রদায়িক শত্রুতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উপযুক্ত সময়ে ইহাদের চেষ্টা ব্যর্থ না করিলে রাজ্যে বিপ্লব ঘটিবে, এই আশঙ্কায় আঁ-হজরত সত্বর বিবাদের মূলোৎপাটনে ব্রতী হইলেন। তিনি বনি কাউনকা সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয় ইছলাম গ্রহণ কর, অন্যথা মদিনা ত্যাগ কর।" তাহার উত্তরে তাহারা বলিল, "আপনি কোরায়েশদিগের উপর জয়লাভ করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়াছেন। উহারা যুদ্ধে অজ্ঞ, যদি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন তবে বুঝিতেন আমরা কিরূপ পুরুষ।" এইরূপ তাচ্ছীল্যসূচক উত্তর দিয়া তাহারা স্বীয় কেল্লায় আশ্রয় লইল। আঁ-হজরত উহাদিগকে বশীভূত করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন। ১৫ দিন পরে তাহারা অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইল। আঁ-হজরত দয়া পরবশ হইয়া বনু কাউনকা সম্প্রদায়কে নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিলেন, কাহারও জীবনে হস্তক্ষেপ করিলেন না।

আর একজন নজির সম্প্রদায়ের ইহুদি আবুরাফে ছাল্লাম স্বীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি সহ খায়বারে বাস করিতেছিল। খায়বার মদিনার উত্তরে ৪।৫ দিনের পথে অবস্থিত। এই ইহুদিটীও তত্রত্য ছলিম ও গোতফান সম্প্রদায়ের ইহুদিদিগকে মদিনাবাসী মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে বিশেষ উত্তেজিত করিয়াছিল। ইহারা পূর্ব্বেও অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করে নাই। এই সম্প্রদায়ও বনি কাউনকার মত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল। বনু নজির মোনাফেকগণের এবং আবদুল্লা-এব্‌নে-ওবাইয়ের সাহায্যে

নির্ভর করিয়া আঁ-হজরতকে অতি তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর দেয় কিন্তু আব্‌দুল্লা কিম্বা তদীয় ভ্রাতৃবর্গ বনু কোরায়জার প্রতিশ্রুত সাহায্য না পাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

হজরত আয়েষা সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জনঃ—যখন আঁ-হজরত বনি মোছতালিক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন হজরত আয়েষা তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি উটের উপর ডুলীর মধ্যে আসীনা ছিলেন। মদিনার অনতিদূরে একটী মঞ্জেলে তিনি অজু করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি ডুলীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মূল্যবান কণ্ঠহার মঞ্জেলে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তখন ডুলীর পরদা বন্ধ করিয়া উহা আনিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। ডুলীর পরদা বন্ধ দেখিয়া আঁ-হজরত মনে করিলেন যে, বিবি আয়েষা উটের উপর আসীনা, সুতরাং কাফেলা যাত্রা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। হজরত আয়েষা প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, কাফেলা রওয়ানা হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন, অনতিবিলম্বে কেহ তাঁহাকে লইতে আসিবে। অবশেষে ছাপায়ান তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাইয়া তাহার উটের উপর তাঁহাকে বসাইয়া স্বয়ং লাগাম ধরিয়া চলিতে থাকে। হজরত আয়েষাকে একাকিনী একটী যুবকের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া সন্দিহান ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া হজরত আয়েষা দুঃখে পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। আঁ-হজরত ওছামা ও হজরত আলীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ওছামা হজরত আয়েষার নির্দ্দোষতা যথাসাধ্য প্রমাণ করিলেন। হজরত আলী বিবি আয়েষাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সেই জন্য হজরত আলীর প্রতি হজরত আয়েষা কোপাবিষ্ট ছিলেন এবং হজরত ওছমানের পর খলিফা নির্ব্বাচন কালে হজরত আলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা

হন। যাহা হউক অবশেষে কোর্‌আনের আয়েত নাজেল হয়, উহাতে হজরত আয়েষার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হয়। আঁ-হজরতের মৃত্যুকালে হজরত আয়েষার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর ছিল। তাঁহাকে মোছলেম-গণ অতি সাধ্বী ও পবিত্রা মনে করিয়া থাকে। মদিনা শরিফে বিখ্যাত 'অল্‌বাকি' নামক কবরস্থানে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। হজরত আয়েষা ১২১০টী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অতি ধীশক্তি-সম্পন্না ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা ছিলেন, কবিতা তাঁহার প্রিয় বস্তু ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সময় তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইত।

ওহোদের যুদ্ধ।

এদিকে মক্কাবাসিগণ পুনরায় মদিনা আক্রমণের চিন্তা করিতেছিল। এক দিন হেন্দা (১) তাঁহার স্বামী আবুছুফিয়ানকে যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য অতি কর্কশভাবে ভৎর্সনা করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধে হেন্দার আত্মীয় স্বজন আহত হওয়ায় সে স্বামীকে নানা ছলনায় উদ্দীপিত করিয়া ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় বাধ্য করিয়াছিল। তিন হাজার মক্কাবাসী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। উহাদের মধ্যে সাত শত আরোহী, অবশিষ্ট পদাতিক। সৈন্যদিগের নায়কত্ব আক্‌রমা বেন আবুজেহেল ও খালেদ বিন্ অলিদ এই দুইজনের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধায়োজনের সংবাদ ক্রমে মদিনাতে পৌঁছিল। হজরত সমস্ত মোছলমান ভাইকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, এই যুদ্ধে মোছলেমদিগের পক্ষে প্রথমে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। মক্কাবাসীরা প্রথমে আসিয়া আক্রমণ করুক, তৎপরে মদিনাবাসিগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে। প্রাচীন ও বহুদর্শী

(১) হেন্দা—ইনি মক্কাবাসী ওতবার কন্যা এবং আবুছুফিয়ানের স্ত্রী। ইঁহারই গর্ভে মাবিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা হামজা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন তজ্জন্য আঁ-হজরতের প্রতি ইঁহার বড়ই ঘৃণা জন্মিয়াছিল। ৩য় হিজরীতে মক্কাবাসীদিগের সহিত হেন্দা মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্যক্তিগণ ইহাতে একমত হইলেন, কিন্তু যুবকগণ মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে অত্যন্ত আগ্রহ ও জেদ প্রকাশ করিল। হজরত অগত্যা তাহাদিগের রায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু আদেশ করিলেন যে, মোছলেমগণ মুষ্টিমেয় মাত্র, উঁহাদিগকে বিশেষ সাবধানে ও কৌশলের সহিত কাজ করিতে হইবে।

অনন্তর আঁ-হজরত মদিনার ৩ মাইল দূরে "ওহোদ" নামক স্থানে পৌঁছিয়া সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওহোদ গিরির সমসূত্রে মদিনা নগরীকে পশ্চাদ্ভাগে এবং হকিন গিরিকে বামদিকে রাখিয়া সেনাবৃন্দ দণ্ডায়মান হইল। হকিন পর্ব্বতের মূলদেশে একটী সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল। কোরায়েশগণ সেই গিরিসঙ্কটে লুক্কায়িত থাকিয়া পরে হঠাৎ সেই স্থান হইতে আসিয়া মোছলেমদিগকে আক্রমণ করে, আঁ-হজরত আবদুল্লা জোবায়রকে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের সহিত তথায় পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করেন যে, মোছলেম-গণ পরাজিত হউক বা বিজয়ী হউক, কোন অবস্থাতে স্বস্থান ছাড়িয়া যাইবে না। যে পর্য্যন্ত আমি অন্য আদেশ প্রেরণ না করি, সে পর্য্যন্ত কেহই স্থান ত্যাগ করিবে না। সৈন্যের দক্ষিণভাগের নেতৃত্ব আকাসার প্রতি ও বামভাগের নেতৃত্ব আবু-ছোল্‌মার প্রতি অর্পিত হইল। মেকদাদ সেনাশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিতি করিল।

সৈন্য সর্ব্বসমেত মাত্র একহাজার ছিল, তন্মধ্যে আরোহী সৈন্য মাত্র দুই শত আর সমস্তই পদাতিক। সূর্য্যোদয় হইতেই শত্রুগণ সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং অতি বিক্রমের সহিত মোছলেমদিগের প্রতি অসি চালনা করিতে লাগিল। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মোছলেমদিগের সাহসিকতা দেখিয়া শত্রুগণ পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। এমন সময়ে মোছলেম তীরন্দাজগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, হজরতের আদেশ উপেক্ষা করিয়া ধন মাল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। কেহই আবদুল্লার নিষেধবাক্য

মানিল না। অমনি সৈন্যগণ সুযোগ বুঝিয়া মোছলেম সৈন্যদিগকে দুই দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল, আবদুল্লা নিহত হইল, তীরন্দাজগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, সুতরাং মোছলেমগণ শত্রুদিগের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল না। হজরতের আদেশ অমান্য করার ফলে অগণিত মোছলেম সৈন্য হতাহত হইল। অতি পরাক্রান্ত হজরত হামজাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। হজরতের উপরও একটী তীর আসিয়া পড়িল। অতঃপর একটী পাথর আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল, তাহাতে তাঁহার দান্দান মোবারক (পবিত্র দাঁত) সহিদ হইল। ঐ সময় ধ্বজাবাহী সৈন্যটীও (যাহার চেহারায় হজরতের অনেক সাদৃশ্য ছিল) এই যুদ্ধে নিহত হইল। ইহাতে সংবাদ রটিল যে, এই যুদ্ধে হজরত স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে মোছলেমগণ যখন ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন হঠাৎ রাহেব বেন্ মালেক হজরতকে নিহত সৈন্যদিগের মধ্যে জীবিত দেখিয়া মোছলেম সৈন্যদিগকে সংবাদ দিল যে, হজরত জীবিত আছেন। এই সংবাদে সকলেই দৌড়িয়া আসিল এবং হজরতকে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং তাঁহার জখম পরিষ্কার করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হজরত চেতনা লাভ করিলেন। এদিকে আবুছুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা সুযোগ বুঝিয়া হজরত হামজার লাশের নিকট উপস্থিত হইল ; তাহার কুলিশকঠোর বক্ষে প্রতিহিংসা উদ্দীপিত হইল। সে অতি নৃশংসভাবে হজরত হামজার পতিত দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার দ্বেষ ও আক্রোশের প্রতিশোধ লইল। সে অন্যান্য শবের প্রতিও নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল। আবুছুফিয়ান যখন অবগত হইল যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এখনও জীবিত আছেন, তখন সে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল এবং মনে করিল যে, ভবিষ্যতে মোছলেমদিগের হস্তে তাহাকে বিশেষভাবে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে। এই ধারণার বশীভূত হইয়া

এক বৎসরের জন্য ছোলেহ্‌ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল। আঁ-হজরত যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া হজরত হামজা ও অন্যান্য মোছলেমগণের উপর কৃত অত্যাচার দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিশোধ লইবার কোন প্রচেষ্টা করেন নাই। এইরূপ আসন্ন বিপদকালে হজরত যেরূপ দানশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং যেরূপ আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে অতি বিরল। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি যেরূপ সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সময়েও শিক্ষণীয়। তিনি মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া স্বীয় সেনা-পতিত্বে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার গৌরব ইতিহাস চিরকাল ঘোষণা করিবে। (১)

নজির বংশীয় ইহুদিগণ মদিনার প্রান্তভাগ হইতে নিষ্কাষিত হইলে তাহারা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা কি উপায়ে মোছলেম শত্রুতার প্রতিশোধ লইবে দিবারাত্র এই চিন্তা করিতেছিল। অবশেষে ইহারা কোরায়েশদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, কোরায়েশগণ নজির বংশীয় ইহুদিগণকে আপনাদের ইচ্ছানুরূপ সহায় পাইয়া উৎসাহ সহকারে সংগ্রামের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। ইহুদিগণও কোরায়েশদিগের সহিত সর্ব্বান্তঃ-করণে যোগদান করিয়া রণশয্যা করিতে লাগিল। তাহারা প্রথমতঃ জোতকান্ বংশীয় ইহুদিদিগের নিকট আগমন করিল। তৎপরে নজিরবংশীয় ইহুদিগণ অন্যান্য দলের নিকট যাইয়া তাহাদিগকেও বশীভূত করিল।

পরিখা বা খন্দক যুদ্ধ—৬২৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম হিজরীতে আবু-ছুফিয়ান আরবের প্রত্যেক কবিলার নিকট উপস্থিত হইয়া মোছলেমদিগের

(১) নিকটস্থ একটী পর্ব্বতের নাম হইতেই 'ওহোদ' যুদ্ধের নামকরণ হইয়াছে। এই পর্ব্বতটী বিস্তৃত মরুভ্যানের মধ্যে একাকী অবস্থিত, এইজন্য ইহার নাম ওহোদ।

বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা রটনা করত তাহাদিগকে বশীভূত করিল এবং দশ সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া অতি ধুমধামের সহিত পুনরায় মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিল। আঁ-হজরত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন যে, বহুসংখ্যক সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়া এ সময়ে অসঙ্গত। অস্ত্র-শস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের জীবনযাত্রারও কোন উপায় ছিল না। বিগত 'ওহোদ যুদ্ধে' তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল। যাহা হউক এই অপরিমিত সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য স্থিরীকৃত হইল যে, কিছু দূরে নগরের চতুর্দ্দিকে একটী খন্দক বা পরিখা খনন করা হউক, যেন শত্রুগণ হঠাৎ একযোগে মদিনার উপর আক্রমণ করিতে না পারে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে যে পরিখা কাটিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হজরতের মস্তিষ্ক হইতেই বহির্গত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সমরনীতির যে সমস্ত কৌশল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার অধিকাংশের সূচনা হজরত হইতেই। তাঁহার ন্যায় ক্ষণজন্মা সৈন্যাধ্যক্ষ বর্ত্তমান যুদ্ধ-সামগ্রীর সাহায্য পাইলে অচিরে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি যে অসাধারণ সেনানায়ক ছিলেন, বর্ত্তমান কালে সমস্ত জাতিই তাহা স্বীকার করিবে। যখন খন্দক খনন করা হয়, তখন হজরত স্বয়ং উহাতে নিযুক্ত হন। সে সময়ে বর্ত্তমান যুদ্ধ সামগ্রীর কোন সাহায্য না পাইয়া তিনি অতি কষ্টে খন্দক প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। কথিত আছে, হজরত ও তাঁহার সঙ্গীদের কষ্ট দেখিয়া জনৈক স্ত্রীলোক অতিশয় ব্যথিতা হইয়া ক্ষুধার্ত্ত দিগের জন্য এক টুক্‌রী খেজুর উপস্থিত করিয়াছিল। উহা দ্বারাই কর্ম্মিগণ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মোছলমান মাত্রেই শত্রুদিগের দুঃসাহসের কথা শুনিয়া উক্ত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। ছোট বড় লইয়া সর্ব্বসমেত তিন হাজার দরিদ্র আত্মা ইছ্‌লামের স্মৃতি রক্ষার জন্য একত্র

সমবেত হইয়াছিল। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলেও তাহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান ছিল। খন্দকের দুই কূলে তীর বর্ষণ হইতে লাগিল। এই যুদ্ধ খন্দক যুদ্ধ নামে অভিহিত। হজরত আলী, ছায়াদ বেন্ মায়াজ আরও কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ যোদ্ধা তীর বর্ষণ করিয়া শত্রুগণের অন্তঃকরণে আতঙ্ক উপস্থিত করিলেন। যে সমস্ত বীর্য্যশালী কোরায়েশ উহাদের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহারা একে একে ভূতলশায়ী হইল। প্রকৃতি ভীষণরূপ ধারণ করিয়া শত্রুদিগের আতঙ্ক শত গুণ বাড়াইয়া দিল। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বজ্র নির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। শত্রুদিগের খীমা বা বস্ত্রাবাস ভূপতিত হইল। আবুছুফিয়ান ঐশ্বরিক গজবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিল এবং তদ্দৃষ্টে অন্যান্য সৈন্যগণও তাহার অনুসরণ করিল। বনি কোরায়জা কোরায়েশদিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রত্যেক মোছলেমহৃদয়ে অসহ্য রোষানল উদ্দীপিত হইয়াছিল। হজরতের সমক্ষে মোছলেমবর্গ বিচারের জন্য উপস্থিত হইয়া ক্ষিপ্ত বনি কোরায়িজের অমানুষিকতার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জ্ঞাপনপূর্ব্বক উপযুক্ত শাস্তির জন্য প্রার্থনা করিল। তাহারা ইহাও বলিয়াছিল যে, যদি এইরূপ দুর্ব্বৃত্ত বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারীদিগকে বিশেষভাবে দমন করা না যায়, তবে ইছলামের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন। মিত্রতার ভাণ করিয়া যাহারা অদৃশ্যভাবে শত্রুদিগের সাহায্য করে এবং যাহারা ইছলামকে চিরতরে মুছিয়া ফেলিতে চায়, তাহাদিগের জন্য আদর্শ শাস্তির ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত।

বনি কোরায়জা এই সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল যে, আছ্ সম্প্রদায়ের দলপতি ছায়াদ এব্‌নে মায়াজ যেরূপ শাস্তির বিধান করিবেন, উহারা তাহাই গ্রহণ করিবে। উক্ত দলপতি যুদ্ধের পূর্ব্বেই আহত হইয়া কষ্টভোগ করিতেছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, যোদ্ধৃগণকে সংহার

করা হইবে এবং অন্যান্য সকলে দাসরূপে গৃহীত করা হইবে। এই দণ্ড বিংশ শতাব্দীর পক্ষে কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন যে, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ত্রিপোলী ও বল্কান যুদ্ধে ইহা অপেক্ষা কঠিনতর শাস্তি বিহিত হইয়াছিল। যে সময়ে এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহাকে কঠিন আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত। বিচারক ইহুদীদিগের দ্বারা মনোনীত হইয়াছিলেন, অপরাধ বিশ্বাস-ঘাতকতা ও বিদ্রোহ। সভ্যতালোকোদ্ভাসিত বর্ত্তমান কালের বিচারে কোর্ট মার্শেলই ইহার একমাত্র বিধেয় দণ্ড। যাহা হউক, সমস্ত শত্রুসৈন্য নিহত করা হয় নাই। তন্মধ্যে বিশেষ অপরাধী ২০০ জন সৈন্যকে সংহার করা হইয়াছিল।

এখানে দ্রষ্টব্য যে, ক্রমওয়েলের আদেশানুসারে ড্রগহেডার আইরিশ-দিগের হত্যাকাণ্ড যদি সমীচীন হইয়া থাকে, তবে রাজ্যবিপ্লব অপরাধে ইহুদিদিগের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা কোন প্রকারে অন্যায় বলা যায় না। ইহুদিদিগের হত্যা সম্বন্ধে মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে যাঁহারা সমালোচনা করেন, তাঁহারা বিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত ব্লাডিভোষ্টকে সেনাপতি কর্ত্তৃক ৫০০০ চীনদেশীয় স্ত্রী পুরুষ ও শিশুর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কি বলিতে চান? আমেরিকার আদিমবাসগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করায় শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাদের বার কোটী লোককে হত্যা করিয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মযুদ্ধের নামে ইউরোপীয়গণ এন্টিওকে যে হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল, তাহা অতি লোমহর্ষক।

জন ডিভেন পোর্ট লিখিয়াছেন, ২০০ শত বৎসর স্থায়ী ক্রুছেড যুদ্ধে কোটী কোটী নির্দ্দোষ তুর্কী নিহত হইয়াছিল। ক্রুশধারিগণ ধর্ম্মের নামে যেরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা লিখিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। ইহার তুলনায় খন্দকযুদ্ধের ২০০ রাজ্য বিপ্লবকারীর হত্যা

অতি অকিঞ্চিৎকর। পরিখার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন কোরেশগণ ১০০০০ দেরহামের বিনিময়ে নওফেল্ বিন্ আবদুল্লার শব প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আঁ। হজরত বিনা অর্থে মৃতদেহ অর্পণ করিতে আজ্ঞা করেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কোরায়েশদিগের উপর অবিচার বা নির্য্যাতন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। আত্মরক্ষাই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা ছিল। প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের চিন্তা তাঁহার উদারহৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই।

ছোল্‌হে হোদাবিয়া ৬২৮ খৃঃ। ক্রমে ক্রমে মদিনা নগরীতে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। যখন মোনাফেকিন ইহুদিগণ হতবল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সকলেরই মনে মাতৃভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। হজরতও জন্মভূমি মক্কা জেয়ারত করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। জেলকদ মাসে যুদ্ধাদি নিষিদ্ধ বলিয়া হজরত প্রায় দেড় হাজার মোছলেম মোহাজেরীন ও আনছারী সহ পবিত্রকাবা ভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পবিত্রস্থান জেয়ারৎ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং নিরস্ত্র হইয়াই তাঁহারা যাত্রা করিলেন। কোরবাণীর জন্য ৭০টী উট গৃহীত হইল। সকলেই জোল-হলিফা নামকস্থানে এহ্‌রাম বন্ধন করিলেন। মক্কাবাসিগণ এই সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইল। হজরত মক্কা হইতে নয় মাইল দূরে হোদাবিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া জানাইলেন যে, তাঁহারা কেবলমাত্র জেয়ারতের অভিলাষী, যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক বা প্রস্তুত নহেন। মক্কাবাসিগণ মোছলেম-দিগের উপর প্রথমতঃ বিশেষ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। এমন কি, হজরতের উপরও তীর নিক্ষেপ করিতে বিরত হয় নাই, কিন্তু হজরত অম্লানবদনে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন এবং মোছলেমদিগকে প্রতিশোধ লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রইছগণ মক্কার সীমার মধ্যে মোছলেমগণকে

প্রবেশ করিতে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ ছিল। কিন্তু হজরতের বিশেষ অনুরোধ ক্রমে তাহারা অবশেষে সন্ধি করিতে এবং মোছলেমদিগকে কাবা জেয়ারত করিবার অনুমতি দিতে স্বীকার করিল। হজরত আলী সন্ধিপত্র লিখিতে আদিষ্ট হইলেন। প্রথমে "বিছ্‌মিল্লা হের রাহ্‌মা নের রাহিম" লিখিতে কোরায়েশগণ আপত্তি করিল। তাহারা বলিল, কে 'রহমান' আমরা জানি না, 'রহমান' লিখিতে পারিবেন না। তখন উহাদের প্রস্তাব মতে "বে এছ্‌মেকা আল্লাহোম্মা" লিখিতে আঁ হজরত আদেশ দিলেন এবং ঐরূপই লেখা গেল। তৎপর "মোহাম্মদ রছুলুল্লার পক্ষ হইতে" এইরূপ লিখিলেন। ইহাতেও কোরায়েশ পক্ষ হইতে আপত্তি হইল। তাহারা বলিল, আপনি যে রছুল তাহা আমরা মানিতে প্রস্তুত নহি। যদি ইহাই মানিতাম, তবে আপনাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতাম না। ইহা শুনিয়া হজরত আলী বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, "এই বিশেষণ পদ আমি কখনও খণ্ডন করিব না। আমাদ্বারা 'রছুল' এই পদ কর্ত্তিত হওয়া আমার পক্ষে গুরুতর অপরাধ।" তখন আঁ হজরত স্বয়ং রছুল শব্দ কাটিয়া দিলেন। যাহা হউক, সন্ধিপত্র লিখিত হইল এবং আঁ হজরত স্বাক্ষর করিলেন।

যে সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল তাহার সর্ত্ত এই :—

১। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ কাহারও উপর অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না।

২। যদি কোন কোরায়েশ সর্দ্দারের অনুমতি ব্যতীত মোহাম্মদের নিকট চলিয়া যায়, তবে উহাকে কোরায়েশদিগের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

৩। যদি মোছলেমদিগের পক্ষ হইতে কেহ কোরায়েশদিগের নিকট চলিয়া যায়, তবে তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না।

৪। আরবের যে কোন কবিলা অন্য কোন কবিলার সহিত যথেচ্ছ মিলিতে মিশিতে পারিবে, তাহাতে কোন বাধা হইবে না।

৫। এখান হইতে মোছলেমগণ এই বৎসরের জন্য মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং পরবর্ত্তী বৎসর কেবলমাত্র ৩ দিনের জন্য পবিত্র গৃহ তওয়াফ করিবার জন্য নিরস্ত্রভাবে আসিতে পারিবে। তাহারা কটিবদ্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র আনিতে পারিবে না।

প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধিদ্বারা আঁ হজরত সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কোন প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। কেবলমাত্র তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য কাবাদর্শন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। ইহার দ্বারা তিনি কোরায়েশবংশীয় মুখ্যতন্ত্রকে তাঁহার সহিত সমান সমান ভাবে সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা মক্কা হইতে দেশান্তরগত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রবল প্রতাপান্বিত দারুন্নদোয়া (শাসনতান্ত্রিক সমিতি) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। হোদায়বিয়ায় সন্ধি স্থাপিত হইলে হজরত আবুবকর বলিয়াছিলেন "আমাদের বুদ্ধি এ বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহার গূঢ় কৌশল আল্লা ও তাঁহার রছুলই জানেন, ক্ষুদ্র মন ব্যস্ত হয় কিন্তু আল্লা ব্যস্ত হন না।"

অধুনা হজরত ইছলাম বিস্তৃতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। সমস্ত পৃথিবীতে সত্যপ্রচার করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। তাঁহার মিশন (প্রচার কার্য্য) কেবল বনি ইস্রাইল ও বনি ইছমাইল মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদিগের ন্যায় মুষ্টিমেয় শিষ্যের জন্য মনোনীত হন নাই। হজরত মুছা (আঃ) কেবল বনি ইস্রাইলের বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সত্যবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। হজরত ইছা (আঃ) 'বনি ইস্রাইলের' ভ্রান্ত 'শাবক'কে সত্যপথে আনিবার জন্য যত্নবান ছিলেন কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সত্যবাদ জ্ঞাপন

করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে হেজরতের ষষ্ঠ বৎসরে কয়েকজন বিখ্যাত নরপতির নিকট ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য কাছেদ (দূত) সহ ফরমান পাঠাইলেন এবং উহাদিগকে দীন ইছলামের প্রতি আহ্বান করিলেন। উক্ত শাহান-শাহ্‌দিগের মধ্যে কতিপয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) শাহেনশাহ কস্তুনিয়া (হেরকল), (২) শাহে ইরাণ (কেছরা খছরু পরভেজ), (৩) শাহে আবিসিনিয়া (নজ্জাশী), (৪) শাহে বনি গচ্ছাম, (৫) নেজদ প্রদেশের হাকিম ছামামা, (৬) কায়ছারের অধীন শ্যামের গবর্ণর ফরদা, বিন্ ওমরে খজাই (ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কায়ছারের আজ্ঞার বিরুদ্ধে ধন সম্পদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিয়া ইছলাম গ্রহণ করেন), (৭) দওমতল জন্দলের হাকিম, (৮) জিলকেলা হামইয়ারী (ইমেন ও তায়েফের জবরদস্ত বাদসাহ, যিনি আপনাকে খোদা মনে করিয়া রায়েতগণকে ছেজদা করিতে বাধ্য করিতেন। ইছলাম গ্রহণের পর ইনি ১৮০০০ গোলাম মুক্ত করিয়াছিলেন ও মদিনায় আসিয়া সাধুজীবন যাপন করিয়াছিলেন) এবং (৯) এস্‌কেন্দ্রিয়ার অধিপতি মকৃউকস্।

দূর দূরান্তে ইছলাম প্রচারার্থ ফরমান প্রেরণ

ইছলাম গ্রহণের জন্য আঁ হজরত বাদশাদিগের নিকট বিশিষ্ট আহ্বান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র ইছলামের পক্ষ হইতে সাধারণ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা আঁ হজরতের দরবারে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কওমের মধ্যে ইছলাম বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রত্যেকের নিকট নিম্নের অনুরূপ এক একটি ফরমান প্রেরিত হইয়াছিল। উহাতে বাক্ চতুরতা ছিল না। সরলভাষায় সরলকথায়, সংক্ষেপে সত্যের প্রতি তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল।

খোদায়ে রহিম ও রহমানের নামে আরম্ভ।

খোদাতায়ালার বান্দা ও রছুল মোহম্মদের (দঃ) পক্ষ হইতে রুমের বাদ্‌শাহ হেরকলের প্রতি—

"যে সত্যের পথ অনুসরণ করে, তাঁহার প্রতি ছালাম বাদ, আমি আপনাকে ইছলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেছি। ইছলাম গ্রহণ করিলে ভবিষ্যৎ গজব হইতে রক্ষা পাইবেন। এবং খোদা আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করিবেন। আর যদি আপনি অস্বীকার করেন, তবে আপনার নির্দোষ প্রজাদিগের পাপ আপনারই উপর বর্ত্তিবে। হে আহ্‌লে কেতাব (যে সম্প্রদায়ের নিকট ইতঃপূর্ব্বে ঐশীপুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল), একই সত্য স্বীকার করুন, যে সত্যে আপনি ও আমি সমান অংশীদার। আল্লাহ-তায়ালা ব্যতীত আমি আর কাহারও পূজা করিব না এবং কাহারও সহিত আল্লাহতায়ালাকে শরিক করিব না।"

এই ফরমান পাইয়া হেরকল বলিলেন, আরবের অনেক লোক এখানে তেজারত করিতে আসে। যদি কেহ উপস্থিত থাকে, তবে আমার সমক্ষে উপস্থিত কর। ঘটনাক্রমে আবু ছুফিয়ান তেজারতের জন্য ঐস্থানে উপস্থিত ছিল। বাদ্‌শাহ আবু ছুফিয়ানকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং উহার উপস্থিত বন্ধু বান্ধবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন "যদি আবু ছুফিয়ান সত্য গোপন করে, তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ উহা প্রকাশ করিবে।"

১মঃ প্রঃ—মোহাম্মদ কিরূপ বংশজাত ?

১মঃ উঃ—মাতৃপিতৃকুল উভয়ই অতি সম্ভ্রান্ত।

২য়ঃ প্রঃ—ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কওমের আর কেহ নবুয়তের দাবী করিয়াছিল কিনা ?

২য়ঃ উঃ—করে নাই।

৩য়: প্রঃ—তাঁহার পিতা প্রপিতামহদিগের মধ্যে কেহ বাদশাহ হইয়াছে কিনা?

৩য়: উঃ—না।

৪র্থঃ প্রঃ—কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁহার তাবেদারী (অনুগমন) করে, আমির কি গরীব?

৪র্থঃ উঃ—গরীব ও মিছকিন।

৫মঃ প্রঃ—তাঁহার জমায়ত (দল) ক্রমে বাড়িতেছে না কমিতেছে?

৫মঃ উঃ—ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

৬ষ্টঃ প্রঃ—কোন লোক ইছলাম গ্রহণ করিয়া পুনঃ পশ্চাদ্গামী হইয়াছে কিনা?

৬ষ্টঃ উঃ—মহাম্মদের দীনকে কেহ মন্দ মনে করিয়া পশ্চাদ্গামী হয় নাই।

৭মঃ প্রঃ—নবুয়ত দাবী করিবার পূর্ব্বে তুমি তাঁহাকে কখনও মিথ্যা বলিতে শুনিয়াছ কি না?

৭মঃ উঃ—কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। বলিতে শুনি নাই।

৮ম প্রঃ—কখনও ওয়াদা খেলাফী (প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ) করিয়াছেন কিনা?

৮ম উঃ—তিনি কথা সর্ব্বদাই পালন করেন।

৯ম প্রঃ—কখনও তোমার ও তাঁহার মধ্যে লড়াই (যুদ্ধ) হইয়াছে কিনা?

৯ম উঃ—কয়েকবার হইয়াছে।

১০ম প্রঃ—কে জয়ী হইয়াছে?

১০ম উঃ—কখনও তিনি কখনও আমি।

১১শ প্রঃ—লড়াইতে কখনও প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন কিনা?

১১শ উঃ—এ পর্য্যন্ত করেন নাই, তবে দেখা যাক্ ভবিষ্যতে করেন কিনা।

১২শ প্রঃ—তিনি কি বাণী প্রচার করেন ?

১২শ উঃ—তিনি বলেন—এক আল্লাকে পূজা কর, পৈত্রিক কলুষিত রীতি পরিত্যাগ কর, নামাজ পড়, জাকাত দাও, সৎ কাজ কর।

বাদশাহ আবু ছুফিয়ানের উত্তর শুনিয়া বলিলেন, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, মোহাম্মদ সদ্বংশসম্ভূত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা সদ্বংশজাত লোককে রেছালত প্রদান করেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, তাঁহার পূর্ব্বে ঐ বংশের আর কেহ নবুয়ত দাবী করেন নাই—ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নবুয়তের দাবী করেন নাই। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন না। এইরূপ হইলে মনে করা যাইত যে, তিনি নবুয়তের আবরণে বাদশাহী দাবী করিবেন। ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, গরীব লোকই অধিক পরিমাণে তাঁহার অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌তায়ালার ছুন্নত (রীতি) এই যে, নবীদিগের তাবেইন্ (অনুসরণকারী) অধিকাংশই গরীব লোক হইয়া থাকেন। ৫ম প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, তাঁহার অনুগামী লোক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। খোদাতায়ালা নবীদিগের জমায়াত ক্রমশঃ বাড়াইয়া থাকেন। ৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ, তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কেহ পশ্চাৎপদ হয় নাই। সত্যের এই রীতি যে, সত্যাবলম্বী সত্য হইতে বিমুখ হয় না। সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, নবুয়তের পূর্ব্বে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। যে ব্যক্তি মানুষের সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, তিনি আল্লাতায়ালা সম্বন্ধে কিরূপে মিথ্যাকথা বলিবেন ? অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, তিনি কখনও কথা লঙ্ঘন

করেন নাই। খোদার নবী কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না। তুমি নবম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছ যে, যুদ্ধে কখনও তিনি কখনও তুমি জয়লাভ করিয়াছ, প্রকৃতই আম্বিয়াগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণ কখনও জয়ী কখনও পরাজিত হয়, কিন্তু অবশেষে সত্যেরই জয় হইয়া থাকে। একাদশ প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ যে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই, নিশ্চয়ই নবীগণ কখনও প্রবঞ্চনা বা বাক্য লঙ্ঘন করেন না। তুমি দ্বাদশ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছ যে, তিনি সৎকাজের জন্য উপদেশ দেন এবং অসৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন। তুমি যাহা বলিয়াছ সবই সত্য। নিশ্চয়ই ইনি পয়গম্বর। ইঁহারই আগমন সম্বন্ধে হজরত মছীহ্‌ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। অতঃপর বলিলেন, রাজ্যের শাসনভার হেতু আমি এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, অন্যথা তাঁহার পদচুম্বন করিতে স্বয়ং উপস্থিত হইতাম।

আফ্রিকাধিপতি নজ্জাশীর নিকট ফরমান উপস্থিত করিলে তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে ভূতলে উপবিষ্ট হন: লিপি সসম্ভ্রমে মস্তকে স্থাপন করিয়া তাহা সভায় পাঠ করিবার জন্য জনৈক পরিষদের হস্তে সমর্পণ করেন।

পত্র পাঠ হইলে নজ্জাশী যথারীতি আফ্রিকা-প্রবাসী জাফরের নিকট ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

হাতেব এস্কেন্দরিয়া নগরের অধিপতি মকৃউকসের নিকট আঁ হজরতের ফরমান অর্পণ করেন। মকৃউকস পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন ও হাতেবকে নির্জ্জনে হজরতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তৎপর আঁ-হজরতকে তিনি ইছলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

শাহে বনি গচ্ছানের প্রতি যে ফরমান প্রেরিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি

তিনি নেহায়েৎ অবজ্ঞা প্রদর্শন করত কাছেদকে কাতল (হত্যা) করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় মোছলেমগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে ছিরিয়া ও রুম মোছলমান কর্ত্তৃক ফতেহ্‌ হইয়াছিল। ইরাণের বাদ্‌শাহ ফরমান পাঠ করিয়াই ক্রোধ পরবশ হইয়া উহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিলেন। হজরত এই সংবাদ পাইয়া বলিয়াছিলেন "সত্যতার সংবাদ যে অবমাননা করিয়াছে, তাহার রাজত্ব অচিরে টুক্‌রা টুক্‌রা হইবে"। প্রকৃতই পারস্য রাজ্য কিয়ৎকাল পরে বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ইহুদিগণ পূর্ব্ব হইতেই মোছলমানদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিতে-ছিল। বনি কোরায়জা ও তাহার অনুসরণকারিগণ যখন মোছলেমদিগের হস্তে পরাজিত হইল তখন ইহুদিদিগের শত্রুতা আরও বাড়িয়া উঠিল। মদিনা নগরীর কয়েক মঞ্জেল দূরে 'খায়বর' নামক স্থানে ইহুদিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। তাহারা বনি কোরায়জা ও বনি নজিরের পরাভব সংবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া ইহুদিদিগকে আহ্বান করিয়া মোছলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল। ইহাতে কেবল ইহুদিগণ নহে, আরবের কোন কোন কবিলাও যোগদান করিয়াছিল। তন্মধ্যে বনি গোত্‌ফানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খায়বরের ইহুদিদিগের আটটী সুদৃঢ় কেল্লা ছিল। তন্মধ্যে আল কুমুছ এক প্রকার অভেদ্য ছিল। আঁ হজরত এই সংবাদ পাইবামাত্র ১৪০০ শিষ্য সহ যুদ্ধের জন্য মদিনা হইতে মহরমমাসে খায়বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরবের অন্যান্য কবিলা সমবেত না হইতেই তাঁহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেল্লা আক্রমণ করিলেন।

খায়বরের যুদ্ধ ৬২৯ খৃঃ

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। মোছলেম-গণ মহাবীর হজরত আলীর নেতৃত্বে একে একে সমস্ত কেল্লা দখল করিলেন। অবশেষে আল্‌ কুমুছও তাঁহাদের হস্তগত হইল। খায়বারের অধিপতি নেস্ত নাবুদ হইয়া অতি দীনতায়

সহিত হজরতের সমক্ষে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। হজরত তাঁহার স্বাভাবিক দয়া বলে তৎক্ষণাৎ ইহুদিদিগের স্থাবর অস্থাবর দ্রব্যাদি এই সর্ত্তে প্রত্যর্পণ করিলেন যে, ইহারা ভবিষ্যতে মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে আর কখনও অস্ত্রধারণ করিবে না। হজরত ইহুদিদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইহুদিগণ হজরতের মদিনা পদার্পণের পর হইতেই তাঁহার প্রাণচ্ছিদ্ শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা মোছলেমদিগের ধর্ম্মকার্য্যেও বাধা দিতে ত্রুটী করে নাই। যে সমস্ত যুদ্ধে হজরতের বিরুদ্ধে মক্কাবাসিগণ সম্মুখীন হইয়াছিল, প্রতি যুদ্ধেই ইহারা কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা অপ্রকাশ্যে শত্রুদিগের সহায়তা করিয়াছিল। ধন্য ইছলাম, ধন্য ইছলামের মহানুভবতা! হজরত খায়বরের যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া গিয়া এই সমস্ত চির শত্রু ইহুদিদিগকে পূর্ণ নিস্কৃতি প্রদান করিলেন এবং তৎসহ তাহাদিগের ধর্ম্মকায্যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ বিগ্রহে এইরূপ সদয় ব্যবহার কল্পনার অতীত বলিলেও হয়। অন্য কোন আধুনিক শিক্ষিত জাতি এরূপ ভীষণ ও বিশ্বাসঘাতক শত্রুদিগকে একবার হস্তগত করিতে পারিলে বন্দী করিয়া রাখিতে বা 'মেসিন গানে' উড়াইয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। যে যুদ্ধে হজরত ইহুদিদিগকে নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা করিলেন, সেই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই জনৈক ইহুদি স্ত্রী হজরতকে নিমন্ত্রণ করিল। হজরত তাহার মনস্তুষ্টির জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া স্ত্রীলোকটী খাদ্যের সহিত জহর (বিষ) প্রদান করিয়াছিল। হজরতের সঙ্গীয় ব্যক্তি এক গ্রাস খাইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হজরত একগ্রাস লইতেই বিস্বাদ বোধ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ করেন নাই কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হইল। তদীয় ওফাতের (দেহত্যাগের) প্রাক্কালে তিনি এই

ইহুদিগণকে স্বাধীনতা প্রদান

তীব্র জহরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার ক্ষমাশীলতা! তিনি হত্যাকারিণীকে স্ত্রীলোক মনে করিয়া তাহার উপর কোন শাস্তির বিধান করেন নাই, বরং তাহাকে স্বীয় কবিলার মধ্যে থাকিয়া যথেচ্ছভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই, যিনি জীবন সংহারক শত্রুদিগের সহিত এইরূপ অভাবনীয় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং যাহাদিগের প্রতি দয়াশীলতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে শোণিতপিপাসু আখ্যা প্রদান করিয়াছে। যিনি আত্মরক্ষা ও সহচর রক্ষার্থ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বিরুদ্ধবাদিগণ আজ তাঁহার উপর অসির সাহায্যে ধর্ম্ম বিস্তার করিবার মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতেছে। জগতের ইতিহাস তাঁহার ন্যায় ক্ষমাশীলতার পরিচয় এযাবৎ দিতে সমর্থ হয় নাই। ভবিষ্যতেও যে কখনও এরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইবে, সে আশাও অচিন্ত্য।

নিম্নে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে, যাহাতে হজরতের মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে। যে আবুছুফিয়ান (১) কোরায়েশ সৈন্যদিগের অধিনায়ক ছিল, যে আবু ছুফিয়ান হজরতের প্রাণ বিনাশের

---

(১) আবুছুফিয়ান মক্কার সম্ভ্রান্ত কোরায়েশ বংশের নেতা ছিলেন। ইনি আঁ হজরত হইতে কয়েক বৎসরের বড় এবং জনৈক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ইনি আঁ হজরতের প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইঁহার অত্যাচার হেতু ইঁহার কন্যা উম্মে হাবিবা তাঁহার স্বামী (আঁ হজরতের জনৈক শিষ্য সহ) আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করিয়াছিল। ইঁহারই প্ররোচনায় বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বদর যুদ্ধের পর ইনি মক্কাবাসীদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ইনি কোন কার্য্যের সম্মুখীন হইতেন না। হজরত আবুবকর ইঁহাকে নাজরাণ ও হেজাজের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইনি ৮৮ বৎসর বয়সে ৬৫২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

জন্য শত শত চেষ্টা করিয়াছিল, যে আবু ছুফিয়ান ইছলামের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, সেই চির-শত্রু আবু ছুফিয়ানের কন্যা আবিসিনিয়াতে বৈধব্যদশায় পতিত হইয়া মদিনা নগরীতে আসিয়া হজরতের কৃপা ভিক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইল, এবং মদিনায় পৌঁছিয়া বিবি ছাওদার ন্যায় সে হজরতের দাসীত্ব গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। হজরত মনে করিলেন যে, তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে তাহার চিরশত্রু আবু ছুফিয়ানের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইবে। সুতরাং বিনা সঙ্কোচে তিনি আবু-ছুফিয়ানের কন্যাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্ব্ব স্বামীর পক্ষ হইতে 'হাবিবা' নাম্নী একটী কন্যা ছিল। সেই জন্য তিনি 'ওম্মে হাবিবা' নামে অভিহিতা হইতেন। ইনি অন্যান্য স্ত্রীর ন্যায় পরিণত বয়স্কা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বিবেচ্য যে, এই সমস্ত বিবাহে হজরতের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। তিনি ভোগলিপ্সার জন্য কথনও এই সমস্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কেবল নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দেওয়াই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁহার উপর বহু বিবাহের দোষারূপ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এই সমস্ত বিবাহ হজরত পরিণত বয়সে করিয়াছিলেন। তাঁহার যৌবন কালে কেবল মাত্র বিবি খোদেজার সহিত পরিণয় হইয়াছিল। এই বিবাহেও স্ত্রী পক্ষ হইতে যত্ন ও আগ্রহ ছিল। তিনি কেবলমাত্র বিবি খোদেজার ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্যই বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি সাংসারিক সুখ সম্ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্ম পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বিবি খোদেজার ধনরক্ষক ছিলেন,

পরম শত্রু আবুছুফিয়ানের কন্যার পাণিগ্রহণ

তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া তিনি কখনও গৌরব করিতেন না। বরং তাঁহার পরিচারক বলিয়া তিনি নিজকে সম্মানিত মনে করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কেবল বিবি আয়েষাই সহধর্ম্মিনীর ন্যায় ঘর কন্নার কাজ করিতেন। ছাওদা ও উম্মে হাবিবা দাসীত্ব গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে দাসীত্বে না রাখিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া তিনি তাহাদিগকে গৌরবান্বিতা করিয়াছিলেন, ইহা কেবল তাঁহার মহত্বও উদারতারই পরিচায়ক।

আঁ হজরতের মক্কা অভিমুখে যাত্রা ও ওমরা ব্রত পালনঃ—ছোল্‌হে হোদায়বিয়ার পর একবৎসর অতিবাহিত হইল। হেজরতের অষ্টমবর্ষে হজরত পুনরায় পবিত্র কাবা ভূমি 'তওয়াফ' করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দ্বাদশ সহস্র মোছ্‌লেম অতি আনন্দের সহিত মক্কা যাত্রা করিল. যিনি আট বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত নিরাশ্রয় ও দীনহীনের ন্যায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন. আজ তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের ন্যায় মহা সমারোহে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আঁ হজরত পবিত্র মক্কাভূমিতে উপস্থিত হইয়া যে সমস্ত রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল। তাঁহারই দৃষ্টান্ত এখনও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অনুসরণ করে।

তিনি অজু অন্তে মাথার চুল ফেলিলেন এবং তৎপর কাবামুখে রওয়ানা হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া "ছঙ্গে আছ্‌ ওয়াদ্‌" চুম্বন করিলেন এবং কাবাগৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন, তৎপর ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে 'ছফা' পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন ও কাবার দিকে ফিরিয়া এইরূপ মোনাজাত করিলেন :—

"আয় খোদাওন্দ! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তুমি ব্যতীত আর কেহ পূজার যোগ্য নাই। তোমার কোন শরিক নাই। তুমি সমস্ত ক্ষমতাও মহত্বের

অধীশ্বর। তোমার পবিত্র নামের জয় হোক।" ছফা পরিত্যাগ করিয়া তিনি মারওয়াতে উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানেও ঐরূপ মোনাজাত করিলেন। তৎপর তিনি অন্যান্য পবিত্র স্থানে হাজরি দিলেন। সর্ব্বশেষে তাঁহার বয়সের হিসাবে ৬৩টী উট উৎসর্গ করিলেন ও ৬৩টী গোলাম মুক্ত করিলেন।

কাবা জেয়ারতের পর মোছলমানগণ মক্কা নগরীতে অবস্থিতি করিয়া মক্কা বাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মক্কাবাসিগণ ছোল্‌হেনামার সর্ত্তানুসারে মোহলার দিগকে ৩ দিন অবস্থানের পর মক্কার সীমা পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিল। হজরত ইতস্তঃ না করিয়া তিন দিন পরেই মক্কার বাহিরে তাঁবু স্থাপন করিলেন। যদি ও তাঁহার সহিত বহু সংখ্যক সৈন্য ছিল, তবুও তিনি মক্কা আক্রমণ করিবার কোন উদ্যোগ না করিয়া অঙ্গীকৃত সর্ত্তানুসারে তিন দিবসান্তে মক্কার সীমার বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইহাতে মক্কাবাসিগণ বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল এবং হজরতের ব্যবহারে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ফোয়ারা ছুটিল। এমন কি পূর্ব্বশত্রু কুল তিলক খালেদ্ বিন্ অলিদ হজরতের ব্যবহারে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া ইছলাম গ্রহণ করিল এবং অন্যান্য আর ও অনেক মক্কাবাসী তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

খালেদ্ বিণ্ অলিদের ইছলাম গ্রহণ

এই সময়ে খালেদ্ বিণ্ অলিদের সম্পর্কিতা একটী বৃদ্ধা স্ত্রী হজরতের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হইল। ইহার নাম মায়মুনা। শত্রুদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করাই এই বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে হজরতের একজন প্রৌঢ়া ও তিনজন পরিণত বয়স্কা মোট চারিজন স্ত্রী ছিলেন।

যে দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক ছিল। যে দেশে বহু বিবাহ একমাত্র রীতি ছিল, সেই দেশে ৩জন বৃদ্ধা ও একজন প্রৌঢ়া স্ত্রী বিবাহ

করিয়া হজরত আত্মসংযমের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? প্রকৃত পক্ষে হজরত আয়েষাই তাঁহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মোছলেমগণ বহু বিবাহ অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইবে, এই আশঙ্কায় হজরত এক কালে চারিটী বিবাহের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, দাসী হইলেও তিনি অন্যান্য ৩জন স্ত্রীকে সমচক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদিগকেও হজরত আয়েষার ন্যায় স্থান দান করিতেন। ইহা অপেক্ষা মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করা অসাধ্য। অধুনা যে সমস্ত শিক্ষিত জাতির মধ্যে এক বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানেও ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, মোছলেম জগতে চারি বিবাহের আদেশ থাকায় বহুবিধ অবৈধ অত্যাচার সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

বহু বিবাহ। স্বামী ও স্ত্রীতে প্রকৃত সখ্য স্থাপিত হইয়াছে। যথেচ্ছ স্ত্রী পরিত্যাগের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়াছে। যে মহাজ্ঞানীর আদেশে এই সুফল প্রসূত হইয়াছে, তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ!

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইছলাম আদিষ্ট বহুবিবাহ সম্বন্ধে নানাপ্রকার তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইছলাম বেশ্যাবৃত্তি, ভ্রূণহত্যা, জারজ সন্তানোৎপত্তি হইতে মোছলেমকে রক্ষা করিয়াছে। প্রত্যেক স্ত্রী ও প্রত্যেক সন্তানের জন্য সম্পত্তির অংশ নির্দ্দেশ করিয়া ইছলাম উদারতার যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহা ইঁহারা ভুলিয়া যান। আজকাল সভ্য জগতে যে সকল অবৈধ হত্যা প্রতিদিন সংঘটিত হইতেছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে ইঁহারা নারাজ; রোম সম্রাট ভেলেন্টিয়ান ফরাসীরাজ ক্লোটেয়ার, জার্ম্মাণ রাজাধিরাজ সার্লেমান প্রভৃতি সকলেই বহুবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচারক প্রাচীন 'প্রিষ্ট' ও 'ফাদারগণ' বহু বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত কবি মিল্টন ইহার সমর্থন করিয়াছেন। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে কিংবা তাহার শারীরিক ও মানসিক

বিকার ঘটিলেও একাধিক বিবাহ অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইছলাম অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিবাহের অনুমতি দেয় নাই।

নিরাশ্রয়া ও প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য করিবার মানসেই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যায়ক্রমে নয় জন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে যাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা এবং যাঁহাকে যেরূপ ভাবে রাখা উচিত, তিনি তদনুরূপ কার্য্য ও ব্যবহারাদি করিতেন। জন সাধারণ বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রতি বিহিত যত্ন, সমাদর ও ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হইবে না। সেই জন্য কোর্‌আন শরিফে ছুরা "নেছায়" আদেশ হইয়াছে, কেহ এক কালে চারিটার অধিক বিবাহিত স্ত্রী রাখিতে পারিবে না। ঐ আদেশ দ্বারা জনসাধারণকে চারিটী পর্য্যন্ত বিবাহিতা স্ত্রী রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইলেও উহার ঠিক পরবর্ত্তী প্রবচন দ্বারা এইরূপ নিষেধাজ্ঞা হইয়াছে, "কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের প্রতি বিচার করিয়া সমান ব্যবহার করিতে না পার, তাহা হইলে একটী মাত্র স্ত্রীই বিবাহ করিও"। এই প্রবচন দ্বারা কোরআন্ শরিফে বিবাহ সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিয়া কোন মোছলেম কোরআনের আদেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে, একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলের সহিত সমান সদ্ভাব রাখা ও প্রীতি প্রদর্শন করা দুষ্কর।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে কত দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, কত দেশ পুরুষ শূন্য হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে অসহায়া অবলা স্ত্রীলোকের কষ্টের পরিসীমা নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে একাধিক পত্নী রাখিবার ব্যবস্থা থাকিলে অনেক অভাগিনী রমণীর কষ্ট ভার লাঘব হইত, অনেক অনাথ বালক বালিকা মাতার সহিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের অধিকারী হইত। অনেক পণ্ডিত খৃষ্টান স্ত্রী মোছলেম শাস্ত্রের একাধিক বিবাহের ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া

মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। বাইবেল স্ত্রীর সংখ্যা সম্বন্ধে কোন সীমা নির্দ্দেশ করে নাই। কেবল মাত্র কথিত আছে যে, বিশপ বা পাদ্রীর পক্ষে মাত্র এক বিবাহই বিধেয়। চিন্তা করিলে পাঠক সহজেই বুঝিবেন যে, বাইবেল অপেক্ষা কোরআনের আদেশ বিশেষ স্পষ্ট।

বর্ত্তমান সভ্য জগৎ বহু বিবাহ উপলক্ষে ইছলামের উপর দোষারোপ করে। এই সম্বন্ধে মিসেস্ আনি বেশান্ত কি বলিতেছেন,পাঠকবর্গ শুনুন,—"কোন কোন দেশে একটী স্ত্রীর সহিত একটা পুরুষের সম্বন্ধই আদর্শ বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু কোন দেশে এই আদর্শ সাধারণতঃ কার্য্যে পরিণত হয় না। ইছলাম বহু বিবাহের অনুমতি দেয়। খৃষ্ট ধর্ম্ম ইহা নিষেধ করিলেও মানে না। কেবল একাধিক স্ত্রীর সহিত আইনানুমোদিত বন্ধন না ঘটে, ইহাই দেখে। পাশ্চাত্য দেশে এক বিবাহের ভাণ মাত্র আছে; কিন্তু দায়ীত্বহীন বহু বিবাহ বর্ত্তমান। কোন ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং স্ত্রীলোকটী রাস্তার মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। তাহার অবস্থা বহু বিবাহিত পরিবারের আশ্রিত স্ত্রীলোক অপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য নগরের গলিতে রাত্রিকালে সহস্র সহস্র নিরাশ্রিতা স্ত্রীলোক দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমস্ত দেখিলে ইছলামের বহু বিবাহকে অপবাদ দেওয়া যায় না। বহুবিবাহিত মোছলেম পরিবারের স্ত্রীলোকগণ অনেকাংশে সুখিনী ও শ্রদ্ধেয়। যেহেতু স্ত্রীলোকগণ কেবল এক ব্যক্তির সহিত আবদ্ধা এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ সকল অধিকারে অধিকারী এবং সকলের নিকট সম্মানিত। কিন্তু রাস্তার নিরাশ্রিতা স্ত্রীলোকগুলি প্রতি রাত্রি যে কোন ব্যক্তি দ্বারা প্রলুব্ধ হইতে পারে। তাহাদের অবস্থা অতি ঘৃণ্য এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি আইনানুমোদিত অধিকারের বহির্ভূত।"

ইছলামে স্ত্রীজাতির অধিকার:—বিরুদ্ধবাদিগণ

ইছলামের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিতে চান, ইছলাম স্ত্রীজাতিকে কোনও অধিকার দেয় নাই। তাহারা হেরমের মধ্যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদাসী হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠা নহে। প্রকৃত পক্ষে ইছ্‌লাম মোছলেম স্ত্রীকে যেরূপ অধিকার দিয়াছে, কোন ধর্ম্মই তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম নহে। মোছলেম স্ত্রী তাহার স্বীয় সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা ও ভোগ করিতে সমর্থা। মোছলেম আইন স্ত্রী জাতিকে ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছে। মোছলেম স্ত্রী মৃত স্বামী, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রের ধন অধিকার করিতে সমর্থা। পুরুষ যেমন ত্যক্ত ধনের অধিকারী, স্ত্রীও তদ্রূপ। মোছলেম স্ত্রী স্বীয় সম্পত্তি দ্বারা নূতন অধিকার ও বাধ্যতা সৃষ্টি করিতে সমর্থা, স্বামী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীর জন্য এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকেন যে, তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত যৌতুক দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং তাঁহার সহিত বিবাহের সময় যে সমস্ত সর্ত্ত লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহার কোনটী ভঙ্গ হইলে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। স্ত্রী ইচ্ছা করিলে একাধিক বিবাহের নিষেধ সর্ত্ত মধ্যে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। ইছলাম মোছলেম রমণীকে আদর্শ স্ত্রীত্ব প্রদান করিয়াছে। স্বামীর নিকট স্ত্রী অন্য ধর্ম্মের ন্যায় দাসী ভাবে আবদ্ধা নহেন।

মহব্বত ও সহৃদয়তা মোছলেম বিবাহের মূলমন্ত্র। বাইবেল শিক্ষা দেয়, "তোমার আকাঙ্ক্ষা তোমার স্বামীর আকাঙ্ক্ষানুসারে গঠিত হইবে এবং তিনি তোমার উপর প্রভুত্ব করিবেন।" কোর্‌আন্ বাণী ইহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্লাঘ্য। ইহুদি ও খৃষ্টান স্ত্রীজাতির নৈতিক ও সামাজিক জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে তওরাত ও ইঞ্জিলে কোন উল্লেখ নাই। কোর্‌আন্‌ই স্ত্রীলোকদিগকে প্রকৃত স্বাধীনতা দান করিয়াছে। মোছলেম স্ত্রী, মোছলেম পুরুষের সমান অধিকার পাইতে সমর্থা। আধ্যাত্মিক উন্নতির

জন্য তাঁহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। স্ত্রীলোকের রূহ্ পুরুষের রূহ্ হইতে অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নহে। কোর্‌আন্ পাকে মোছলেম স্ত্রী ও পুরুষকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় উন্নতির জন্য সমভাবে সুযোগ দিয়াছে। কোর্‌আন্ স্ত্রীকে স্বর্গ প্রবেশের পূর্ণ অধিকার দান করিয়াছে। আঁ হজরতের কন্যা 'ফাতেমাতোজ্জোহরা' (অর্থাৎ বেহেস্তের জ্যোতি) এবং 'খাতুনে জেন্নাত' (অর্থাৎ বেহেস্তের রাণী)। তিনি পবিত্রতা, সত্যতা ও মহব্বতের অবতার ছিলেন। স্ত্রী জগতে তিনি আদর্শ রমণী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিতা ছিলেন। কোন মোছলেম পুরুষও এইরূপ সম্মানে সম্মানিত হয় নাই। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইছলাম রমণীর অধিকার ও মর্য্যাদা অতি দক্ষতার সহিত সপ্রমাণ করিয়াছেন। হাদিছ শরিফে কথিত আছে যে, 'বেহেস্ত মাতার পদতলে অবস্থিত, ইহাতে সহজেই বোধগম্য হয় যে, ইছলাম স্ত্রীজাতিকে কত সম্মানিত ও প্রশংসিত করিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম এই সম্বন্ধে ইছলামের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য। মনু স্ত্রী জাতিকে অপবিত্র প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত মনে করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "স্ত্রী জাতি দুর্ব্বলতা ও অসচ্চরিত্রার দৃষ্টান্ত; দিবারাত্র উহাদিগকে শাসনাধীন রাখা আবশ্যক।" আঁ হজরত মনু হইতে স্ত্রীজাতিকে অতি উচ্চতর স্থান দিয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যখন হজরতের ফরমান লইয়া কাছেদ বনি গচ্ছানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বনি গচ্ছান ফরমান পড়িয়া কাছেদকে সংহার করিয়াছিলেন। মোছলমানগণ এই সংবাদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। ঐ যুদ্ধে বনি গচ্ছানের পক্ষ হইতে তিন হাজার সৈন্য যাত্রা করিয়াছিল। উহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। বনি গচ্ছান কস্তন্তনিয়ার করদ রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হওয়াতে বহুলোক হতাহত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে

মোছলমানগণ বিশেষ কিছু লাভবান হন নাই। লাচার হইয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে কবিলায় বনিবকর ও কবিলায় বনিখাজা উভয়ের মধ্যে শত্রুতা চলিতে লাগিল। বনিখাজা মোছলমানদিগের এবং বনিবকর কোরায়েশদিগের সাহায্য করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে কোরায়েশগণ ছোল্‌হে হোদায়বিয়ার সর্ত্তের বিরুদ্ধে বনিবকরকে সাহায্য করিতে লাগিল, কিন্তু উক্ত ছোল্‌হে-নামার বিরুদ্ধে মোছলমানগণ বনিখাজাকে সাহায্য করিতে নারাজ ছিল। উভয় পক্ষে লড়াই আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে কোরায়েশগণ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল। উহারা হেরম শরিফের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ২০জন মোছলমানকে কতল করিয়াছিল। হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) সময় হইতে হেরম শরিফের সীমার মধ্যে রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। যখন কোরায়েশগণ এই পাকস্থানের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন মোছল-মানগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কোরায়েশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল।

হজরতের বামে দক্ষিণে পাঁচ হাজার আন্‌ছার ও মহাজের কুচ্‌ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। আবুছুফিয়ান দূর হইতে দেখিয়া ভীত হইয়া এবং হজরত আব্বাছের (রাঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া পরামর্শ চাহিল। হজরত আব্বাছ (রাঃ) বলিলেন, "তোমার দিন ছুনিয়া উভয়েরই মঙ্গলের জন্য তুমি এখনই আঁ হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া 'খোদায়ে ওয়াহেদের' উপর ইমান আন।" আবুছুফিয়ান ইহা শুনিয়া নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে আঁ হজরতের নিকট আসিতেছিল এবং দূর হইতে তাঁহার খেদমতে হাজির হইবার অনুমতি চাহিয়াছিল। হজরত তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, "কেহ আবুছুফিয়ানকে হত্যা করিবে না। উহাকে আমার নিকট নিরাপদে পৌছাইয়া দাও।" হজরত আবুছুফিয়ানের হাতে হাত দিয়া নেহায়েৎ

মহাব্বত ও সহানুভূতির সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ আবুছুফিয়ান, জাত পাক আল্লা ব্যতীত কাহারও এবাদত করা উচিত নহে। আল্লার এবাদত ছাচ্ছা এবাদত, আর উঁহারই দীন সত্য দীন। যে সমস্ত বস্তুকে তোমরা পূজা করিতেছ, উহারা তোমাদিগের কোন মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ নহে। আমি যাহা কিছু বলিতেছি তোমার মঙ্গলের জন্য।" আবুছুফিয়ান বলিল, "আয় রছুলে খোদা! আপনার রহম ও দয়ার প্রশংসাবাদ যথেষ্ট শুনিয়াছি। আপনার বিরুদ্ধে আমি যেরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার বেশ মনে আছে। উহার প্রতিদানে আপনি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমার বেশ মনে আছে। আমার অন্তঃকরণ বাস্তবিক সাক্ষ্য দিতেছে, আমি যে সমস্ত বস্তুকে পূজা করিয়াছি, উহারা পূজার যোগ্য নহে। যদি উহারা আমাকে সাহায্য করিত, তবে আমি কেন পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইব, পরাজয়ের পর পরাজয় ভোগ করিব। আমি সর্ব্ব সমক্ষে স্বেচ্ছায় বোৎপোরস্তী ছাড়িয়া খোদাপোরস্তী এখ্‌তেয়ার করিলাম।" এই সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মোছলমানগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যূষে মোছলেম লস্কর ক্রমে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হইল।

আবুছুফিয়ানের ইছলামগ্রহণ

পাহাড়ের উপর হইতে মক্কাবাসিগণ মোছলেম সৈন্যদিগের কুচ দেখিয়া ভীত হইল। সর্ব্বপ্রথমে কবিলায়ে বনু ইছলাম ধ্বজা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। উহারা নগ্ন তরবারি-হস্তে অতি বলবীর্য্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে তক্‌বির দিতে দিতে চলিল। খালেদ-বিন্‌-অলিদ মোছলেম্‌দিগের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাদের পশ্চাতে অগণিত সাধারণ ফৌজ আসিতেছিল। উহাদের হস্তের যুদ্ধাস্ত্রসমূহ সূর্য্যকিরণে চমকিত হইতেছিল। তৎপরে বনু কায়াব ও কবিলায়ে মাজ্‌লাহ ফৌজ লইয়া

বিশেষ আড়ম্বরের সহিত আসিতেছিল। তৎপরে আঁহজরত স্বয়ং উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আসিতেছিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে মহাজ্বেরীন ও আনছারীন ফৌজ চলিতেছিল। যখন মোছলেম সৈন্যগণ মক্কানগরীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আবুছুফিয়ান আঁ হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি দ্রুতবেগে সর্ব্বাগ্রে নগরে উপস্থিত হই এবং কোরায়েশদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করি।" হজরতের অনুমতি লইয়া আবুছুফিয়ান মক্কাবাসিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আয় ভাই সকল! আমি মোছলমান হইয়াছি। আমি অসত্য ধর্ম্ম হইতে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা তোমরা অবগত আছ। এখন তোমাদের পক্ষে মঙ্গল এই যে, তোমরা বোৎপোরস্তী ছাড়িয়া এক খোদাপোরস্তী গ্রহণ কর। যেরূপ ধুমধাম ও শৌর্য্য-বীর্য্যের সহিত মোছলেম লস্কর অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের সম্মুখীন হইবার কাহারও সাধ্য নাই। উহাদের সম্মুখীন হইলে নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত হইবে। নগরীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। তোমরা আমার সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছ ; কিন্তু কোন এক অসাধারণ বস্তু আমার কঠিন অন্তঃকরণ দ্রবীভূত করিয়াছে। তাই বলিতেছি, তোমরা যুদ্ধ হইতে বিরত হও। আমার অনুগমন করা বা না করা সম্পূর্ণ তোমাদের ইচ্ছাধীন।" আবুছুফিয়ান এই কথা বলিবা মাত্রই তাঁহার স্ত্রী সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে এবং সর্ব্বসমক্ষে অসম্মান করে এবং তাঁহাকে মারিবার জন্য লোকদিগকে আহ্বান করে। ইতঃমধ্যে লস্করগণ আসিয়া পৌছিল, মক্কাবাসিগণ নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু আকৃরমা-এব্‌নে-আবুজেহেল কতিপয় বন্ধুবান্ধবসহ মোছলেম সিপাহীদের উপর আক্রমণ করিয়া তুইজন মোছলমানকে সহিদ (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত) করিয়াছিল। খালেদ্‌-এব্‌নে-অলিদ নম্রতার সহিত উহাদিগকে বলিয়া-

ছিলেন, "কেন বৃথা মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ; হজরতের হুকুম হইলে তোমরা মোছলেম সৈন্য দ্বারা ভূতলশায়ী হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে ২৮জন কোরায়েশ নিহত হইল। শত্রুগণ মোছলেমদিগের অপ্রতিহত বল দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইল। হজরত উষ্ট্রারোহণে খানায় কাবা তওয়াফ করিলেন এবং তৎপরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমূর্ত্তিগুলি যষ্টি দ্বারা নিপাত করিলেন। তিনি প্রত্যেক মূর্ত্তি পতনের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "সত্য আসিয়াছে, অসত্য চলিয়া গিয়াছে।" খানায় কাবার দেওয়ালের উপর যে সমস্ত ছবি ছিল, সে গুলিও দূর করত প্রাচীর জল দ্বারা ধৌত করিলেন। এইরূপে মছজেদ্‌কে বোৎপোরস্তীর নজাছত (অপবিত্রতা) হইতে পাক করিলেন। তৎপরে সহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে প্রত্যেকে মনে করিয়াছিল যে, সহরের আর পরিত্রাণ নাই। হজরত বুঝি, সহরবাসীকে হত্যা করিবার জন্য আম (১) হুকুম দিবেন। আমরা তাঁহাকে যে সমস্ত যন্ত্রণা দিয়াছি, আজ তাহার সম্পূর্ণ প্রতিশোধ লইবেন। সহরবাসিগণ ভয়ে কাঁপিতেছিল এবং প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে হজরত সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "অদ্য যুদ্ধ চালাইবার বা প্রতিশোধ লইবার সময় নয়; এখন দয়া দাক্ষিণ্যের সময়। আমি তোমাদের নিকট শত্রুভাবে আসি নাই, প্রতিশোধ লইতেও আসি নাই। আমি তোমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিব, যেরূপ হজরত ইউছফ মিছর দেশে তাঁহার ভাইদের সঙ্গে করিয়াছিলেন। অদ্য আমি তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না; আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তিনি পরম দয়ালু।"

হজরতের অসামান্য মহানুভবতা ও তিতিক্ষা

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, আকৃরমা দুইজন নিরপরাধ মোছলমানকে সহিদ

(১) সাধারণ।

করিয়াছিল। তজ্জন্য আকৃরমাকে অভিযুক্ত করিবার হুকুম হইয়াছিল। আকৃরমা এই খবর পাইয়া মক্কার বাহিরে পলাইয়া গিয়াছিল। উহার সন্তান সন্ততি অভিভাবকহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় আকৃরমার স্ত্রী হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মুছিবতের কথা জ্ঞাপন করিল এবং অতি বিনয়ের সহিত আকরমাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। হজরত অম্লানবদনে তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার স্ত্রী স্বামীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অনেক কষ্টের পর তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে মক্কায় আনিল এবং হজরতের খেদমতে উপস্থিত করিল। হজরত তাহাকে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। আকৃরমার মাতাও তাহার পিছে পিছে আসিয়াছিল। হজরত আকৃরমার উপর এরূপ

আবুজেহেল পুত্র আকরমার ইছলাম গ্রহণ ও তাহার গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা

স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সে স্বীয় অসদ্ব্যবহারের জন্য অতিশয় লজ্জিত হইল এবং হজরতের মহানুভবতা দেখিয়া ইছলাম গ্রহণ করিল এবং হজরতের অতিশয় ভক্ত খাদেম হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, আকৃরমার পিতা আবুজেহেল হজরতের জানি দুশমন ছিল এবং হজরতের নাম ও নেশান চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান ছিল। তাহারই বৈরভাব আকৃরমার শোণিতেও অণু প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাই সে দুইটী নিরপরাধ মোছলেমের প্রাণ নিঃসঙ্কোচে বিনষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু আঁ হজরতের অপরিসীম অনুগ্রহ বলে সে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইল। ধন্য তাঁহার মহানুভবতা !

অতঃপর হারবার হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইল। যখন হজরতের কন্যা জয়নব মক্কা হইতে মদিনায় আসিতেছিলেন, তখন হারবার তাঁহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিল। জয়নব ঐ সময়ে গর্ভাবস্থায় ছিলেন এবং

প্রস্তরের আঘাতে এত দূর কষ্ট পাইয়াছিলেন যে,তাহার ফলে তিনি অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। লোকে মনে করিয়াছিল, হজরত স্বীয় কন্যার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাকে কতল করিবেন। কিন্তু কোন শাস্তির আদেশ না দিয়া তিনি হারবারকে নিষ্কৃতি দিলেন। হজরতের বিচারে সকলে স্তম্ভিত হইল। এইরূপ আশাতীত ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

ইহার পর 'ওহাসী' নামক এক ব্যক্তি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইল। ওহাসী হজরতের পিতৃব্য হজরত হামজার গলদেশ দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। ইহার জন্য হজরতের পিতৃস্বসা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে,হজরত হামজার জীবনের পরিবর্ত্তে ওহাসীকে হত্যা করা হইবে, কিন্তু ওহাসী আঁহজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি মোছলমান হইয়া খেদমতে হাজির হইয়াছি।" যদিও তাহার উপর ক্রোধের যথেষ্ট কারণ ছিল, তবুও হজরত তাহার ইমান আনিবার কথা শুনিয়া হত্যার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। আবু-ছুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা, অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণা ছিল। যখন আবুছুফিয়ান মক্কাবাসিগণকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে বিফল মনোরথ হইয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হেন্দা লোক সমক্ষে তাহাকে অতি কুৎসিত ভৎসনা করিয়াছিল এবং ইছলামের প্রতি অতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। হজরত হামজা যুদ্ধে সহিদ হইলে এই হেন্দা তাঁহার পেট হইতে কলিজা বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করত রোষ পরবশ হইয়া স্বীয় দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিয়াছিল। শত্রুতার বশে যে নারী এই প্রকার নৃশংস আচরণ করিতে পারে, সে মানবসমাজে ক্ষমার্হ নহে, কিন্তু এই হেন্দাকেও আঁ হজরত নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা করিলেন। হেন্দা স্বীয় ব্যবহার হেতু এতই লজ্জিত হইয়াছিল যে, হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সময় অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখমণ্ডল

আবৃত করিয়াছিল। যাঁহার অনন্ত রহম, অনন্ত দয়া, অনন্ত ক্ষমাশীলতা, তাঁহার নিকট এইরূপ গুরুতর অপরাধও মার্জ্জনীয়। তিনি বলিলেন, "হেন্দা, এক খোদাকে পূজা কর। তিনি ভিন্ন আর কেহ পূজার যোগ্য নাই। কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না, কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে।" হেন্দা হজরতের প্রতি ইমান আনিল।

নৃশংসা হেন্দার প্রতি অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা

এইরূপে মক্কাবাসিগণ একে একে হজরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বস্ব অপরাধ স্বীকার করত ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং ইছলাম গ্রহণ করিল। যাহারা সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া কত নিরপরাধ মোসলেমকে হত্যা করিয়াছিল, তাহারা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া ইছলাম গ্রহণ করিল। তাই লোক বলে—সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয় ধ্রুব। ইতঃপূর্ব্বে আঁহজরতের নিকট হইতে মদিনাবাসিগণ অঙ্গীকার লইয়াছিল যে, যদি কখনও কোরায়েশগণ পরাজিত হয় এবং খানায়ে কাবা ও মক্কা ফতেহ্ হয়, তবে তিনি মদিনাবাসিদিগকে ভুলিবেন না। মক্কা হস্তগত হওয়ার পর হজরতের পূর্ব্ব ওয়াদা মনে পড়িল। অতঃপর কয়েক দিবস মক্কা নগরীতে অবস্থান করিয়া তিনি মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হোনায়েন ও তায়েফ যুদ্ধ—(বনি ছকিফ ও বনি হাওয়াজেন উভয় সম্প্রদায়ের পরাজয় ও ইছলাম গ্রহণ) বনি হাওয়াজেন ও বনি ছকিফ মক্কা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। মোছলমানগণও শত্রুদিগের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইবার মক্কাবাসিগণ মোছলেমদিগের সহিত যোগদান করিল। যাহারা এককালে জীবন পণ করিয়া মোছলমানদিগের শত্রুতাচরণ এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, আজ তাহারা সত্যতার আকর্ষণে মোছলমানদিগের সহযোগী হইয়া তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। যুদ্ধে 'বনি ছকিফ' ফেরার

(পলাতক) হইয়া তায়েক নগরের কেল্লার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বনি হাওয়াজেন ধৃত ও বন্দী হইল এবং তাহাদের কেল্লা ও মালামাল মোছলেমদিগের অধিকৃত হইল। তৎপরে মোছলেমগণ তায়েফ নগরের দিকে অগ্রসর হইল। ঐ নগর মক্কা হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এবং পর্ব্বত বেষ্টিত। যখন ইছলাম প্রচারের প্রাক্কালে মক্কাবাসিগণ হজরতকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তখন তিনি এই সহরে উপস্থিত হইয়া সত্যবাণী প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু তায়েফবাসিগণ হজরতকে নগর হইতে বহির্গত করিয়া দেয় এবং হজরতের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করত তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত করে। এইক্ষণে মোছলমানগণ এই সহর বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিলেন, তায়েফবাসিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে মোছলমানদিগের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদের হস্তে স্বীয় কেল্লা সমর্পণ করিল কিন্তু স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না। তৎপরে তায়েফ-বাসিগণ দুই বৎসর কাল আপনাপন প্রতিমাগুলি রক্ষা করিবার জন্য হজরতের নিকট সময় প্রার্থনা করিল, হজরত তাহা অস্বীকার করিলেন। অতঃপর তাহারা একবৎসর মাত্র সময় চাহিল, তিনি তাহাও স্বীকার করিলেন না; শেষে তাহারা এক মাস কাল বোথ (মূর্ত্তি) গুলি রাখিবার প্রার্থনা জানাইল। হজরত তাহাতেও অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এক মুহূর্ত্তের জন্যও মূর্ত্তিপূজা জায়েজ (সঙ্গত) নহে। খোদা এক, কেবল তাঁহারই পূজা করা জায়েজ।" যাহা হউক, তায়েফবাসিদিগকে হজরত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ইছলাম গ্রহণ করা না করা তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ধর্ম্মের জন্য কাহারও উপর জবরদস্তী নাই কিন্তু যদি কেহ চাহে যে, আমি মূর্ত্তিপূজা অপ্রতিহত রাখিতে দিব তাহা অসম্ভব"। তৎপরে এক একটী করিয়া বোৎগুলি বিনষ্ট করা হইল। অতঃপর মোছলমানগণ মদিনা অভিমুখে রওনা হইলেন। এই সময়ে বনি হাওয়া-

জেনের পক্ষ হইতে কয়েক ব্যক্তি হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমরা আপনার উপর অশেষ নির্য্যাতন করিয়াছি, কিন্তু আমরা জানি, আপনি অনুগ্রহের আকর, তাই আমরা আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমাদের যে সমস্ত লোক দাসরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিষ্কৃতি দিন্।" এই সমস্ত গোলাম (দাস) কে তৎকালীন সামরিক রীতি অনুসারে সিপাহীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই ইহাদিগকে এক্ষণে নিষ্কৃতি দেওয়া সহজ সাধ্য ছিল না। যদিও ইহারা মূর্ত্তিপূজা করিত এবং যদিও ইহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা কষ্টসাধ্য ছিল, তথাপিও তিনি দয়াপরবশ হইয়া সিপাহীদিগের অনুমতি লইয়া তাহাদের সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই প্রকার উদারতা ও ক্ষমাশীলতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ইছ্‌লাম মোছলেম বা অমোছলেম সকলকেই নিঃসঙ্কোচে,—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দান ও খয়রাত করিতে শিক্ষা দেয়। হজরতের এইরূপ মহানুভবতা দেখিয়া বনি ছকিফ ও বনি হাওয়াজেন একেবারে মুগ্ধ হইয়া উভয় কবিলা মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া ইছলাম গ্রহণ করিল। তৎপরে হজরত মদিনায় উপস্থিত হইলেন।

তবুকে হজরতের যুদ্ধ যাত্রা—কিয়ৎকাল পরে আরবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ছোলতানে রুম অবসর বুঝিয়া আরব আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলেন। হজরত ঐ সময়ে স্থির থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। যদিও আরববাসিগণ দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ছিল, তবুও হজরতের আদেশমত ছোলতানের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইল। এই ব্যাপারে হজরত আবুবকর, হজরত ওছমান, হজরত ওমর ও হজরত আলি (রাঃ) স্বীয় ধন সম্পত্তি, উষ্ট্র, অশ্ব, রজত, কাঞ্চন ও তৈজসপত্রাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই যুদ্ধার্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গোধুম, খোর্ম্মা যাহা

কিছু গৃহে সঞ্চিত ছিল, সমুদয় সেনাদিগের খাদ্যের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। স্ত্রীলোকগণ স্বস্ব অলঙ্কার আঁহজরতের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। আঁহজরত ৩০ ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া তবুক সহরে পৌঁছিলেন। আরববাসিদিগের সাজসজ্জা দেখিয়া ছোলতান শত্রুতা মুলতবী (স্থগিত) রাখিলেন। তৎপরে মোছলমানেরা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া মদিনায় প্রতিগমন করিলেন।

তাই সম্প্রদায়ের নিষ্কৃতি প্রদান—কবিলায়ে "তাই" ইছলাম গ্রহণ করে নাই। এক্ষণে তাহারা শত্রুতা আরম্ভ করিয়া বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টি করিতে লাগিল। আঁ হজরত উহাদের বিরুদ্ধে হজরত আলীকে প্রেরণ করিলেন। আদি-বেন-হাতেম তাই ঐ কবিলার সর্দ্দার ছিল। সে মোছলমান ফৌজ দেখিয়া ছিরিয়া দেশে পলায়ন করিল। স্থানীয় অধিবাসিগণ বন্দীকৃত হইয়া মদিনায় প্রেরিত হইল। বন্দীদিগের মধ্যে হাতেম তাইয়ের এক কন্যাও ছিল। উহাকে নিষ্কৃতি দেওয়ার আদেশ প্রচারিত হইলে কন্যাটী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া যোড়হাতে নিবেদন করিল, "আমার অনেক আত্মীয় স্বজন বন্দীকৃত হইয়া গোলামী স্বীকার করিয়াছে, যদি কাহাকেও বধ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমাকেই বধ করুন, ইহাদিগকে নিষ্কৃতি দিন্। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একা নিষ্কৃতি পাইতে চাই না। আমার জীবন কোন অংশে তাহাদের জীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহে।" হজরত কন্যাটীর উক্তিতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত কবিলাকে নিষ্কৃতি দান করিলেন। উহারা এই আদেশে নিজকে এতদূর অনুগৃহীত মনে করিয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ ইছলাম গ্রহণ করিল।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, যিনি শত্রুদিগের প্রতি এরূপ অযাচিত দয়া ও ক্ষমাশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে জালেম (অত্যাচারী)

আখ্যা প্রদান করা হয় এবং তৎপ্রতি অসি-সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচারের অপবাদ দেওয়া হয়। ইছ্‌লামের বিস্তার কখনও অসি সাহায্যে ঘটে নাই। হজরতের অযাচিত দয়া ও ক্ষমাশীলতা শত্রুগণকে মুগ্ধ করিয়া ইছলাম গ্রহণ করিবার জন্য প্রণোদিত করিয়াছিল। তিনি কখনও পরাজিত শত্রুকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই। তিনি কখনও ভোগ বিলাসের জন্য যুদ্ধকালে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অপব্যবহার করেন নাই। তিনি কখনও বন্দীদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার প্রশ্রয় দেন নাই। অপরাধ স্বীকার করিলে কাহাকেও দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি দিতে তিনি কখনও ইতস্ততঃ করেন নাই।

অসি সাহায্যে ইছ্‌লাম বিস্তৃতির অপবাদ খণ্ডন—যে একবার তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছে, সেই মুক্তিলাভ করিয়াছে। স্বজন ও আত্মীয়ের হত্যাকারীকে নিষ্কৃতি দিতে তিনি কখনও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি দয়ার অবতার ও ক্ষমার আকর ছিলেন। যে ইছ্‌লামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, কেবল তাহারই বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যে মোছলেমদের জীবন লইতে উদ্যত হইয়াছে, তিনি কেবল তাহাকেই পরাস্ত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। যে নিরপরাধ মোছলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, তিনি তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার বা ইছলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, তিনি তাহাদেরই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি স্বার্থের জন্য, ধনলিপ্সার জন্য, সম্মান বৃদ্ধির জন্য কিংবা রাজ্য বিস্তৃতির জন্য কোন যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই। তিনি আত্মরক্ষা হেতু, আশ্রিত ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ হেতু, জালেমদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হেতু যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধে জুলুম (অত্যাচার) ছিল না, অবিচার ছিল না, অনর্থক শত্রু বিনাশ ছিল না, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ছিল না। সত্য-

নীতির বশবর্ত্তী হইয়া একেশ্বরবাদ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং প্রপীড়িতকে সাহায্য করিবার জন্যই তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন এবং সেইজন্যই তিনি সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ মুষ্টিমেয় হইলেও ঐশীবলে বলীয়ান্ ছিলেন। সত্যের জন্য জীবনপাত করিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না। "সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরাজয় অসম্ভব।" এই নীতি তাঁহার জীবনী হইতে বিশেষভাবে শিক্ষা করা যায়।

যে সমস্ত ব্যক্তি প্রথমে ইছলামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, উত্তরকালে তাহারা সকলেই ইহার বিস্তৃতির সহায়তা করিয়াছিল। ইছলামের সত্যতা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতাই ইহার প্রধান কারণ। হাবেশের বাদশা ইছলামের গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে 'আমর-এবনে-আছ' কোরায়েশদিগের পক্ষ হইতে নজ্জশীর নিকট উপস্থিত হইয়া মোছলমানগণের অপবাদ করিয়াছিলেন, অবশেষে তিনি হজরতের পক্ষ হইতে বাদশাহ জাফরকে ইছ্‌লামে আহ্বান করিয়াছিলেন। যে খালেদ-এব্‌নে-অলিদ ওহোদের যুদ্ধে কোরায়েশদিগের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ইছলাম গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে 'লাত' ও 'ওজ্জা'কে ধ্বংস করিয়াছিলেন। যে ওরবা-এব্‌নে-মাছুদ আঁ হজরতের মক্কা প্রবেশে বাধা দিবার জন্য কোরায়েশদিগের পক্ষ হইতে দূত-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ইছলাম গ্রহণ করতঃ স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে উহার বিস্তৃতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে ছোহায়েল-এব্‌নে-আমর হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে কোরায়েশদিগের পক্ষে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলের এবং যিনি সন্ধিপত্রে হজরতের নামে রছুলুল্লা লিখিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনিই শেষে ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা শত শত লোককে মোছলমান করিয়াছিলেন। যে ওহাসী গোলাম হজরত আমির হামজাকে সহিদ করিয়াছিলেন, তিনি

ইছলাম কবুল করিয়া নবুয়তের দাবীকারিণী মোছায়লেমে-কাজ্জাবকে বধ করিয়া চিরতরে অসত্য মিটাইয়া দিয়াছিলেন। যে তোফায়েল আঁ-হজরতের কথার প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার জন্য সর্ব্বদা কানে তুলা দিয়া থাকিতেন, ইছলাম বিস্তৃতির জন্য তিনি গৃহে গৃহে গমন করিয়া সত্য সংবাদ পৌঁছাইয়া ছিলেন। যে 'বোরা-এদা-এব্‌নে-খোজাএব-আছলামী' কোরায়েশদিগের নিকট হইতে তাহাদের প্রতিশ্রুত ১০০ লাল রঙের উট পুরস্কার পাইবার জন্য ৭০০ শত অশ্বারোহী সহ আঁ হজরতের জীবনের উদ্দেশ্যে মক্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরিশেষে তিনিই স্বীয় পাগড়ীর দ্বারা নিশান উড়াইয়া আঁ হজরতের পতাকাবাহক স্বরূপ বহু মোছলেম সেনাসহ অতি ধুমধামের সহিত মদিনায় প্রবেশ করিয়া ইছ্‌লামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু সকল-গুলির বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া অসম্ভব। যিনি একবার তাঁহার সংসর্গে আসিতেন, তাঁহারই অন্তঃকরণ দ্রবীভূত ও রূহ্‌ পাক হইয়া যাইত। অন্যান্য পয়গম্বরগণ নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেন, কিন্তু আঁ-হজরত কেবল স্বীয় সত্যতার বলে প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া উহাতে পরমার্থবাদ প্রচার করিতেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান মাজেজা (অলৌকিক ব্যাপার)। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণ যে সমস্ত গুণে গুণী ছিলেন, আঁ হজরতের মধ্যে সেই সমস্ত গুণ অতি বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি হজরত নুহের ন্যায় সহিষ্ণু, হজরত ইব্রাহিমের ন্যায় হৃদয়বান, হজরত ইউছফের ন্যায় ক্ষমাশীল, হজরত এয়াকুবের ন্যায় ধর্ম্মশীল, হজরত সোলেমানের ন্যায় শক্তিশালী, হজরত ইছার ন্যায় বিনয়ী, হজরত জাকারিয়ার ন্যায় নিষ্ঠাবান ও হজরত ইছ্‌মাইলের ন্যায় অমায়িক ছিলেন। মোট কথা, তাঁহাতে সমস্ত সদ্‌গুণ পুঞ্জীভূত ছিল।

আখেরী হজ্জ ও আখেরী খোত্‌বা ৬৩১ খৃঃ—

হজ্জের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে আঁ হজরত হজরত আবুবকর (রাঃ) কে হাজিদিগের কাফেলার সহিত গমন করিয়া হজ্জ আদায় করিতে আদেশ করিলেন এবং হজরত আলীকেও হজরত আবুবকরের সঙ্গী হইতে বলিলেন। তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন যে, এই হজ্জ শেষে এই প্রকার ঘোষণা করা হইবে যে, তৎপরবর্ত্তী সন হইতে মক্কা নগরীতে কেবল খোদা-পোরস্ত লোক অবস্থান করিবে এবং কোন বোৎপোরস্ত লোক ঐ স্থানে আসিতে পারিবে না। তদনুসারে হজরত আলী কোর্‌বানীর দিন উচ্চকণ্ঠে ঐরূপ ঘোষণা করিলেম এবং তৎপরে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার ফলে পর বৎসর সমস্ত মক্কায় খোদা পোরস্ত ব্যতীত কোন বোৎ পোরস্ত রহিল না। দশম হিজরী আরম্ভ হইলে হজরত আরবের প্রত্যেক কবিলাতে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য এক একজন নকিব (প্রচারক) পাঠাইলেন এবং যে সমস্ত বাদ্‌শাহ তখন পর্য্যন্তও মোছলমান হন নাই, তাহাদের নিকট ইছ্‌লাম গ্রহণ হেতু ফরমান (আদেশ) প্রেরণ করিলেন। যে সমস্ত লোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহারা দীন (ধর্ম্ম) ইছ্‌লামের আলোকে আসিল এবং অসদাচরণ হইতে বিরত হইল। ক্রমে আরবের চারিদিকে ইছ্‌লাম প্রচার হইল। আঁ হজরত ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী লক্ষাধিক লোক সহ আখেরী (শেষ) হজ্জ সম্পাদন জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি কাবা প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে ওছমান-এব্‌নে-তালহা (যাহার নিকট কাবার কুঞ্জিকা রক্ষিত ছিল) কাবার দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহার প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিল। পাঠকবর্গ একবার মনে করিয়া দেখুন, যে মহাপুরুষ আজ সমগ্র আরবের অধীশ্বর, আজ যিনি বিচারক শ্রেষ্ঠ ও আমিরুল মোমেনিন (বিশ্বস্ত ইছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের অধীশ্বর) তিনি সামান্য একজন দ্বারপালের দ্বারা অসম্মানিত হইলেন। এই ঘটনা দেখিবামাত্র হজরত আলী (রাঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার গ্রীবা ধারণ

করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে তুমুল মল্ল যুদ্ধ চলিল। ওছমান পরাক্রান্ত হজরত আলীর (রাঃ) সমকক্ষতা করিতে অশক্ত হইলে তিনি বলপূর্ব্বক কুঞ্জিকা হস্তগত করিলেন। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট কুঞ্জিকা অর্পণ করিয়া হজরত আলী (রাঃ) সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে আঁ হজরত কুঞ্জিকা দ্বারপালের নিকট প্রত্যার্পণ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, "কুঞ্জিকা চিরতরে ওছমান ও উহার বংশধরের নিকট থাকিবে।" কাবার কুঞ্জিকা রক্ষক যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী। সুতরাং আঁ হজরতের আদেশ শুনিয়াই সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আঁ হজরত ইচ্ছা করিলে তাহার উপর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিতেন এবং তাঁহারই নিজের বংশধরের জন্য উক্ত কুঞ্জিকা হস্তগত করিয়া কুঞ্জিকা রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি মিরাছ স্বরূপ রাখিতে পারিতেন। ওছমান কৃতজ্ঞতার সহিত কুঞ্জিকা গ্রহণ করিল এবং কাবার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ইছ্‌লাম গ্রহণ করিল। তদবধি কাবার কুঞ্জিকা ইঁহারই বংশধরেরা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং ইঁহারাই 'সেবী' নামে অভিহিত।

যে সকল লোক হজ্জের জন্য আঁ হজরতের অনুগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এহ্‌রামাবদ্ধ (১) ছিলেন। আমীর গরীব একই মামুলী

---

(১) এহ্‌রাম শব্দের অর্থ 'পাক'। যিনি হজ সম্পাদন জন্য পবিত্র অবস্থায় থাকেন, তাঁহাকে মোহরেম বলে। বিভিন্ন দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান (মিকাত) নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ স্থান হইতে এহ্‌রাম ব্যবহার করিতে হয়। মদিনা হইতে যাত্রিদিগের জন্য জুল্ হুলায়ফা, ছিরিয়া ও মেছের হইতে আগত যাত্রিদিগের জন্য জুফা, নেজদ হইতে আগত লোকের জন্য কর্ণাল মানাজী, ইমেন হইতে আগত যাত্রিদিগের জন্য ইয়া-লাম্-লাম্, মিকাত নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সকল লোক উপরিউক্ত মিকাত বেষ্টিত স্থানের মধ্যে বাস করে, তাহাদিগকে স্বস্ব গৃহে এহ্‌রাম গ্রহণ করিতে হয়। মোহরেমকে ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন করিয়া গোছল করিতে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করিতে

পরিচ্ছদ পরিহিত ছিল। ঐ সময়ে আরফত ময়দানে হাসরের (শেষ বিচার দিনের) নমুনা দৃষ্ট হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আঁ হজরত মক্কা হইতে হিজ্‌রত্‌ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন একমাত্র হজরত আবুবকরই তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এবং হজরত আলী (রাঃ) মক্কা নগরীতে তাঁহার শয্যোপরি তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া শত্রুদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আজ সেই আরবদেশ নবজীবনে সঞ্জীবিত ও হজরতের নেতৃত্বে লক্ষাধিক লোক একত্র সমবেত হইয়া দণ্ডায়মান।

আঁ হজরত সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আরফাত ময়দানে পৌছিলেন। সঙ্গিগণ সকলে তকবীর (আল্লা-হু-আকবর), তহ্‌লীল (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্‌), তহ্‌মিদ (আল্‌-হাম্‌দু-লিল্লাহ) ও তছবিহ (ছোবহান্‌ আল্লাহ) পড়িতেছিলেন। তিনি জেবলের (পাহাড়ের) শিখর দেশে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত মোছলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত খোত্‌বা পড়িলেন :—

"হে উপস্থিত মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! সম্ভবতঃ আগামী বৎসর আমি তোমাদের মধ্যে থাকিব না। আমি এখন তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি,

---

হয়। অঙ্গে মাত্র দুইখণ্ড সেলাইহীন বস্ত্র রাখা বিধি। একটী তহবান বা ইজারের কাজ করে, অপরটী চাদরের কাজ করে। উভয় পোষাক সাদা হইলেই ভাল। জুতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, তবে স্যাণ্ডাল বা চটিজুতা ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকদিগকে কোন বিশেষ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবার আবশ্যক করে না। বোর্‌কা কিম্বা অন্য কোন পরিচ্ছদ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত থাকিলেই চলে। মোহরেমকে দুই রেকাত নামাজ আদায় করিতে হয়। ওমরা শেষ হইলে এহরাম পরিত্যাগ করা যায় এবং হজ্জের সময় উহা পরিধান করিতে হয়। মোহরেমদিগের পক্ষে রক্তপাত করা, শিকার করা, বৃক্ষাদি উৎপাটন করা, শৃঙ্গার করা নিষিদ্ধ এবং সর্ব্বদা শুচি অবস্থায় থাকা বিধেয়।

মিকাত হইতে মক্কাশরিফে উপস্থিত হইয়া "তওয়াফ" ও "ছয়ী" করিতে হয় এবং পবিত্র জম্‌জম্‌ কূপের জল পান করিতে হয়।

তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুন এবং তাহা আমল কর। এই দীন তোমাদের জন্য অতি পবিত্র। তোমরা প্রত্যেক সালে এই পাক জায়গায় উপস্থিত হইবে। তোমরা মনে রাখিবে, কেয়ামতের (প্রলয়ের) দিন তোমাদিগকে খোদার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তোমাদের সকল কার্য্য ও সকল বিধির হিসাব নিকাশ হইবে।

"ভ্রাতৃগণ! মনে রাখিবে, তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের যেরূপ অধিকার, তাহাদেরও তোমাদের উপর তদ্রূপ অধিকার। তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। খোদার ওয়াস্তে তাহাদিগকে তোমরা গ্রহণ করিয়াছ এবং খোদার কালাম (কথা) দ্বারা তাহারা তোমাদের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে। দাসদাসীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না। তোমরা যেরূপ আহার বিহার কর এবং পোষাক পরিচ্ছন্ন ব্যবহার কর, তাহাদিগকেও সেইরূপ করিতে দিবে, যেহেতু সকলই মহাপ্রভুর দাস এবং পরস্পর কাহারও প্রতি কাহারও দুর্ব্ব্যবহার করিবার অধিকার নাই।

"ভ্রাতৃগণ মনে রাখিবে, মোছলেমগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। তোমরা সকলে এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এক ভাইএর বস্তু অপর ভাইএর গ্রহণীয় নহে। কাহারও প্রতি অবিচার করিবে না। কাহারও হক (ন্যায্যাধিকার) নষ্ট করিবে না।

"ভ্রাতৃগণ! তোমরা পরস্পরের রক্ত, মান ও ইজ্জৎ (সম্ভ্রম) হারাম বলিয়া জানিবে। খবরদার, আমার অন্তে তোমরা পুনরায় পথভ্রষ্ট হইও না। একে অপরের গর্দ্দান কাটিও না। আমি তোমাদের নিকট এমন এক বস্তু রাখিয়া যাইতেছি যে, যদি তোমরা উহার ভালরূপ অনুসরণ কর, তবে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। ঐ বস্তু আল্লার কেতাব অর্থাৎ কোরাণ। হে মোছলেমগণ, আমার পর কোন পয়গম্বর আসিবে না এবং অন্য কোন নূতন উম্মত (শিষ্য) পয়দা হইবে না। পরওয়ারদেগারের

এবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়, বৎসরে এক মাস রোজা রাখ, হৃষ্টচিত্তে মালের জাকাত আদায় কর, বয়তুল্লার হজ সমাধান কর, তোমাদের উপর যে সকল আদেশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা পালন কর, তাহা হইলে তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবে।" সর্ব্বশেষে হজরত আরও বলিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ, যখন কেয়ামতের দিন খোদাতালা তোমাদিগকে আমার রেছালৎ (প্রেরিতত্ব) সম্বন্ধে ছওয়াল করিবেন, তখন তোমরা কি জওয়াব দিবে?" সকলেই সমস্বরে উত্তর করিল, "আমরা বলিব, আপনি খোদার আহ্‌কাম (আদেশ) বখুবী (সুচারুরূপে) পৌছাইয়াছেন, উম্মতকে কৃতিত্বের সহিত নছিহৎ (উপদেশ দান) করিয়াছেন, এবং রেছালতের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন।" একথা শুনিয়া হজরত আছমানের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আয় আল্লা, তুমি সাক্ষী থাক, আমি তোমার রেছালতের কর্ত্তব্য যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়াছি।" তখন কোরআনের এই আয়েত নাজেল (অবতীর্ণ) হইল, "আজ তোমাদের উপর তোমাদের দীন মোকামেল (সম্যকরূপে পূর্ণ) করিয়াছি। তোমার উপর এহ্‌ছান্ (অনুগ্রহ) পূর্ণ করিয়াছি এবং তোমার দীন ইছলামকে পছন্দ করিয়াছি।" এই আয়েত দ্বারা হজরত জানিলেন, রেছালাৎ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে এবং দুনিয়াতে তাঁহার যে কর্ত্তব্য ছিল তাহা শেষ হইয়াছে। তখন তাঁহার স্বীয় মহ্‌বুবের (প্রিয়তমের) সহিত মিলিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল। ইহার পর নামাজে হজ্জ আদায় করিয়া হজরত মদিনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হজরতের স্বাস্থ্যভঙ্গ:—একাদশ হিজরী সুরু হইল। এই হিজরীকে সালেরেহ্‌লৎ (মহাপ্রস্থান) বলা হয়। এই সালের মধ্যে হজরত মদিনা শরিফের বাহিরে যান নাই। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর। বার্দ্ধক্য, পরিশ্রম ও দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং

তিনি ক্রমে রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার মেজাজে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রতি ওয়াক্তের নামাজ তিনি মছজেদে গিয়া পড়িতেন এবং স্বয়ং ইমামতি (নেতৃত্ব) করিতেন।

রোগবৃদ্ধি—রোগের প্রথম অবস্থায় আঁ হজরত সহধর্ম্মিণী ময়মুনা খাতুনের গৃহে ছিলেন। পরে হজরত আয়েষার গৃহে আগমন করেন। পুনরায় ময়মুনার গৃহে চলিয়া যান। সেখানে রোগের বৃদ্ধি হয়।

আঁ হজরতের সমুদয় পত্নী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য তথায় সমবেত হন এবং হজরত আয়েষার গৃহে লইবার জন্য সকলে মত প্রকাশ করেন। রোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে তিনি তিন দিবস গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারেন নাই। একদিন বেলাল আঁ হজরতের গৃহদ্বারে যাইয়া জ্ঞাপন করিলেন "নামাজ উপস্থিত"। হজরত রোগের প্রাবল্য বশতঃ বাহির হইতে না পারিয়া বলিলেন, "নামাজীদিগকে লইয়া আবুবকরকে ইমামতী করিতে বল।" বেলাল ক্রন্দন করিতে করিতে আবুবকরের নিকট যাইয়া বলিলেন, "অদ্য আঁহজরত আপনাকে মছজেদে এমামের কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন।" আবুবকর আদেশ অনুসারে নামাজ পড়িতে উদ্যত হইলেন। এমামের স্থলে আঁ হজরতকে না দেখিয়া, বেলাল ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। আঁ হজরত কন্যা ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মছজেদে কিসের কোলাহল উপস্থিত?" ফাতেমা বলিলেন, "বাবাজান. আপনার সহচরগণ আপনার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।" তখন আঁ হজরত হজরত আলীর হস্তে ভর করিয়া মছজেদে উপস্থিত হইলেন এবং হজরত আবুবকরকে ইমামতী করিবার আদেশ দিলেন। নামাজ হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া তিনি লোকদিগকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যদি আমাদ্বারা তোমাদের কাহারও কষ্ট বা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তবে এসময়ে আমাকে ক্ষমা কর। যদি তোমাদের মধ্যে কাহার নিকট আমার কর্জ্জ থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে আমা হইতে পরিশোধ লও।" একথা শুনিয়া এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "হজরতের নিকট আমার তিন দেরহাম পাওনা আছে।" তৎক্ষণাৎ উক্ত দেনা পরিশোধ করা হইল। তৎপরে হজরত উপস্থিত মোছলমান ভাইদিগকে বহু নছিহৎ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর আর তাঁহার গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার সুযোগ ঘটে নাই। রোগ প্রবল হইয়া উঠিলে সাত ওয়াক্ত নির্দ্দিষ্ট নামাজের নেতৃত্ব আঁ হজরত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় নাই, হজরত আবুবকরই সম্পাদন করিয়াছিলেন। রোগ ও অস্থিরতা বাড়িলে তিনি এক পেয়ালা পাণি নিকটে রাখিলেন এবং উহাতে হাত ডুবাইয়া বারংবার মুখে লাগাইতে লাগিলেন। রোগ যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আঁ হজরত হজরত আলীকে ডাকিলেন এবং তাঁহার ক্রোড়দেশে মস্তক স্থাপন করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া আসিল, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু প্রকাশ পাইল। হজরত ফাতেমা এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কুমার হাছন, হোছায়েনের হস্ত ধারণ করিয়া অধৈর্য্য হইয়া এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, "বাবাজান, অতঃপর আপনার কন্যা ফাতেমার প্রতি কে কৃপাদৃষ্টি করিবে? কে আপনার স্নেহের হাছন হোছায়েনের মন রাখিবে? বাবাজান, আমার দুর্ভাগ্য যে অতঃপর আমার কর্ণ আর আপনার সুমধুর বচন শুনিবে না, আমার চক্ষু আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে না।" কন্যার বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আঁ হজরত চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "ধৈর্য্য ধারণ কর। ফাতেমা, তুমি আমার নয়নের নিধি,

তোমাকে আমি সুসংবাদ দান করিতেছি যে, সকলের পূর্ব্বে তুমি আমার সহিত মিলিত হইবে।" মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া হজরত ফাতেমা একান্ত অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। হজরত আলী তাঁহাকে বলিলেন, "নিবৃত্ত থাক, আর হজরতকে ব্যথিত করিও না।" তখন আঁ হজরত বলিলেন, "আলী, আপন পিতার জন্য ইহাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে বারণ করিও না।" তৎপরে পুনরায় আঁ হজরত নয়ন মুদ্রিত করিলেন। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল, হজরতের পত্নীবর্গ ও তাঁহার কন্যা এবং দৌহিত্রগণ অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহদ্বারে উপবিষ্ট সহচরগণ রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আলি দ্বার উন্মুক্ত করুন, একবার তাঁহার মনোহর রূপ নয়ন ভরিয়া দর্শন করিব।" পারিষদদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া আঁ হজরত তাঁহাদিগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিতে বলিলেন। মোহাজের ও আন্‌ছার দলপতিগণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। হজরত সকলকে স্থির হইতে ইঙ্গিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমরা মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক, তোমরা সর্ব্বাগ্রে স্বর্গলোকে যাইবে, তোমাদের উচিত যে, ধর্ম্ম সংরক্ষণে দৃঢ় থাক, কোরআন গ্রন্থকে আপনাদের পথপ্রদর্শক মনে কর, ধর্ম্মবিধির প্রতি উদাসীন না থাক। ইহার পর তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। হজরত আলীর ইঙ্গিতক্রমে পারিষদগণ বাহিরে গেলেন, পরিশেষে হজরত আয়েষা আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। আঁ হজরত বলিলেন, "আয়েষা, তোমরা আপনাপন গৃহে স্থিতি করিবে, ধৈর্য্য ও সতীত্ব দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিবে।" হজরত আয়েষা কাঁদিতে লাগিলেন।

তৎপরে আঁ হজরত কন্যা ফাতেমার হস্ত স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া কিছুকালের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিলেন। কন্যা হজরতের কর্ণমূলে

মস্তক স্থাপন করিয়া বাবাজান বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবাজান, একবার আমার প্রতি দৃষ্টি করুন, একটী কথা বলুন।" তখন হজরত চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বলিলেন, "মা, রোদন করিও না। তোমার ক্রন্দনে স্বর্গ কাঁদিয়া উঠে।" এই বলিয়া স্বহস্তে কন্যার চক্ষুর জল মোচন করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আমরা আল্লার জন্য আসিয়াছি, আল্লাতে পুনঃ মিলিত হইব।" পুনর্ব্বার তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। মহাবিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, "আয় রছুল, যদি চাহ তবে দুনিয়াতে থাক, আর যদি চাহ আমার নিকট আইস।" হজরত আরজ করিলেন "আয় রব্, আমি এক্ষণে তোমার নিকট যাইতে অনুমতি চাই।" অবশেষে ১২ই

রেহ্‌লৎ।

রবিয়ল আউয়াল সোমবার দ্বিপ্রহরের সময়ে তিনি কলেমা পাঠ করিতে লাগিলেন এবং "বর-রাফিকুল-আলা" (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু সন্নিধানে যাইতেছি) বলিতে বলিতে অস্থায়ী দুনিয়া হইতে রেহলৎ ফরমাইলেন। এইরূপে ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে ইছলামের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলেন।

আঁ হজরত দেহত্যাগ করিলে ক্রন্দনের মহারোল উঠিল। নগরের চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল, অনেকের বুদ্ধি জ্ঞান লোপ হইয়া গেল। দেহত্যাগ সময়ে হজরত আবুবকর (রাঃ) আপন আলয়ে ছিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া আসেন, মছজিদের দ্বারে আসিয়া তিনি লোকদিগকে অত্যন্ত শোকে বিহ্বল দর্শন করিয়াও কাহারও প্রতি মনোযোগ বিধান না করিয়া হজরত আয়েষার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আঁ হজরতের মুখ হইতে আবরণ উদ্ঘাটন

করিয়া ললাট চুম্বন করিলেন এবং 'হায় নবি' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার ললাট চুম্বন করিলেন, আবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন, আবার ললাট চুম্বন করিলেন, বাহু চুম্বন করিলেন, এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আঁ। হজরতের গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন।

তক্‌ফীন ও তদ্‌ফীন—আঁ। হজরতের দেহ প্রক্ষালন করার সময়ে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। তাঁহার দেহ বস্ত্রাবৃত অবস্থায় প্রক্ষালন করা হইয়াছিল। হজরত আলি স্নান করাইবার ভার গ্রহণ করিয়া অতি আদর ও সম্ভ্রমের সহিত দেহকে স্বীয় বক্ষোদেশে সংলগ্ন করিলেন। ফজল খের্কা (অঙ্গাচ্ছাদন) সরাইলে হজরত আলী ধীরে ধীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করিতে থাকেন। আছমা ও শকরান জল ঢালেন, আব্বাছ ও কাছেম দেহকে পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে পরিবর্ত্তিত করেন। প্রথমতঃ নির্ম্মল জলে, তৎপরে বদরীপত্র সিক্তজলে অবশেষে কর্পূর জলে স্নান করান হয়। প্রক্ষালন করা হইলে সর্ব্বাঙ্গে কর্পূর ও মেস্ক লেপন করা হয়। অবশেষে শুভ্র কার্পাস বস্ত্র পরাইয়া দেহ কাষ্ঠ ফলকে রাখা হয়। পরে সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হন। আবু তাল্‌হা আনছারী সমাধি খনন করিয়াছিলেন। আলী, অকিল, ফজল, কাছেম, শাকরান, আছমা ও ওছ দেহকে কবরে স্থাপন করেন। হজরত আয়েষার গৃহেই হজরতের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। সমাধি অন্তে পারিষদগণ হজরত ফাতেমার গৃহদ্বারে আগমনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ফাতেমা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "আপনারা রছুলের পবিত্র দেহ কেমন করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন।" সহচরগণ বলিলেন, "আমরা বিশেষ দুঃখিত কিন্তু কি করিব আল্লার এইরূপ আদেশ।" সকলের হৃদয় শোকাকুল, নয়নে অশ্রুধারা, মুখে হাহাকার রব সার হইল। কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল, কেহ বা শোকাঘাতে মুক হইল, কেহ বা স্থানান্তরে চলিয়া গেল। হজরত বেলাল

এরূপ ম্রিয়মান ছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে মদিনায় অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তিনি শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তুরস্কদেশে চলিয়া গেলেন, সেই স্থানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিলে পর স্বপ্নে দেখেন যে, আঁ হজরত তাঁহাকে বলিতেছেন, "বেলাল, তুমি আমার সঙ্গ ছাড়িয়া আমার প্রতি নিদারুণ ব্যবহার করিয়াছ, তুমি পুনরায় মদিনায় যাইয়া আমার সমাধি দর্শন কর।"

বেলাল এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া ব্যাকুল অন্তঃকরণে মদিনায় চলিয়া আসিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ ফতেমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ইহার কিয়দ্দিন পুর্ব্বে হজরত ফাতেমা পরলোক গমন করিয়া· ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া বেলাল শোকে মুহ্যমান হইয়া পুনর্ব্বার তুরস্কদেশে চলিয়া যান। তিনি প্রতি বৎসর মদিনায় আসিয়া হজরতের সমাধি দর্শন করিতেন। তুরস্কেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আঁ হজরতের মৃত্যুকালে 'মাজ' এয়মন রাজ্যে ছিলেন। একদিন রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, কেহ বলিতেছেন, "মাজ তুমি শয়ন করিয়া আছ, আঁ হজরত যে মৃত্যুমুখে পতিত।" পরদিন রাত্রিতেও তিনি ঐরূপ ধ্বনি শ্রবণ করেন। তখন তিনি কাঁদিয়া উঠেন এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হন এবং উষ্ট্রোপরি উঠিয়া সবেগে মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মদিনায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ হজরত আয়েষার গৃহদ্বারে উপস্থিত হন। হজরত আয়েষা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে থাকেন। তিনিও কাঁদিয়া আকুল হন। তৎপরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে হজরত ফাতেমার গৃহে উপস্থিত হন। হজরত ফাতেমা কাঁদিতে কাঁদিতে রোগের আদ্যোপান্ত জ্ঞাপন করেন এবং বলেন "আঁ হজরত অন্তিমকালে আমাকে বলিয়াছিলেন, ফাতেমা মাজকে আমার ছালাম দিবে এবং জানাইবে যে, মাজ আমার উপাসকমণ্ডলীর এমাম হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মাজ কাঁদিয়া বলিলেন, "হায়! মৃত্যু সময়ও তিনি আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

হজরত ইছার (আঃ) হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বিদায় উক্তির তুলনা—ইঞ্জিলে কথিত আছে, হজরত মছীহ মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া ছিলেন, "এলি এলিলামা সাবাকতানী" (হে প্রিয়তম তোমার নৈকট্য লাভ করিতে দাও)—"আয় খোদা, তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলে ?" পাঠকবর্গ একবার আঁ হজরত ও হজরত মছীহ্‌এর শেষবাণী তুলনা করিয়া দেখুন। একজন মৃত্যুকালে পৃথিবীর মায়ার কথা মনে করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন আর অপর জন পৃথিবী ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের মিলন প্রার্থনা করিতেছেন। মোছলেমের পক্ষে ইহা বড়ই গৌরবের কথা যে, আঁ হজরতকে খোদাওন্দ করিম বশারত (সুসংবাদ) দিয়াছেন, "তোমার দীন ইছলাম আজ আমি মোকাম্মেল করিলাম (সম্পুর্ণরূপে পূর্ণ করিলাম)।" ইতঃপূর্ব্বে আর কোন নবী খোদাওন্দ করিম হইতে এইরূপ অভয়বাণী পাইতে সক্ষম হন নাই। আঁ হজরত ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নবুয়ত পাইয়াছিলেন। ২৩ বৎসর ধরিয়া কোরাণ পাক তাঁহার উপর নাজেল হইয়াছিল। তাঁহার জীবনী পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খোদাওন্দ করিম পূর্ব্বেই উদ্দেশ্য করিয়া আঁ হজরতকে দীন ইছলাম পূর্ণ করিবার জন্য মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশানুসারে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি এতিম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্ত ইছলাম জগতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সাহায্যে করিবার খোদা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাঁহার উপর শত্রুগণ অনবরত যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা অকথ্য। অন্য কোন পয়গম্বরের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। সত্যতাই তাঁহাকে পয়গম্বর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছিল। যে আরবদেশ কন্যাহত্যা, স্ত্রী হত্যা, ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা, আত্মকলহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও দ্বেষ হিংসার মাতৃভূমি ছিল, যে আরবদেশ মূর্খতা ও কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য

দুর্গ স্বরূপ ছিল, যে দেশের অধিবাসিগণ তারোপাসনাকেই পারলৌকিক মুক্তির সোপান মনে করিত, সে দেশ একজন নিরক্ষর, এতিম দরিদ্র, নিঃসহায় ব্যক্তিদ্বারা সকলের পূজ্য ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ইছলাম জগতের অন্ধকার রাশি বিনাশ করিয়া শাশ্বত আলোক দানে ধরাবাসীকে ধন্য করিয়াছে। ইছলামের প্রভাবে আমীর গরীব ও ক্রীতদাস ভ্রাতৃত্বের এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। আজ পৃথিবীর প্রায় ত্রিংশৎ কোটী অধিবাসী এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

হজরতের রেহ্‌লতের পর ইছলাম বিস্তার-

আঁ হজরতের অন্তর্দ্ধানের পর মোছলেমগণ জয়ের পর জয়লাভ করিতে লাগিল। সেনানায়ক খালেদ, হজরত ওমর ও অন্যান্য সৈনিক পুরুষদিগের নায়কত্বে ক্রমে পারস্য, প্যালেষ্টাইন, ছিরিয়া ও ঈজিপ্ট (মেছর) মোছলেম দিগের হস্তগত হইল। বার বৎসর কাল মধ্যে ৩৬ হাজার নগর, সহর ও কেল্লা তাঁহাদের বশীভূত হইল; এবং ১৪০০ শত মছজেদ ধর্ম্মকার্য্যের জন্য স্থাপিত হইল। ক্রমে সমস্ত আফ্রিকা ও স্পেনের অধিকাংশ মোছলমানদিগের করতলগত হইল। ৩০ বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতেই কনষ্টান্টিনোপল ও মেসোপোতামিয়া প্রভৃতি দেশ মোছলেমদিগের অধীনতা স্বীকার করিল এবং ক্রমে মোছলেম রাজ্য আটলান্টিক হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। প্রায় তের শত বৎসর অতীত হইয়াছে, একমাত্র স্পেন ভিন্ন সর্ব্বত্র এখনও ইছলামের প্রভাব ও আধিপত্য অক্ষুন্ন রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইছলাম উত্তর এশিয়া হইতে মধ্য আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। একজন পুরুষ একমাত্র সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া পারস্য দেশ হইতে আতস্‌পোরস্তি দূরীভূত করিতে, ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস করিতে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে

বাধা দিতে, খৃষ্টধর্ম্মকে বলহীন করিতে এবং রোমীয় কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইছলামের এই বিরাট প্রভাবের কথা চিন্তা করিতেও হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়। অলোক-সামান্য শক্তি না থাকিলে কোন মানুষ এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারে না। ইছলাম বিস্তৃতি সম্বন্ধে অন্য পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইল।

আঁ হজরতের জীবনযাপন প্রণালী—আঁ হজরত একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মই মোছলমানগণের অনুসরণীয়। মোমেনের পক্ষে তিনটী বস্তু অবশ্য জ্ঞাতব্য:—কোর্‌আন্ পাক, হাদিছশরিফ ও প্রেরিত মহাপুরুষের জীবনী; যিনি এইগুলিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি পার্থিব ও পারলৌকিক সুখের অধিকারী হইয়াছেন। হজরতের আচার ব্যবহার সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকাল সম্মত। তাঁহারা দৃষ্টান্তই ইছলাম বিস্তৃতির মূলীভূত কারণ। যিনি একবার তাঁহার সংসর্গে আসিতেন, তিনিই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইতেন। তাঁহার চরিত্রবল অসীম ছিল। তিনি সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতেন, কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেন না বা আমানিত খেয়ানত করিতেন না। এতিমের উপর বড়ই দয়ালু ছিলেন, বন্ধুগণের উপর বড়ই সদয় ছিলেন; সর্ব্বদা বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন, "আচ্ছালামো আলায়কুম" শুনিলে সহাস্যে উত্তর দিতেন, কখনও লোভের প্রশ্রয় দিতেন না, দরিদ্রের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন, অন্নদানে ও খয়রাতে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। পীড়িতকে সেবা শুশ্রূষা করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতেন এবং পরিণত বয়স্ক মোছলেমদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) গ্রহণ করিতে কখনও জাতিভেদ বিচার

করিতেন না। মারাত্মক শত্রুকেও ক্ষমা করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি মোছলেমের দফন কাফনে (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায়) সর্ব্বদা শরিক হইতেন, শান্তিস্থাপন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, সাক্ষাৎমাত্রই সর্ব্বাগ্রে 'ছালাম আলায়কুম্' করিতেন। অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা, কৃপণতা, শঠতা, জুলুম ও পশ্চাতে তিরস্কার প্রভৃতি দুর্ব্ব্যবহার হইতে তিনি সর্ব্বদা বিরত থাকিতেন। তিনি কখনও কুবাক্য বলিতেন না বা শুনিতেন না এবং কোর্‌আন্ মজিদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইতেন। তিনি যেমন ন্যায়পরায়ণ তেমনি মিষ্টভাষী ও সাহসী ছিলেন। অর্থ পাইলেই তিনি খয়রাত করিতেন। তাঁহার জীবনযাত্রার জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক হইত, মাত্র তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন এবং অতি গরিবানা কিন্তু পরম পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করিতেন। তিনি সামান্য খেজুর ও যবেই তৃপ্তিবোধ করিতেন, অবশিষ্ট খোদার নামে দান করিতেন। অভাবে পড়িলে অনেক সময়ে তিনি অনাহারে থাকিতেন। তিনি কখনও কখনও গার্হস্থ্য কার্য্যে শরিক হইতেন, তিনি মুক্ত ও ক্রীতদাস সকলেরই অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেন এবং কেহ দুগ্ধ মাংস উপহার দিলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্য উপহার দিতেন; কিন্তু কখনও ছদকা (ব্যাধি ও বিপদ শান্তি উদ্দেশ্যে যাহা দান করা হয়) গ্রহণ করিতেন না। তিনি শেরেক দেখিলে ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন। তিনি যাহা পাইতেন, তাহা সন্তুষ্ট হইয়া খাইতেন, অনেক সময় রুটী ও মাংসের অভাবে কেবলমাত্র কাঁচা খেজুর বা তরমুজ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি কখনও তাকিয়া মাথায় দিতেন না কিংবা কখনও উচ্চ মেজে বসিয়া খাইতেন না। তিনি কখনও একাদিক্রমে তিন দিবসের অধিক গমের রুটী খাইতেন না। প্রবৃত্তিনিচয়কে দমন করিবার জন্যই তিনি সামান্য পরিমাণে সাধারণ আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। তিনি বাগ্মিপ্রবর ও সদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন।

সাংসারিক আধি ও ব্যাধিকে তিনি কখনও গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি যখন যে বস্ত্র পাইতেন, তাহাই পরিধান করিতেন, কখনও বা পাগড়ী কখনও বা চাদর মস্তকে বাঁধিতেন। তিনি দক্ষিণ বা বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে রূপার আংটি ব্যবহার করিতেন।

কখনও গাধায়, কখনও ঘোড়ায়, কখনও খচ্চরে, কখনও উটে, যখন যাহা পাইতেন তাহাতে চড়িতেন এবং কখনও বা পদব্রজে চলিতেন। তিনি দরিদ্রের সহিত আহার করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন না। তিনি ভালবাসা দ্বারা লোকের অন্তঃকরণ অধিকার করিতেন। তিনি সর্ব্বদা স্মিতমুখ থাকিতেন, কিন্তু কখনও অট্টহাস্য করিতেন না, শরিয়ত বিগর্হিত তামাসা দেখিতেন না, দাসদাসীকে যে খাদ্য ও পোষাক দিতেন, নিজেও তাহাই গ্রহণ করিতেন। তিনি ধনের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইতেন না কিংবা দারিদ্র্যপীড়নে কষ্টবোধ করিতেন না, কখনও কাহাকে গালি দিতেন না। তিনি যখন যে বিছানা পাইতেন, তাহাতেই শয়ন করিতেন। তিনি কাপড়ের কোমরবন্দ ব্যবহার করিতেন। কেহ "মোছাফেহা" (করমর্দ্দন) করিতে আসিলে তিনি প্রথমে নিজের হাত গুটাইয়া লইতেন না। লোকজন সঙ্গে থাকিলে তিনি পদবিস্তৃত করিয়া শয়ন করিতেন না। সাধারণতঃ তিনি উত্তরাভিমুখে বসিয়াই আহার করিতেন। তিনি আগন্তুকদিগকে তাঁহাদের পদ ও মর্য্যাদা অনুসারে অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি কখনও অযথা বাক্য ব্যয় করিতেন না, অল্প কথাদ্বারাই স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতেন। সঙ্গীয় ব্যক্তিগণ যে আহার করিত, তিনিও সেই আহার করিতেন। দুই অঙ্গুলি দিয়া আহার করাকে তিনি শয়তানের ভোজন বলিতেন। তিনি মাংস ভোজন ভালবাসিতেন এবং মাংসকে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য মনে করিতেন। তিনি শিকারের পক্ষীর মাংস খাইতেন বটে, কিন্তু নিজে শিকার করিতেন না। তিনি

কাঁচা পেয়াজ ও রসুন খাইতেন না। তিনি বর্ত্তন অঙ্গুলি দিয়া ভাল করিয়া মুছিয়া খাইতেন এবং আহারের পর বিশেষভাবে অঙ্গুলি লেহন করিয়া লইতেন। আহারের পূর্ব্বে বা পরে কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনা করিতেন। তিনি আহারকালে তিনবার মাত্র পানি খাইতেন এবং শেষবারে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" বলিতেন। তিনি এককালে অল্প পরিমাণ পানি পান করিতেন, পানের সময় কখনও পানীয় পাত্রে নিশ্বাস ফেলিতেন না। তিনি আহার্য্যের জন্য কোন স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার আদেশ করিতেন না, যাহা একবার আনীত হইত, তাহাই সন্তুষ্টির সহিত ভক্ষণ করিতেন। তিনি ছোট বড় সকলকে প্রথমে ছালাম করিতেন, গোলাম ও মালেক, হাব্‌শী ও তুর্কীর মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। তিনি অতি দীনহীনের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিতেন, সকলকে রহম করিতেন কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করিতেন না। তিনি স্বীয় মস্তক ঝোঁকাইয়া রাখিতেন, কাহারও উপর অভিসম্পাত করিতেন না, কখনও কুবাক্য প্রয়োগ করিতেন না, অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতেন, সকল অবস্থাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

নিষ্ঠা তাঁহার বেশ ও ন্যায়পরতা তাঁহার ভূষণ ছিল। তাঁহার শরীয়ত সত্যতা, তাঁহার মজহাব ইছলাম ও তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল—হেদায়েত (সত্যপথ প্রদর্শন)।

আঁ হজরত রাত্রিকালে আহারের পরক্ষণেই নিদ্রা যাইতে নিষেধ করিতেন। বিনা আহারে রাত্রি যাপনও অনুমোদন করিতেন না। তিনি সুস্থ ব্যক্তিকে সংক্রামক রোগ হইতে পৃথক থাকিতে আদেশ করিতেন এবং রোগীর সেবা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি সাবায়ী, ইছায়ী ও ইহুদি হইতে উপঢৌকন লইতেন এবং তাহার প্রতিদান করিতেন কিন্তু মোশ্‌রেক হইতে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন না।

তিনি সাধারণতঃ সাদা পোষাক পরিধান করিতেন। কিন্তু তাঁহার শুভ্র-অঙ্গে সবুজ পরিচ্ছদই অধিকতর শোভা পাইত। তাঁহার পরিচ্ছদ অনন্য সাধারণ ছিল না। তিনি সাধারণতঃ পায়জামা, লম্বা পিরহান ও চাদর ব্যবহার করিতেন এবং সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। তিনি কাপড় পরিধানকালে দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিতেন এবং ছাড়িবার সময় বামদিক হইতে ছাড়িতেন। তিনি পুরাতন বস্ত্র দরিদ্রকে দান করিতেন, কম্বল ও মাদুরের উপর বসিতেন ও শুইতেন, পান ও অজুর জন্য মাটীর পাত্র ব্যবহার করিতেন এবং ক্রোধ হইলে হামেশা দাড়ি স্পর্শ করিতেন। তিনি অনুচরবর্গকে কোন কাজের জন্য আদেশ দেওয়া পছন্দ করিতেন না। তাঁহার ঘর্ম্মে মেস্কের (মৃগনাভির) ঘ্রাণ পাওয়া যাইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার দাড়ি ও ছের মোবারকে মাত্র ১৭ গাছি পাকা চুল ছিল। কখনও তাহার বেশী পরিলক্ষিত হয় নাই।

অঙ্গ সৌষ্ঠব ঃ—হজরতের বক্ষদেশ সমুন্নত, প্রশস্ত ও দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল এবং তাঁহার গলদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত লোমের একটী সূক্ষ্ম রেখা ছিল। তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধদেশে নবুয়তের মোহর ছিল, তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘায়ত, হস্ততালু মখমলের ন্যায় মোলায়েম ও সুগন্ধযুক্ত ছিল। তিনি কাহারও মস্তকোপরি হাত দিয়া দোয়া করিলে, তাঁহার হাতের সুগন্ধ সমস্ত দিন তাহার মস্তকে বিরাজ করিত। তাঁহার শরীরের গঠন মধ্যম আকারের ছিল। তিনি সৌন্দর্য্যের প্রতিমা ছিলেন। তাঁহার শরীরও নাতিদীর্ঘ ও নাতিস্থূল, হস্তদ্বয় আজানুলম্বিত, ললাট প্রশস্ত ও যুগ্ম ভ্রূ-জ্যা যোজিত ছিল। তদীয় দৃষ্টি ঐশী শক্তিব্যঞ্জক, কেশরাশি দীর্ঘ, কুঞ্চিত ও শ্মশ্রুরাজি নয়ন তৃপ্তিকর, দীর্ঘ ও অর্দ্ধবক্ষঃচুম্বী ছিল। তাঁহার সেই সুক্ষ্ম শ্মশ্রুরাজি মেহেদিরাগরঞ্জিত হইয়া মুখমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিত। হস্তাঙ্গুলি সুঠাম, হস্ততালু মাংসল ও কোমল, ওষ্ঠদ্বয় রক্তাভ ও ক্ষীণ, দন্তসমষ্টি মুক্তা

সদৃশ শুভ্র ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বদনমণ্ডল গোলাকার ও সৌষ্টবযুক্ত ছিল।

কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন চপলার ন্যায় তদীয় ভ্রূভঙ্গিতে কেলি করিত। শত সহস্র লোক মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাকে সহজেই চেনা যাইত। তাঁহার বদনমণ্ডলে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই লোকে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ হইত। তাঁহার গ্রীবাদেশ দীর্ঘ ও সুগোল ছিল। তদীয় পদ্মপত্র সদৃশ পদতল সর্ব্বদা চর্ম্ম পাদুকায় শোভা পাইত। আঁ হজরত অনেক সময় কাবাগৃহ অভিমুখে মুখ করিয়া বসিতেন, তিনি প্রভু ও দাস, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের প্রভেদ করিতেন না। যখন কোন পশুর উপর আরোহণ করিতেন, তখন কোন পদ যাত্রীকে সঙ্গে লইতেন না, আরোহী লইতেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সেবা করিত, সে দাস হইলেও তিনি তাহার সেবা করিতেন। আঁ হজরতের চেহারায় স্বর্গীয় প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যাইত। এইখানে বলা আবশ্যক যে, হজরত ইছার শরীর শীর্ণ ও চেহারা মলিন ও বিবর্ণ ছিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় কোটরান্তর্গত, তাঁহার চেহারায় উৎপীড়নের আভাষ পাওয়া যাইত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইছা মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধনে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আঁ হজরত কৃতিত্বের জন্য সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন। নৈরাশ্য তাঁহার নিকট স্থান পাইত না। তাঁহার উদ্দীপনাময় বদনমণ্ডল শিষ্যবর্গকে অনুপ্রাণিত করিত। তাঁহারা স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া একাকী তাঁহার অনুগামী হইতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার সরল আদেশ সকলে হৃষ্টচিত্তে পালন করিত এবং তাঁহার জীবন সকলের আদর্শ-স্থানীয় ছিল।

আঁ হজরত সুবিশাল রাজ্যের মহারাজাধিরাজ হইয়াও অতি দীনভাবে কালাতিপাত করিতে গৌরব বোধ করিতেন। জীর্ণবস্ত্র পরিধানে তাঁহার

কোন প্রকার অবমাননা বোধ হইত না। তিনি স্বহস্তে পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করিতেন এবং স্বহস্তেই জীর্ণ পাদুকা সংস্কার করিতেন। অতিথি সেবা তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল। অনেক সময় সমস্ত আহার্য্যই অতিথিকে দান করিয়া তিনি স্বয়ং উপবাস ব্রত অবলম্বন করিতেন। কুকার্য্যের জন্য তিনি কখনও প্রতিশোধ লইতেন না। তিনি সহিষ্ণুতা গুণের আদর্শ ছিলেন। শত্রুদিগকে কষ্ট দিবার জন্য তিনি কখনও কৌশল অবলম্বন করিতেন না।

যদিও তিনি শিক্ষাগারের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, যদিও তিনি দুরন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; যদিও তিনি ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি মাতাপিতৃহীন হইয়া বাণিজ্যোপলক্ষে দূর দেশে যাতায়াতের কঠোরতা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবুও তিনি মানবের আদর্শ গুণরাজিতে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ও আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ফরাসী অধ্যাপক ছইতু আঁ হজরত সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "তিনি স্মিতমুখ, সদালাপী, স্বল্পভাষী, জ্ঞান ও বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপ্রগল্‌ভ ছিলেন। তিনি আত্মপর জ্ঞান করিতেন না, মিছকিন্‌দিগকে স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন। কোন দুষ্টকে ঘৃণা করিতেন না কিংবা বাদ্‌শাহজ্ঞানে কাহাকেও অতিরিক্ত সম্ভ্রম করিতেন না। তিনি সন্নিকটবর্ত্তী লোকদিগের অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিতেন, অশিক্ষিত লোকের রূঢ় ব্যবহারে অবিচলিত থাকিতেন; সন্মুখগত ব্যক্তি প্রস্থান না করিলে স্বয়ং প্রস্থান করিতেন না। ছাহাবাদিগের সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন, মৃত্তিকার উপর বিনা ফরাসে বসিয়া যাইতেন, নিজের বস্ত্র স্বহস্তে সেলাই করিতেন, দুস্মণ ও কাফেরের সহিত সরলভাবে মিশিতেন।

তৎসম্বন্ধে এমাম গজ্জালী এইরূপ লিখিয়াছেন:—"আঁ। হজরত গৃহ-পালিত পশু, পক্ষীদিগকে স্বয়ং আহার্য্য দান করিতেন, বকরীর দুধ দোহন করিতেন, গৃহমার্জ্জন করিতেন, খাদেমের সহিত একত্রে খাইতেন, ভৃত্যের কার্য্যে সাহায্য করিতেন। বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং ক্রয় করিয়া আনিতেন।

মিষ্টার লেন্‌পুল্ আঁ। হজরত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন:—মোহাম্মদ (দঃ) লোকদিগের ঘৃণা ও নির্য্যাতন বহুকাল যাবত অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি শিশুদিগকে অতিশয় আদর করিতেন, হাসি ও মিষ্টকথা দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা, অসাধারণ মহানুভবতা, অদম্য সাহসিকতা, সকলের সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিরুদ্ধবাদিদিগের অভিযোগ খণ্ডন ঃ—

ইসলাম সম্বন্ধে খৃষ্টান লেখকদিগের মনে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁহারা বলেন যে, আঁ হজরত রাজ্য বিস্তারের জন্য ইহুদি, খৃষ্টান, ও কোরায়েশদিগকে নিপাত করিবার জন্য এক হস্তে কোরআন্ ও অন্য হস্তে তরবারী লইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে, রাজ্যাধিকার কিংবা ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। আত্মরক্ষার জন্যই তিনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন মুষ্টিমেয় মোছলেম কোরায়েশগণ কর্ত্তৃক বারংবার উৎপীড়িত হইয়া মক্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবিসিনিয়ায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন দুর্দ্দান্ত কোরায়েশগণ নিরীহ মোছলেম-দিগকে অনুসরণ করিয়া আবিসিনিয়াধিপতিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। বহুত্ব পরিত্যাগ ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই

তাঁহারা কোরায়েশদিগের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন অপরাধ ছিল না।

যখন নিরীহ মোছলেমগণ মদিনা শরিফে পরস্পর ভ্রাতৃভাব বিস্তারের জন্য সমিতি গঠন করিয়াছিল, যখন তাহারা শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মক্কাবাসিদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল, যখন তাহারা খোদাতায়ালার এবাদতের জন্য মস্‌জিদ গৃহ প্রস্তুত করিতেছিল, যখন মদিনাবাসিগণ শান্তি স্থাপনের জন্য ইহুদিদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিল, তখন আঁ হজরত মদিনার আভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পেই সম্পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন, তাঁহার বা তাঁহার অনুচরবর্গের যুদ্ধলিপ্সা মাত্রই ছিল না কিন্তু কোরায়েশগণ মোছলেমদিগের ধর্ম্ম সমিতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার ও তাহাদের ভ্রাতৃত্ব বিস্তারের বাধা দিবার জন্য মদিনাবাসিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

সকল যুদ্ধের মূলে আত্মরক্ষা, রাজ্য বা ধর্ম্ম বিস্তার নহে ঃ—

কোরায়েশদিগের সহিত যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইগুলির মূলে আত্মরক্ষা কি বিজয়াকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা নির্ণয় করিবার সহজ পন্থা আছে। বদর, ওহোদ ও খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান বিবেচনা করিলেই উহা সহজে প্রতিপন্ন হইবে। বদর যুদ্ধক্ষেত্র মদিনা হইতে তিন দিনের পথে ও মক্কা হইতে নয় দিনের পথে অবস্থিত। ওহোদ মদিনা হইতে একদিন ও মক্কা হইতে এগার দিনের রাস্তা। খন্দক যুদ্ধ মদিনার উপরেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে সহজেই প্রমাণিত হইতেছে যে, মক্কাবাসিগণই আক্রমণকারী ও মদিনাবাসিগণ আত্মরক্ষক মাত্র ছিল।

গীবন সাহেব লিখিয়াছেন :—"স্বভাবতঃই প্রত্যেক ব্যক্তিকে শত্রুদিগের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্য অস্ত্রচালনা করিবার এবং উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার অধিকার আছে।"

মোছলেম ধর্ম্মযুদ্ধগুলি যে সমস্ত কারণে সংঘটিত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযুদ্ধগুলি ঠিক তাহার বিপরীত উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। খৃষ্টানগণ অসি সাহায্যে মূর্ত্তিপূজক ও ইহুদিগের উপর ধর্ম্ম বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য মোছলেমগণের প্রতি কোরায়েশ্ ও ইহুদিগণ অসি চালনা করায় তাঁহারা আত্মরক্ষার্থেই শত্রুর সন্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম অতুল ক্ষমতাশালী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আর ইছলামকে অতি দুর্ব্বল অবস্থায় পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত ইছলামের উপর নির্য্যাতন ছিল, সেই পর্য্যন্তই যুদ্ধ ছিল। যখনই নির্য্যাতন স্থগিত হইল, তখনই যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। কোরআনেও এই মর্ম্মে বিশেষ আদেশ আছে। "তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্য্যন্ত সত্যতার অপলাপ ঘটে, কিন্তু যদি তাহারা (মোছলেম শত্রুগণ) নিরস্ত হয়, নির্য্যাতকের (ব্যক্তিগত) বিরুদ্ধাচরণ ব্যতীত বিবাদ ক্ষান্ত কর।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নির্য্যাতক হইতে রক্ষা পাওয়াই মোছলেম ধর্ম্মযুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কারণ। আঁ হজরত ইছলাম বিস্তৃতির জন্য কোন যুদ্ধের আদেশ দেন নাই। এই কথার সত্যতা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রতিপন্ন হইবে। মূর সাহেব লিখিয়াছেন, "ছিরিয়ার সীমান্তে যখন রোমীয় মিত্ররাজবর্গ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মোহাম্মদ (দঃ) তখন বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।"

ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত ইতিহাস লিখা হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন স্থানে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চরিত্র সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা বর্ণিত আছে। ধর্ম্ম যুদ্ধের নামে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ক্ষুণ্ণ হইলেও সকলেই এক সুরে এক তানে আঁ হজরতের চরিত্র বলের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক স্বীকার করেন যে, প্রাচীন কালে রোম

সাম্রাজ্য সভ্যজগতে যে উচ্চ পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, স্পেন দেশীয় মোছলেমগণ তাহা হইতেও উচ্চতর উন্নতি শিখরে আরোহণ করত সমস্ত ভূলোকের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিল।

হজরত মহাম্মদের (দঃ) শত্রুগণ মধ্যে আবুজেহেল, আবুলাহাব ও আবুছুফিয়ান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা বিখ্যাত কোরায়েশ বংশ সম্ভূত বলিয়া বিশেষ গর্ব্বিত ছিল। দূরদেশে ব্যবসার সাহায্যে বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাহারা অপরকে নগণ্য মনে করিত। যুদ্ধ বিক্রমেও তাহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহারা হজরতের অতি নিকটবর্ত্তী স্বজন মধ্যে পরিগণিত ছিল। হজরতকে এই উৎকট পরীক্ষায় পরীক্ষিত করাই খোদাবন্দ করিমের অভিপ্রেত ছিল। এতাদৃশ ভীষণ শত্রুগণের সংস্পর্শে আসাতেই এই মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর পরিচয় প্রদানের অবসর ঘটিয়াছিল। মক্কা ও মদিনাবাসিগণের সহিত যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, সকলেরই মূলে তাহারা লিপ্ত ছিল।

জাতীয় জীবনে ইসলামের প্রভাব ঃ—

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরববাসিগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর এক একজন সর্দ্দার ছিল। যিনি বয়োবৃদ্ধ, সম্মানভাজন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই সর্দ্দার মনোনীত করা হইত। এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ চলিত।

ইসলাম গ্রহণের পর এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীসমূহ এক নব সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্দ্দার বলিয়া সম্মানিত হইতেন তাহা নহে, তাঁহাকে সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ, সৈনিক শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধি এবং ঐতিহাসিক ও পারত্রিক নেতা বলিয়া মনে করিত। ইসলাম নূতন জাতীয় ভাবের সৃষ্টি

করিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সমস্ত আরববাসীকে একজাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই নূতন জাতীয় জীবন প্রাপ্ত হইয়া আরববাসীরা ক্রমে ঝগড়া বিবাদ ও পারিবারিক কুসংস্কার পরিত্যাগ করে এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে একতাবদ্ধ হয়। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে কেবল আরব ভূমিকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি সমস্ত পৃথিবীকেই এক নব ভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।

অতীত কালেই হউক কিম্বা বর্ত্তমান কালেই হউক, এমন কোন লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই, যাঁহার জীবনের প্রত্যেক সাধারণ ব্যাপার এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল আঁ হজরতের জীবনী শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ স্বরূপ কোটী কোটী লোকের নিকট বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। সার উইলিয়ম মিউর আঁ হজরত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,"হেজরতের পূর্ব্বে মক্কা জীবন-শূন্য ও শোচনীয় অবস্থাপন্ন ছিল। উহার পরবর্ত্তী তেরটী বৎসর কি মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। সমগ্র লোক প্রতিমূর্ত্তি পূজা পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিল এবং প্রত্যাদেশ বাণী বিনা তর্কে মানিয়া লইল। অতি আগ্রহ ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত উপাসনা এবং ক্ষমার জন্য দয়ার প্রত্যাশা করিতে শিখিল। সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে, দরিদ্রকে দান করিতে, ন্যায়ানুষ্ঠান করিতে, সচেষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিল, সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান এবং তাহাদের প্রত্যেক কার্য্য তাঁহারই আদেশাধীন। স্বভাবের সর্ব্বপ্রকার দানের মধ্যে, জীবনের প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক ঘটনার পরিবর্ত্তনে তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতে লাগিল। মোহম্মদকে (দঃ) তাহাদের জীবনের পরিচালক এবং তাহাদের জীবনের নবজাত আশা পূরণের খাণ মনে করিয়া তাঁহার আদেশ এক বাক্যে পালন করিতে লাগিল।"

কেবল মাত্র আরব দেশ নহে, সমস্ত পৃথিবীর উপর আঁ হজরতের শিক্ষার প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি সমস্ত জাতিকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে গ্রথিত করিয়াছিলেন। সকল জাতি সকল শ্রেণী সকল সম্প্রদায় তাঁহার নিকট সম অধিকার পাইত। বর্ত্তমান কালের আমেরিকার প্রজাতন্ত্র যেরূপ বর্ণভেদ অনুসারে আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সাধারণতন্ত্রী খৃষ্টীয় রাজ্যসমূহ তাহাদের স্বজাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির জন্য যেরূপ বিভিন্ন আইন কানুন, বিভিন্ন অধিকার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে যেরূপ মুক্তি এক জাতির জন্য সীমাবিশিষ্ট করা হইয়াছে, আঁ হজরত সেরূপ বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন প্রথা প্রণয়ন করেন নাই। ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইছলাম অনুসারে সর্ব্ববর্ণ,সর্ব্বজাতি, সর্ব্বসমাজের লোক ও সর্ব্ব ধর্ম্মের পন্থি, রাজা, প্রজা, ধনী নির্ধন সকলেই সৎকার্য্য করিলেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট হইতে পুরস্কারের আশা করিতে পারিত, বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল না। এই জন্যই আঁ হজরত 'রাহমোতেল্লিল আলামিন' নামে আখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই বুদ্ধি ও গুণ বলে এক শত বৎসরের মধ্যে মোছলেম রাজ্য এইরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। যাহা রোমক রাজ্য ৮০০ আট শত বৎসর মধ্যে সংঘটন করিতে পারে নাই।

বৃটেনরাজ ওফ্‌ফা কর্ত্তৃক প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা ঃ—

ইসলামের সভ্যতা অষ্টম শতাব্দীতেও বৃটনরাজ 'ওফ্‌ফা' বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত স্বর্ণমুদ্রা লিপিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তিনি ৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মধ্য বৃটেনের অধীশ্বর ছিলেন। তৎকালীন প্রবর্ত্তিত রাজমুদ্রার অনুলিপির নকল পার্শ্বে প্রদত্ত হইল। উহার এক পৃষ্ঠায় কলেমা
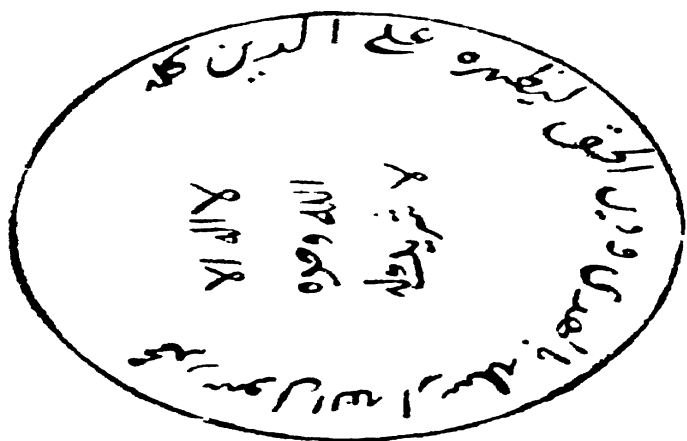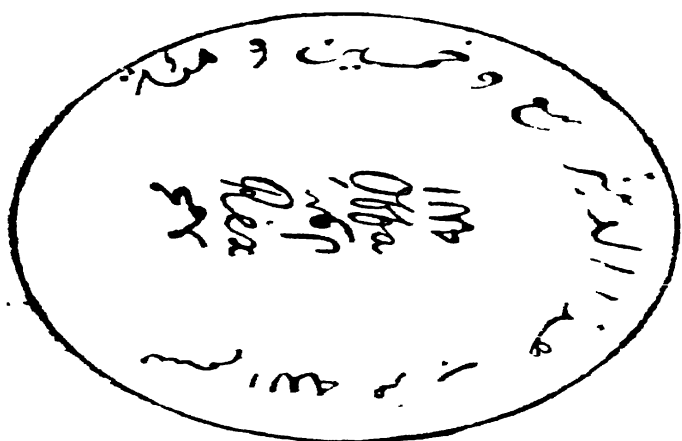
শাহাদৎ ও কোর্‌আন শরিফের আয়েত খোদিত আছে এবং অপর পৃষ্ঠায় আল্লার প্রেরিত রছুলের নাম, রাজার নাম, মুদ্রা প্রকাশের সন লিখিত আছে।

বৃটেনরাজ ওফ্‌ফা প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার প্রতিকৃতি।

১ম চিত্র :—মুদ্রার সম্মুখভাগ।

মধ্যলিপির অনুবাদ :—আল্লা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি এক এবং উপমাহীন।

পার্শ্বলিপির অনুবাদ :—মোহাম্মদ আল্লার রছুল। আল্লা তাঁহাকে হেদায়েত এবং সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তিনি অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের উপর ইহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

২য় চিত্র :—মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগ।

মধ্যলিপির অনুবাদ :—আল্লার রছুল মোহাম্মদ [ইহার মধ্যে সম্রাট ওফ্‌ফার নামাঙ্কিত আছে]

পার্শ্বলিপির অনুবাদ :—বিছমিল্লাহ, এই দিনার ১৫৭ (হিজরী) সালে খোদিত হইল।

ইসলামের শিক্ষা—নৈষ্ঠিক ও আধ্যাত্মিক। ইহুদি ও খৃষ্টধর্ম্মের সহিত ইসলামের তুলনা ঃ—

হজরত মুছার প্রচার ব্যবহার-নীতি বিষয়ক ছিল। তিনি কর্ম্ম-নীতিও প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা নৈষ্ঠিক ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে তাঁহার বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে শিক্ষা দিতেন। যে পর্য্যন্ত মানব তৎপ্রচারিত বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন না করিত, সে পর্য্যন্ত মুক্তির আশা ছিল না।

হজরত ইছার (আঃ) শিক্ষা নৈষ্ঠিক ছিল না। জল দীক্ষাই তাঁহার একমাত্র নৈষ্ঠিক শিক্ষা ছিল। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই মুক্তি স্থির নিশ্চয়, ইহাই তাঁহার শিক্ষা ছিল। যীশুখৃষ্ট সমস্ত শিষ্যদিগের পাপের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহার মতে একবার খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সারাজীবন পাপে কলুষিত হইলেও মুক্তির সংশয় নাই। সন্ন্যাস ব্রত তাঁহার প্রধান আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রধানতম পন্থা। বুদ্ধের ন্যায় তিনি সাংসারিক সম্বন্ধ অজ্ঞতার কারণ মনে করিতেন। হজরত মুছা (আঃ) সংসার বিধি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; হজরত ইছা সংসার ত্যাগই বিশেষ প্রশংসনীয় মনে করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যে দীক্ষাতে মুক্তির কারণ আরোপ করে, মোছলেমগণ হজরত ইছাকে এইরূপ শিক্ষাদাতা মনে করে না। যাহা হউক, আঁ হজরত হজরত মুছা ও হজরত ইছা উভয়ের শিক্ষার মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। হজরত মুছার ন্যায় তিনি মনে করিতেন না যে, কেবল একই সম্প্রদায় খোদার বিশেষ মনোনীত এবং তাহাদের জন্যই মুক্তি নির্দ্ধারিত। তিনি জাগতিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র মানব জাতির মুক্তির পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি হজরত ইছার

ন্যায় দীক্ষার মূলমন্ত্রের উপর মুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহার মতে সৎকার্য্যই মুক্তির প্রধান উপায়। তিনি শরীয়ত (নৈষ্ঠিক বিধি) প্রণয়ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহার ব্যতিক্রমের অনুমতিও দিয়াছেন। তিনি কর্ম্মকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, একের পাপের জন্য অপরে মুক্তি প্রদান করিতে অক্ষম। প্রত্যেক ব্যক্তি (গরীব ও মহৎ) স্বীয় কার্য্যের জন্য দায়ী। কোরআন নামাজের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছ সত্য, কিন্তু তৎসহ দান এবং খয়রাতের বিধিও প্রণয়ন করিয়াছে। ইছলামে ইমান ও সৎকার্য্য উভয়ই সমভাবে আবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ইছলাম সন্ন্যাস ব্রতের আদেশ দেয় না। ইছলাম কর্ম্মব্রতের পক্ষপাতী।

হজরত ইছা ইহুদিদিগের কুসংস্কারগুলি অপনোদন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের বাহ্যিক ধর্ম্মভাবকে নিন্দা করিতেন এবং হৃদয়ের পবিত্রতাকে বিশেষ স্থান প্রদান করিতেন। তিনি ইহুদি ব্যতীত অপর কাহাকেও স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। যে পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই, যেহেতু ইহুদি ব্যতীত অপর কাহারও খৃষ্টধর্ম্মে প্রবেশ অধিকার ছিল না। তাঁহার শিষ্যগণের সময় এই প্রথার ব্যতিক্রম হয়। কোরআন জাতি বা ধনকে বিশেষত্ব দেয় নাই। আল্লার নিকট কর্ত্তব্য সাধনই একমাত্র প্রশংসনীয়।

যীশুখৃষ্ট স্বয়ং কখনও ঈশ্বরত্ব দাবী করেন নাই, বাইবেলে লিখিত আছে, "আমাকে কেন কল্যাণময় বল? ঈশ্বর ব্যতীত কেহই কল্যাণময় নহে"—মথি—১৯—১৭।

"তাহারা জানুক যে তুমি কেবল মাত্র সত্য প্রভু এবং যীশুখৃষ্ট তোমার প্রেরিত" (জন্ ১৭—৩)।

"তোমরা মনে করিও না যে, আমি কোন পয়গম্বর বা প্রচলিত বিধি নষ্ট করিতে আসিয়াছি; আমি বিনাশ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূরণ করিতে আসিয়াছি।"

উদ্ধৃত অংশসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র বলিয়া দাবী করেন নাই। সমস্ত মানব যে অর্থে ঈশ্বর পুত্র, তিনিও সেই অর্থে ঈশ্বর পুত্র ছিলেন। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাকে অযথা ঈশ্বর পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিত। পাছে মোছলেমদিগের ঐরূপ ধারণা জন্মে, সেইজন্য আঁ হজরত শিষ্যমণ্ডলীকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেন।

তিনি আপনাকে প্রেরিত পুরুষ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, "আমাকে কোন পয়গম্বর হইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। খৃষ্টানগণ মেরী পুত্র যীশুখৃষ্টকে যেরূপ অতিরিক্ত প্রশংসা প্রদান করে, আমাকে সেইরূপ প্রদান করিও না। আমি কেবল মাত্র মহাপ্রভুর জনৈক দাস, অতএব আমাকে তাঁহার দাস ও বার্ত্তাবহ মনে করিবে।"

একদা জনৈক লোক আঁ হজরতকে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্ট মানব বলিয়া আহ্বান করিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এইরূপ উপাধি হজরত ইব্রাহিমকে অধিকতর পরিমাণে সাজিত।"

ইসলামের প্রাধান্য ও সার্ব্বভৌমিকতাঃ—

সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ইসলামের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে। আর কোন ধর্ম্ম এইরূপ একতা ও ভ্রাতৃবৎসলতা যুগযুগান্তর একভাবে সংরক্ষণ করিতে পারে নাই। ইসলামের তেজ শত শত বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ অমিত ছিল, এখনও সেইরূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হজরত মোহম্মদ (দঃ) কেবল মাত্র আরববাসীকেই সত্য শিক্ষা দিয়াই বিরত হন নাই, তিনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সত্য ধর্ম্ম ঘোষণা

করিয়াছিলেন। তাঁহারই তেইশ-বৎসর ব্যাপী ঘোষণার ফলে আজ ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বত্রই ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তি অনুভূত হইতেছে। ইউরোপের যে সমস্ত ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্মে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ক্রমে ইসলাম ধর্ম্মের প্রাধান্য অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন। ইসলামের ভ্রাতৃভাব, ইসলামের একতা, ইসলামের জাতীয়তা, ইসলামের সার্ব্বভৌম সত্যতা, ইসলামের দান ও ইসলামের পরমার্থবাদ সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছে। যে ফরাসীরা পুরুষকারের জন্য প্রসিদ্ধ এবং পার্থিব রাজত্বের জন্য সমস্ত সুখ বিলাস বাসনা বলিদান করিতে অগ্রণী, তাহারাও ইসলামের সারবর্ত্তা স্বীকার করিতেছে। দূরবর্ত্তী আফ্রিকার অর্দ্ধ শিক্ষিত অধিবাসীরাও ইসলামের শক্তিবলে আজ সভ্যজগতে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার এমনই ঐশ্বরিক শক্তি যে, ইহার স্পর্শে অনুন্নত, অসভ্য, ব্যভিচারী সকলেই কুসংস্কার পরিত্যাগ করত এক নব শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। এই ইসলাম এক সময় স্পেনকে উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিল। যে আফ্রিকা ডার্ককন্টিনেণ্ট (অন্ধকার মহাদেশ) বলিয়া অভিহিত ছিল, এই ইসলামের বলে সেই মহাদেশও আজ গর্ব্বিত।

সমুদ্র কুলবর্ত্তী যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশও ইসলামের সেবা করিতেছে। দুর্দ্দান্ত রুষ ও অহিফেনসেবী চীনও ইসলামের সাহায্যে কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ধরাবক্ষে স্বীয় শক্তি, জ্ঞান, ও শিল্পের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের অপর পারস্থ আমেরিকাতেও ইসলাম-রশ্মি প্রতিফলিত হইয়াছে। সেখানেও এক নূতন আলোড়ন উপস্থিত হইয়া সমস্ত মহাদেশকে তোলপাড় করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া আশা করা যায়, অচিরেই ইসলাম সার্ব্বভৌম ধর্ম্মে পরিণত হইবে। সত্য কতদিন লুকায়িত হইয়া থাকিতে পারে?

যিনি সত্যময় তাঁহার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যতই সত্যের স্রোতে বাধা পড়ে, ততই সত্যের মাহাত্ম্য ভাস্বর হইয়া উঠে। ইহাও তাঁহারই লীলা। ইসলামে যে সত্য ও সনাতন, ইসলামই যে একমাত্র কার্য্যকরী ধর্ম্ম, লোকে অগৌণে তাহা উপলব্ধি করিবে।

ইসলাম সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয় ঃ—

আঁ হজরত সমস্ত পৃথিবীর উপকারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংশ করিয়া বৈদিক হিন্দুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে মহৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি কুপ্রবৃত্তির দমন শিক্ষা দিয়া বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ নীতির পোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়া ইউনিটেরিয়ানের (ঐক্যবাদী) সমর্থন করিয়াছিলেন। এক কথায় তিনি কোরআন সাহায্যে সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বতথ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। কোরআনে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যাদিষ্ট সকল ধর্ম্মের সত্যতা সঙ্কলিত আছে। হজরত মোহম্মদের (দঃ) প্রতি যে প্রত্যাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য পয়গম্বরদিগের প্রতি যে সমস্ত প্রত্যাদেশ প্রেরিত হইয়াছিল, মোসলমান তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। আঁ হজরত, 'হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) ধর্ম্ম' সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বরং সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির জন্য বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইসলামের উজ্জ্বলরশ্মি ব্যতীত অনেক বর্ব্বর জাতি চিরতমসাচ্ছন্ন থাকিত।

হজরত মোহম্মদের (দঃ) জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অতুলনীয় আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহাতে দয়া, দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা, বিনয়, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃবৎসলতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণাবলী পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি একদিকে শরিয়তের কলেবর পুষ্ট করিতেন, অপর

আঁ হজরতের জীবন শরীয়ত ও মারেফতের সম্মিলন

দিকে হাকিকতের সঞ্জীবনী শক্তিদ্বারা উহাকে অনুপ্রাণিত করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নিবিড় কানন, উচ্চ পর্ব্বত শিখর ও সমুজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া জগৎপাতার কত কি রহস্য ভেদ করিয়াছেন। যৌবনের প্রারম্ভে "গারে হেরার" গভীর কন্দরে, নিশীথ রাত্রে একাকী ঘোর নির্জ্জনতার মধ্যে কত কি নবতথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন এবং প্রৌঢ়ে সংসারের সংগ্রাম ক্ষেত্রের কার্য্যাবসানে নামাজাদি সমাপনান্তে একাকী অদৃশ্যে কত কি কঠোর ব্রত পালন করিয়া আপনাকে প্রিয়তমের প্রিয়তম করিয়াছিলেন, তাহা যদি পাঠক একবার চিন্তারত চিত্তে বুঝিয়া দেখেন, তবে সেই মহাপুরুষের অলৌকিক পুরুষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

বর্ব্বর আরবের উপযুক্ত সংস্কারক

তের শত বৎসর পূর্ব্বে আরবদেশ সমস্ত ভূমণ্ডলের মধ্যে অশিক্ষিত ও অসভ্যস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। সেখানে ছিল কন্যা হত্যা, বহু বিবাহ, ব্যভিচার, পাপাসক্তি, আত্মকলহ ও ধনাভাব। উৎপীড়িত লোকেরা পাহাড় পর্ব্বতের কন্দরে লুক্কায়িত থাকিত। তাহারা শুষ্ক খর্জ্জুর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বিস্তৃত মরুভূমি সূর্য্যের প্রখর কিরণে উত্তপ্ত হইয়া ব্যসনপ্রিয় লোকদিগের ভীতি উৎপাদন করিত। সকলেই স্ব স্ব স্থাপিত প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিত এবং স্ব স্ব প্রতিমূর্ত্তির নাম লইয়া অতি বীভৎস কার্য্যে জীবন যাপন করিত। তাহারা মনে করিত, যতই কেন উৎকট পাপ কার্য্যে নিযুক্ত হউক না, প্রধান প্রধান প্রতিমূর্ত্তি তাহাদের পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। জগৎপাতা এই স্থানকেই সর্ব্ব সত্য শিক্ষা দিবার জন্য প্রকৃষ্ট নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। ইহাও সর্ব্বশক্তিমানের বিশেষ অনুগ্রহের পরিচায়ক। এই

ঘোর তমসাচ্ছন্ন স্থানকে পূত করিতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ন্যায় মহাপুরুষেরই প্রয়োজন ছিল। এইরূপ শাসক ও এইরূপ প্রতিনিধি ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে আরবের ন্যায় অসভ্য স্থানকে উন্নতির উচ্চশিখরে উন্নীত করা সম্ভবপর ছিল না। যে আরবী ভাষা তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে ঘৃণ্য ছিল, আজ সেই ভাষা কোর্‌আনের প্রভাবে পবিত্রতম স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কোর্‌আন সম্পন্ন মোছলমানের উপর জাকাতের আদেশ দিয়া দারিদ্র্য নিবারণের এক মহৎ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে; ইউরোপীয় 'সম্যবাদী' ও 'সমষ্টিবাদী'দিগের ন্যায় উপার্জ্জিত সকল অর্থ সমভাবে বিতরণের ব্যবস্থা প্রচার করিয়া ধনী দরিদ্র সকলকে একাকারে পরিণত করিতে আদেশ দেয় নাই। খোদাতালা এন্‌ছানকে বিভিন্নস্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলকে সমঅবস্থাপন্ন করিলে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইত না। ইছলামের আদেশ পালন করিলে অর্থনীতি, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে। যদি সকল ধর্ম্মই ইসলামের আদেশ পালন করিত, তবে আজ দেশের এইরূপ দুঃস্থতা কদাপি পরিদৃষ্ট হইত না। বর্ত্তমান কালে সভ্য জগৎ যাহার জন্য সর্ব্বদা মস্তিষ্ক চালনা করিতেছে, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইসলাম তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। প্রাচীনকালে যে সকল বিধির মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই, বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার সত্য ক্রমেই স্বীকার করিতেছেন। যতই মানবের জ্ঞান, সভ্যতা ও দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত হইবে, ততই ইসলামের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকিবে।

কোরআন পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়া তওরাৎ ও ইঞ্জিল হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তওরাতে পুনর্ব্বিচারের কথা বর্ণিত নাই, পাপ পুণ্যের ফলাফল উল্লিখিত নাই। খৃষ্টানগণ পোপকে হজরত ইছার প্রতিনিধি মনে করিয়া সম্মান করে, আর বিশ্বাস

করে যে, পোপ স্বর্গ ও নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন ও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন। এইরূপ বিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক, তাহা বোধ হয়, কোন সুধীকে বলিতে হইবে না।

ইসলামে যাজকশ্রেণী অবর্ত্তমান ঃ—প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম বিস্তারের জন্যই এক একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট আছে, দেখা যায়।

খৃষ্টধর্ম্মের জন্য পাদরী ও বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য ভিক্ষু প্রভৃতি নিয়োজিত হইয়া থাকেন, কিন্তু মোছলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোন বিশিষ্ট শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট নাই। মোছলেম ধর্ম্মের সারল্য, সত্যতা ও ভ্রাতৃভাব অন্য সকল ধর্ম্ম হইতেই প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ঐ সমস্তগুণই ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তারের একমাত্র মূলীভূত কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্য মোসলেমদিগের মধ্যে অস্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা তাহাদের সকলকেই অনুপ্রাণিত করে। এই মহাশক্তিশালী ধর্ম্ম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। আজ সমস্ত মহাদেশে অন্যূন ১৩,৩,০০০,০০০ লোক মোসলেম ধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম সর্ব্বপ্রথমে আরবদেশে প্রচারিত হয়। উহারই ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে আরব দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতি এক সূত্রে গ্রথিত হয় এবং ইসলাম নব বলে বলীয়ান্ হইয়া ছিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ঈজিপ্ট, উত্তর আফ্রিকা ও পারশ্যদেশে বিস্তার লাভ করে। বর্ত্তমান সময় ইসলাম ধর্ম্ম মরোক্কো হইতে জাঞ্জিবার পর্য্যন্ত, সাইবিরিয়া হইতে চীন পর্য্যন্ত, বস্‌নিয়া হইতে চায়না পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অনেক দেশে বিধর্ম্মী পরিবেষ্টিত হইয়াও মুষ্টিমেয় মোসলেম ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উহার প্রাধান্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আজকাল ইংলণ্ড, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও কেপ্‌কলনি প্রভৃতি স্থানেও মোসলমান পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামের সত্যতা ও সারল্যই উহার এই বিরাট বিস্তৃতির হেতু।

মোসলেমদিগের নিকট জগতের ঋণ।

মানুষের মনের মধ্যে যত প্রকার ভাব ও কল্পনার উদয় হয়, আরবেরা তাহার প্রত্যেকটিই সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দুনিয়ার সকল জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই কবির সংখ্যা অধিকতর বলিয়া আরবেরা গর্ব্ব করিয়াছেন। বিজ্ঞানের গবেষণায় আরবদের বাহাদুরী এই যে, তাঁহারা ইউরোপীয় গ্রীকদের পথানুসরণ না করিয়া বরং সেকান্দরী গ্রীকদিগকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। আরবেরা সম্যকরূপেই বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল কল্পনা বলে বিজ্ঞানের কোন উন্নতি হইবে না, তাই তাঁহারা প্রকৃতির বহু নিগূঢ় তত্ত্ব হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রকে তাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উপকরণ বলিয়া মনে করিতেন। যন্ত্রবিজ্ঞান, তরল পদার্থ বিজ্ঞান এবং দৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরব মনীষীরা বহু গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রাদি সাহায্যে তাহার প্রমাণ পরীক্ষাদিও সম্পন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। এই ভাবেই আরবেরা রসায়ন শাস্ত্রের প্রভু হইয়া পড়েন এবং এই রসায়ন শাস্ত্রের প্রমাণ বিশ্লেষণাদি করিতে যাইয়াই তাঁহারা বহুবিধ যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গবেষণাতেও তাঁহারা কোয়াড্রাণ্ট্‌স, এষ্ট্রলেব প্রভৃতি বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছেন। বাগদাদ, স্পেন ও সমরকন্দে তাঁহারা গভীর গবেষণার পর বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই সকল তালিকার সাহায্যেই আরবেরা জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির অসামান্য উৎকর্ষ সাধন করেন এবং এল্‌জেব্রা বা বীজগণিতের জন্মদান করেন।

সাম্রাজ্য জুড়িয়া সাধারণ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে আরবজাতি লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। খলিফা আল মামুন উষ্ট্র

বোঝাই করিয়া পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বাগদাদে লইয়া যান। গ্রীক সম্রাট তৃতীয় মাইকেলের সঙ্গে খলিফা মামুন যে সন্ধি করেন, তাহাতে তিনি কনষ্টান্টিনোপলের একটী বৃহৎ পুস্তকাগার দাবী করেন। এই ভাবে খলিফা মামুন যে সকল অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টলেমীর খগোল বিষয়ক একখানি পুস্তকও ছিল। এই গ্রন্থের "আলমাজেস্ত" নাম দিয়া তিনি তাহা আরবীতে অনুদিত করাইয়াছিলেন। কায়রোর ফাতেমীয় লাইব্রেরীতে এক লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেক খানিই সুচারুরূপে বাধান ও সুন্দররূপে নামাঙ্কিত করা ছিল। এই এক লক্ষ গ্রন্থের মধ্যে কেবল জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধেই সাড়ে ছয় হাজার গ্রন্থ ছিল। কায়রোর ছাত্রদিগকে এই সকল গ্রন্থ পড়িতে দেওয়ার নিয়ম ছিল। স্পেনীয় খলিফার পুস্তকাগারে ছয় লক্ষ পুস্তক ছিল। চুয়াল্লিশ খানা গ্রন্থে উক্ত ছয় লক্ষ পুস্তকের নামের তালিকা লিখিত ছিল। উক্ত বৃহৎ পুস্তকাগার ব্যতীত আন্দালুসিয়ায় আরও সত্তরটী বিরাট আকারের সাধারণ ব্যক্তিগত পুস্তকাগারও অবস্থিত ছিল।

প্রত্যেক বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকাগারের একটী করিয়া অনুবাদ এবং অনুলিখন বিভাগ থাকিত। অধ্যাপকগণ যাহাতে যথেষ্ট গবেষণা করেন এবং মৌলিক গ্রন্থাদি রচনা করেন, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। প্রত্যেক খলিফার এক বা ততোধিক নিজস্ব ঐতিহাসিক থাকিত। "একাধিক সহস্র রজনীর আখ্যায়িকা" এবং তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থ অদ্যাপি ছারাছেনগণের বহুবিস্তারি, কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু বিষয়ে আরবীয় পণ্ডিতগণ পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, যথা—ইতিহাস, দর্শন, ব্যবস্থাশাস্ত্র, বিজ্ঞান, রাজনীতি, বিখ্যাত মানব, অশ্ব এবং উষ্ট্রের জীবনী ইত্যাদি।

এই সকল বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশে কোন প্রকার রাজকীয় বাধা ছিল না। কেবল মাত্র শেষ যুগে এইরূপ বিধি প্রচলিত হইয়াছিল যে, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রচার করিতে হইলে রাজকীয় অনুমতি প্রয়োজন হইবে। ভাষার অভিধান এবং ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি নানা জাতীয় অভিধানের অভাব ছিল না। মোহম্মদ আবু আব্দুল্লা কৃত "সর্ব্ব বিজ্ঞানের অভিধান" প্রমুখ আভিধানিক সংক্ষিপ্তসারের প্রচুর প্রচলন ছিল। আরবগণ কাগজ প্রস্তুত প্রণালী অবগত ছিলেন এবং পুস্তকে যে কাগজ ও কালী ব্যবহার করিতেন, সেগুলিকে সুন্দর এবং দীর্ঘস্থায়ী করিবার সুব্যবস্থা অবগত ছিলেন। গ্রন্থের বাহ্যিক অবয়বের সৌন্দর্য্যসাধনের জন্যও চেষ্টা ছিল। আরবগণ নানাপ্রকার সুত্রবস্ত্র প্রস্তুত,কাচ নির্ম্মাণ এবং চারু শিল্পে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। উদ্যান বিদ্যা এবং ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির কৌশলও ইহারা সম্যক্ অবগত ছিলেন।

ছারাছেন সাম্রাজ্যের সকল অংশই কলেজে পরিপূর্ণ ছিল। মঙ্গোলিয়া, তাতার, পারশ্য, মেসোপোটেমিয়া, শাম, মেছের, উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো, ফেজ ও স্পেন প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বছরা, কুফা, বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয়গুলি মোসলেম শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। ইতিহাসবিশ্রুত প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য অপেক্ষা তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে সমরকন্দে কলেজ ও মানমন্দির এবং অপর প্রান্তে স্পেন দেশের সুবিখ্যাত "জিরোল্ডা" অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক গিবন মোসলেমগণের বিদ্যানুরাগের এই প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন প্রাদেশিক আমীরগণও সম্রাটের ন্যায় বিদ্যানুরাগে আনন্দ এবং সম্মান বোধ করিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে এই বিষয়ে

রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত। এইরূপে সমরকন্দ ও বোখারা হইতে ফেজ্‌ এবং কর্ডোভা পর্য্যন্ত পরম উৎসাহের সহিত বিজ্ঞান এবং দর্শন ইত্যাদির আলোচনা হইত। জনৈক সোলতানের প্রধান মন্ত্রী দুই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে বাগ্দাদে একটী কলেজ স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনকল্পে বাৎসরিক পঞ্চদশ সহস্র দিনার আয়ের একটী সম্পত্তি দান করেন। অবস্থা ও পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে এখানে এককালে ছয় সহস্র শিক্ষার্থী বিদ্যানুশীলন করিত। দরিদ্র ছাত্রগণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শিত হইত এবং শিক্ষকমণ্ডলী জ্ঞান ও গবেষণার জন্য সম্যক্‌রূপে পুরস্কৃত হইতেন। নগরে যে সকল আরবী পুস্তক লিপিবদ্ধ হইত, প্রতি নগরের কৌতূহলী এবং ধনশালী ব্যক্তিবর্গ সেগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন।

এই সকল বিদ্যামন্দিরের পরিচালন ভার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত হইত। ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতিও এই সকল পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। পাণ্ডিত্য এবং ভূয়োদর্শন বিবেচনা করিয়াই পদ পূর্ণ করা হইত। খলিফা আল মামুন বলিতেন, "মানবের জ্ঞানবিকাশের জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করেন, তাঁহারা আল্লাতালার প্রকৃত সেবক এবং তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। এই সকল মহাপুরুষ পৃথিবীর জ্যোতিঃ স্বরূপ, তাঁহাদের অভাবে সমগ্র পৃথিবী পুনরায় অন্ধকার এবং মুর্খতা গহ্বরে নিমজ্জিত হইবে।"

কায়রোর মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় অন্যান্য সকল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণকেই কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত এবং তৎপরে তাহাদিগকে চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য অনুজ্ঞাপত্র প্রদত্ত হইত। ইউরোপের সর্ব্বপ্রথম মেডিক্যাল কলেজ ইটালীতে ছ্যালার্ণো নগরে ছারাছেনগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্বপ্রথম মানমন্দিরও তাঁহাদেরই

দ্বারা স্পেনের ছেভিল নগরে নির্ম্মিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ অঙ্ক ও রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত আবু মুছা জাফর (যাহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জিবার নামে অভিহিত করেন) এই মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্যের পরিচালনা করেন। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। মূরগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইলে স্পেনীয় খৃষ্টানগণ কি উদ্দেশ্যে এই মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কি জন্যই বা ইহা ব্যবহৃত হইত, বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে ঘণ্টাগৃহে পরিণত করে।

পাটিগণিত শাস্ত্রের দশমিক প্রণালী ছারাছেনগণ প্রথম প্রণয়ন করেন। এই প্রণালী দ্বারা যাবতীয় সংখ্যামাত্র ১০টি বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং প্রত্যেক বর্ণের দুইপ্রকার মান (একটি নিজস্ব, অপরটি স্থানীয়) নির্ণীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গণনা এবং হিসাব কার্য্য অতি সহজে এবং সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। পণ্ডিত ডিউ ক্যাণ্টাস বীজগণিতের যে সামান্য বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিয়া ছারাছেনগণ বীজগণিত শাস্ত্র প্রস্তুত করেন। ইহাকে সার্ব্বভৌমিক পাটিগণিত আখ্যা দান করা যাইতে পারে, কারণ এতদ্দ্বারা সর্ব্বজাতীয় সংখ্যার পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দুই সুব্যবহিত সংখ্যার মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় সংখ্যা অতি সহজে নির্ণয় করা যায়, মোহাম্মদ-বিন-মুছা চাতুরাস্রিক সমীকরণ (Quadratic equation) এবং ওমর-বেন-ইব্রাহিম ঘন সমীকরণ (Cubic equation) আবিষ্কার করেন। পণ্ডিতপ্রবর আল্‌বাতানি ত্রিকোণমিতিশাস্ত্রে "জ্যা" র পরিবর্ত্তে সাইন ও কোসাইন ব্যবহার প্রচলন করেন এবং তাঁহারই উদ্যমে ত্রিকোণমিতি একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাস্ত্রে উন্নমিত হয়। চাতুরাস্রিক সমীকরণের আবিষ্কর্ত্তা মুছা মণ্ডল-ত্রিকোণমিতি (Spherical Trigonometry) সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জরিপ সম্বন্ধে আল-বাগদাদী যে গ্রন্থ প্রণয়ন

করেন, তদ্দৃষ্টে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি ইউক্লিডের নষ্ট জ্যামিতি শাস্ত্র পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। মোসলেমগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তর্গত যাবতীয় নক্ষত্রের তালিকা এবং মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা জগদ্বাসীকে এক অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। বৃহৎ নক্ষত্রগুলি আরবী নাম ধারণ করিয়া অদ্যাপি মোছলেম পণ্ডিতগণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য, পৃথিবীর আয়তন ফল, সৌরকলঙ্কের আবিষ্কার, সূর্য্যকক্ষের উৎকেন্দ্রতা, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতার হ্রাসের হার ইত্যাদি তাঁহারাই সূক্ষ্মগণনা দ্বারা সর্ব্বপ্রথম নির্ভুলরূপে নির্ণয় করেন। বৈজ্ঞানিক ল্যাপলেছ (Laplace) আলবাতানির "নক্ষত্র বিজ্ঞান" পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। খলিফা আল হাকেমের জ্যোতিষিক ভবনে ইউনুছের কৃতিত্ব বর্ণনা কালে এই পাশ্চাত্য পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "সৌরজগতের পরিবর্ত্তনের বহুত্বব্যাপী ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণের ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করিয়া মোসলেমগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার অভাবে এই শাস্ত্র কিছুতেই ইহার বর্ত্তমান উচ্চমার্গে উপনীত হইতে পারিত না।" জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানাপ্রকার যন্ত্রও আরবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সময় নিরূপণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘটিকা যন্ত্র এবং ভারযুক্ত দোলকের ব্যবহার ইহাদেরই দ্বারা উদ্ভাবিত হয়।

রসায়ন শাস্ত্রের Sulphuric acid, nitric acid, alcohol ইত্যাদি মোসলেমগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং রসায়ন সাহায্যে তাঁহারা নানাপ্রকার রোগ নিবারক ঔষধ প্রস্তুত করেন।

হাছান প্রমুখ পণ্ডিতগণ গতিশক্তি গণিতের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। মাধ্যাকর্ষণ, পতনশীল পদার্থের গতি নিয়ম এবং যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহারপ্রণালী তিনিই আবিষ্কার করেন। ভারতীয় পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যেরও

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইনি মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। জলে স্থাপিত হইলে পদার্থ সমূহের গুরুত্বের কিপ্রকার তারতম্য হয় এবং জলের তুলনায় অন্যান্য পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বই বা কি পরিমাণ এবং কোন শ্রেণীর পদার্থ কোন সময়ে জলে ভাসমান বা মর্জ্জমান হয়, এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত বহুগ্রন্থ মোসলেমগণ কর্ত্তৃক রচিত হয়। প্রাচীন গ্রীকপণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে, জীবের চক্ষু হইতে এক প্রকার আলোক নির্গত হইয়া কোন বস্তুর উপর পতিত হইলে সেই বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। পণ্ডিতপ্রবর হাছান এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেন এবং প্রকৃত দর্শনানুভূতির মূলীভূত কারণ যে, চক্ষুর জ্যোতিঃ নয়, পরন্তু দৃষ্ট বস্তুর অঙ্গ নিঃসৃত জ্যোতিঃ এই অভ্রান্ত তথ্যের অবতারণা করেন। বায়ু মধ্যে প্রবেশ করিলে আলোক রশ্মি যে বক্রতা প্রাপ্ত হয়, এই তত্ত্বও তিনি প্রথম প্রচার করেন। বর্ত্তমান জগত জ্ঞান ও সভ্যতার জন্য ঋণ স্বীকার করিলে বাস্তবিক মোসলেমগণই উত্তমর্ণের গৌরব প্রাপ্তির অধিকারী—লাটিন জাতি নহে।

মোসলেম পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হইতে কয়েক জনের নামোল্লেখ এই খানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চিকিৎসা এবং দর্শন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন—মহাত্মা আবু-আলী-ইবনে-ছিনা। কর্ডোভার এভেরোছ (Averroes) পণ্ডিত Aristotle এর দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করেন এবং তাঁহার সকল তত্ত্বের কোরআন সম্মত ব্যাখ্যা বাহির করেন। সৌর কলঙ্কও তাঁহারই আবিষ্ক্রিয়া। রসায়ণ শাস্ত্রে আবু-মুছা-জাফরের পাণ্ডিত্য সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য রাসায়ণিক Priestly এবং Louoisier অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। আবু-ওছমান প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। আল-বেরুনি সুদূর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া মণিমুক্তা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করেন। উদ্ভিদবিদ্যা আল-বাথার এবং আল আব্বাছের হস্তে যথেষ্ট

উন্নতি লাভ করে। সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের পর্য্যবেক্ষণ এবং নমুনা সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আলবাথার সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। মহা পণ্ডিত গাজ্জালির জ্ঞানের গভীরতা সকল জাতি সমভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। আলহাজনকে আরবের নিউটন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সমস্ত মহাপণ্ডিত মরিয়াও জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

ধর্ম্ম বিস্তারে বলপ্রয়োগের অবর্ত্তমানতা কোর্‌আন্‌ হইতে প্রতিপাদিত,—

মোছলেম-ধর্ম্ম যে অসি সাহায্যে প্রচারিত হয় নাই, তাহার ভুয়সী প্রমাণ কোর্‌আন্‌ মজিদ হইতে উদ্ধৃত করা যায়। নিম্নে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

"তুমি বিচার বলে ও নম্রতার সহিত প্রভুর পথে সকলকে আনয়ন কর, তাহাদের সহিত অতি ভদ্রভাবে যুক্তি তর্ক কর। (১২৬) তুমি বল যে সমস্ত পবিত্র পুস্তক আল্লাহতায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ তোমাদের প্রভু এবং আমাদের প্রভু। আমাদেরও কাজ আছে। তোমাদেরও কাজ আছে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ না হউক। আল্লাহ আমাদের সকলকে এক করিবেন এবং তাঁহাতেই আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইব।" (১৩-১৪)

"আমার একমাত্র কর্ত্তব্য আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করা। (২৪)

"যদি কেহ পৃষ্ঠ পরিবর্ত্তন করে, তবুও তুমি সরল ভাবে কেবলমাত্র আদেশ প্রকাশ করিতে থাকিবে।" (৮৪)

কাহারও সহিত ভদ্রভাব ব্যতীত বিবাদ করিবে না। ঐ সমস্ত লোকের সহিত ব্যতীত যাহারা তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।" (৮৬)।

"ধর্ম্মে কোন জবরদস্তি নাই।" (২৫৬)

"তুমি বল আয় লোক! আমি কেবল সরল কথা দ্বারা তোমাদিগকে সাবধান করিতে আসিয়াছি।" (৪৮)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত আয়েতগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, ইসলাম ধর্ম্ম অসির সমর্থন করে নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সন্ধিদ্বারা, যুক্তি তর্কদ্বারা ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মে বরং অনেক সময় হত্যা ও অত্যাচার দ্বারা দীক্ষা কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। নরওয়ের দক্ষিণাংশে ভিকেন নামক স্থানে রাজা ওলফ্‌ ট্রইক্‌ভেস, যে সমস্ত লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের কাহারও হস্ত পদ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, কাহাকেও দেশান্তর করিয়াছিলেন এবং কাহাকেও প্রাণে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম্ম কখনও এইরূপ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। সহজবোধ্য নীতিসমূহই ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তারের প্রধান কারণ। ইহার অখণ্ডনীয় যুক্তি সাধারণ ব্যক্তিকেও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয়। কেবল প্রত্যাদেশপ্রসূত বলিয়া লোকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, সহজ তথ্য ও সরল যুক্তি বলেই ইহা সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছে। পবিত্র কোর্‌আন যেরূপ সুন্দরভাবে আল্লাহতায়ালার একত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্ম সেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। ইসলাম অত্যল্প কথায়, মনোবিজ্ঞানের জটিল রহস্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও অতি সহজেই অত্যাশ্চর্য্যভাবে জ্ঞানী ও অজ্ঞান, ধনী ও দরিদ্র সকলেরই মন অসাধারণ শক্তিদ্বারা আকর্ষণ করিতে পারে। ইহাতে জ্ঞানের কূটত্ব নাই, ভাষার আড়ম্বর নাই, পাণ্ডিত্যের স্ফুরণ নাই। একবার স্পেনের মূরদিগের সততা ও ধর্ম্মভীরুতার সহিত বিরুদ্ধবাদিগণের নৃশংসতার তুলনা করিয়া দেখুন। ইসলামের সাম্যনীতি সম্বন্ধে চ্যাট্‌ফিল্ড বলিয়াছেন, (হিষ্টরিক্যাল রিভিউ ৩১২পৃঃ)—

"ইউরোপবাসিগণ কোরআনপন্থিগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, যদি উহাদের প্রতি মূর, তুর্কী ও অন্যান্য মোসলেম সম্প্রদায়গণ তদ্রূপ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে প্রাচ্যে ইউরোপীয় ধর্ম্ম লোপ পাইত।"

ইসলামের সত্যতাই প্রচারকের কার্য্য সাধন করে। ক্যানন আইজাক টেলর এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক একবার বুঝিয়া দেখুন, "ইসলাম কেমন করিয়া প্রথম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কত দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রভাব নবদীক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব এত দীর্ঘ স্থায়ী নহে। একদল আফ্রিকাবাসী একবার ইসলাম গ্রহণ করিলে আর পুনরায় ধর্ম্মহীনতার মধ্যে ফিরিয়া যায় না কিংবা কখনও খৃষ্টান হয় না। ... ... যে অজস্র অর্থ এবং জীবন আফ্রিকায় খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্যয়িত হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের লাভ কত সামান্য হইতেছে। সেখানে যদি শত শত লোক খৃষ্টান হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে মোসলেম লক্ষ লক্ষ হইয়াছে। এই সংবাদ অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও সত্য; ইহাকে উপেক্ষা করা মূর্খতা। ইসলাম যে খৃষ্টান বিরোধী ধর্ম্ম নয় এবং অর্দ্ধ খৃষ্টান ধর্ম্ম এই কথা স্বীকার করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। ... ... হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিক্ষা খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরোধী নহে। ... ... ইসলামের নীতি কোন কোন বিষয়ে যে আমাদের নীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। ইসলাম খোদাতালার উপর আত্ম নির্ভর, মিতাচার, বদান্যতা, সত্যবাদিতা ও ভ্রাতৃভাবের যে সুন্দর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা আমাদের অনুকরণ করা অতীব প্রয়োজন।"

চেম্বার্স সাহেব বলেন, "ইসলামের আবির্ভাবে অন্যায় বিচার, অহঙ্কার, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, পরিহাস, অর্থলোলুপতা, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ও অভিমান

প্রভৃতি দেশ হইতে দুরীভূত হইয়াছে। ধৈর্য্যশীলতা, মহানুভবতা, সদ্-গুণাবলী মানব হৃদয় অধিকার করিয়াছে। ইসলাম বিজ্ঞান প্রভৃতি হিতকর শাস্ত্র ইউরোপে প্রচলিত করিয়াছে। মোসলেমগণ স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে যে, তাহারাই ইউরোপকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছে।"

মোসলমানদিগের সময় গ্রীক্ ও রোমীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য শাস্ত্র উন্নতি সাধন করিয়াছিল। দর্শন, চিকিৎসা, ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র মোসলেমদিগের হস্তেই ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। তাহাদের কল্যাণে এক্ষণে মানবগণ ঐ সকল শাস্ত্রের সুফলাদি ভোগ করিতেছে।

আর একজন বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, "ইসলাম দেশব্যাপী শিশুহত্যা নিবারণ করিয়াছে, সুদ গ্রহণের নিষেধবার্ত্তা প্রচার করিয়া অনেক লোককে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।" প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্লাইল বলিয়াছেন, "ইসলাম অন্ধকারে জন্মিয়া আলোক দ্বারা চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়াছে। আরবদেশ ইহার প্রভাবে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। অজ্ঞানান্ধ আরবদেশ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রাণাডা হইতে পুর্ব্বে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত সকল স্থানে সত্যের আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।

ইসলামে রাজভক্তি—ইসলাম রাজভক্তি শিক্ষা দেয়, রাজা মোসলেম হোক আর অমোসলেম হোক, এই বিবেচনা করিয়া আমাদের রাজভক্ত হওয়া উচিত যে, খোদাতালা তাঁহার অসীম জ্ঞান বলে তাঁহারই হস্তে আমাদিগকে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা, সম্মান, সম্ভ্রম, জীবন, সম্পত্তি সবই তাঁহারই তত্ত্বাধীন। অতএব কোন পুরস্কারের আশা না রাখিয়া আমাদের রাজভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। মোসলেম জাতি যেরূপ রাজভক্ত অন্য কোন জাতি তদ্রূপ কিনা সন্দেহ।

ইসলাম রাজভক্তির সাহায্যে ধর্ম্ম বিস্তারের চেষ্টা করিলেই পৃথিবীর মোসলেম ইতিহাস অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইত। অন্য জাতির সহিত সংঘর্ষ হইত এবং শক্তির বিনাশ হইত। ইসলামের জয় শরীরিকারণ সম্ভূত নহে। আধ্যাত্মিক প্রভাবই ইহার বিস্তৃতির একমাত্র কারণ।

এড্‌মাণ্ড বার্ক ইসলাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "মোসলেমের নৈষ্ঠিক বিধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, রাজা হইতে সর্ব্ব নিকৃষ্ট প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই অবশ্য পালনীয়। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নীতি মধ্যে পরিগণিত।"

মেজর গ্রীন লেওনার্ড ইসলাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "ইউরোপ স্বীকার করিয়াছে যে, প্রাচীনকালে ইউরোপবাসীরা যখন অন্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তখন ইসলাম সভ্যতা, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল এবং ইউরোপীয় সমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছিল। মোসলেম জাতির বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা ও উচ্চ শিক্ষার ফলেই ইউরোপ এতাদৃশী উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইসলাম প্রাচীন কুসংস্কার ও অধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সভ্যতা ও ধর্ম্মভাব আনয়ন করিয়াছে, সন্দেহবাদ নাস্তিকতা দূর করিয়া একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা দিয়াছে, ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্যের পরিবর্ত্তে জাগতিক ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিয়াছে, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া শিক্ষা বিস্তৃতির সহায়তা করিয়াছে। যখন ইউরোপ আত্মকলহে লিপ্ত ছিল, যখন ইউরোপ জ্ঞান মন্দিরে প্রবেশ লাভ করে নাই, তখন ইসলাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। আরববাসীরা সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞান ও গণিত চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিল। মোছলেম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মধ্যে আছামা, আবু ওছমান, আলবেরুনি, আবুআলি এবনে ছিনা (Avicinaa), এবনে রোশ্‌দ্‌ (Averroes) এবনে বজ্জা (Avempace) ও আলগজ্জালি জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। জ্যামিতি, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, জীব বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি

আরববাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক আবুল কাছেম সর্ব্ব প্রথম আকাশযান আবিষ্কার করিয়া গগন পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া সকলের প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মোসলেমগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহার ক্রমিক পোষকতা সংঘটিত হইতেছে। আব্দুর রহমান, আবুজাফর, আল্‌মনছুর, হারুণ-অর্-রশিদ সভ্যতা ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সমস্ত মানব জাতির অনুকরনীয়। ইসলাম পশ্চিমে গ্রাণাডা হইতে পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত যে সভ্যতার ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল, তাহা জাগতিক ইতিহাস চিরকাল স্বীকার করিবে।

বিশ্‌প লিফরয়ের মতামত ঃ—বিশ্‌প লিফরয় মনে করেন যে "আল্লাহতালার একত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদনই ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ। মোসলেম ধর্ম্মানুসারে আল্লাহতায়ালাই সমস্ত জগতের একমাত্র মূলীভূত কারণ। তাঁহার প্রভূত্ব অসীম। জগতে সকল অনিয়ম ও কোলাহল মধ্যেও এক মহা সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা লুক্কায়িত আছে। ইহা ইসলামের একটী প্রধান আবিষ্কার। অন্য ধর্ম্মের ন্যায় ইসলাম মানুষের স্বেচ্ছাচারিত্ব অনুমোদন করে নাই। ইসলাম মোছলেমকে চরিত্রবান, কর্ম্মঠ ও সহিষ্ণু হইতে শিক্ষা দিয়াছে। দুস্তর বিপদের মধ্যে—ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে—দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যেও ইসলাম মোসলেমকে পর্ব্বতবৎ অচল ও অটল রাখিয়াছে। এই বিষয় অন্যান্য ধর্ম্ম ইসলামের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য।"

ইসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস আনিতে হইলে বিশেষ সুক্ষবুদ্ধি পরিচালনার আবশ্যক হয় না, কারণ ইহাতে কোন কূটনীতি লুক্কায়িত নাই। ইসলাম বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে। ইহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপই যুক্তিসঙ্গত ও প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত। অশিক্ষিতই হউক কিংবা শিক্ষিতই হউক,

ইহা সকলেরই সহজ বোধ্য। মোসলেম ধর্ম্মে যেরূপ সাম্যনীতির ব্যবস্থা আছে, এশিয়া ও ইউরোপের আর কোন ধর্ম্মে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মবিস্তারে সর্ব্বপ্রকার বাধ্যবাধকতা ইসলামে নিষিদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজত্বে মোসলমানের অধিবাস আছে, কিন্তু কোন দেশে কখনও সাম্যনীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহ শাসনকর্ত্তার উপর অযথা আক্রমণ বা ধর্ম্ম বিস্তার করিতে যত্নবান হয় নাই। যে সমস্ত ক্রুছেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ মোসলমান ও ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাস একবাক্যে মোসলেমের প্রশংসা কীর্ত্তন করে। ইসলাম মৃত ধর্ম্ম নহে। রাজত্ব বৃদ্ধির সহিত ইসলামের কোন সম্বন্ধ নাই। বরং রাজশক্তির হ্রাস ও পার্থিব অবনতি মোসলেমদিগকে সমধিক আত্মোন্নতি সাধন করিতে সক্ষম করিয়াছে।

ভারতবর্ষের মোসলেমগণ বহুকাল যাবৎ বিধর্ম্মীদিগের শাসনাধীন থাকিলেও তাহাদের জাতীয় উদ্যম ও উৎসাহ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। আবার তুর্কীর অটোম্যান বংশীয় মোসলেমগণ দূরবর্ত্তী আফ্রিকার দাস বংশীয় হাবশী মোসলমান হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইসলাম কোন নূতন ধর্ম্মের নাম নহে। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ইহা প্রচলিত। আল্লাহতালার প্রেরিত প্রত্যেক পয়গম্বর ইসলাম প্রচার করিয়াছেন। হজরত আদম, হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুছা ও হজরত ইছা সকলেই মোসলেম ছিলেন। তাঁহারা যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, আঁ হজরত তাহার পোষকতা করিয়াছিলেন। আঁ হজরত কোন নূতন ধর্ম্মের অবতারণা করেন নাই। হজরত মুছা ও হজরত ইছার পর যে সমস্ত অসত্য ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, আঁ হজরত সে গুলির সংশোধন করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম হজরত আদম হইতে প্রবর্ত্তিত, উহাই ইসলাম নামে আখ্যাত। আঁ হজরত কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য সংস্কার করেন

নাই। জাগতিক ধর্ম্ম সংস্কারই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, অদ্যাপি উহা সমস্ত মানব জাতির অনুসরণীয়। ইসলাম প্রকৃতি বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং সকল কালের জন্য, সকল স্থানের জন্য ও সকল সম্প্রদায়ের জন্য ইহা একমাত্র মহা সত্য। বর্ত্তমান সময় যে জাতি সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলমন্ত্র স্বাধীনতা; সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ইসলাম যে নীতি ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষিত জগৎ এখন ক্রমে তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছে।

ইস্‌লামের মুখ্য সম্বল কোরআন ও হাদিছ

পবিত্র কোরআন মজিদ ও হাদিছ ইসলামের মুখ্যসম্বল। ইসলামের তথ্য জানিতে হইলে প্রত্যেক মোসলেমের পক্ষে এই মহাগ্রন্থগুলি পাঠ করা আবশ্যক। অন্যান্য মহাপুরুষদের ন্যায় আঁ হজরত মাজেজার (১) দ্বারা শিষ্যবর্গকে বশীভূত করেন নাই। তাঁহার অন্যান্য মাজেজা থাকিলেও প্রেরিত গ্রন্থ কোরআন পাকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাজেজা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। একাল যাবৎ অন্য কোন গ্রন্থ— এই ঐশগ্রন্থের ভাষা, ইহার বাক্য বিন্যাস, ইহার ভাব, ইহার রহস্য, ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহা আল্লাতালার বাণী এবং তাঁহারই কর্ত্তৃক প্রেরিত, প্রত্যেক মোসলেমের ইহাই বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম। সমগ্র কোরআন একবারে অবতীর্ণ হয় নাই, ইহা ক্রমেক্রমে প্রেরিত হইয়াছে। কয়েকটী সুরা ব্যতীত কোরআনের সর্ব্বত্র আল্লাহতালা বহুবচনে এবং কচিৎ কোন স্থানে একবচনে স্বয়ং আদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রাচীন বাইবেলেও এইরূপ উভয় বচনের প্রয়োগ দেখা যায়। বাইবেলের ন্যায় কোরআন পাক কেবল মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ নহে; ইহা সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বাণিজ্যনীতি, শাসননীতি, সমরনীতি ও বিচারনীতি লইয়া গঠিত।

ইহাতে দৈনন্দিন কার্য্যের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। শারীরিক স্বাস্থ্যনীতি, আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ নীতি, ব্যবহারনীতি ইত্যাদিও বিশেষ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতে প্রতাপান্বিত সম্রাট হইতে দুর্ব্বল প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই শিক্ষানীতি সংযোজিত। জীবনের প্রত্যেক স্তরের শিক্ষনীয় বিষয় ইহাতে বিন্যস্ত রহিয়াছে; ধর্ম্ম ও কর্ম্মনীতি সমভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই অতুল ও অমূল্য গ্রন্থের সাহায্যেই আঁ হজরত সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, নূতন সাম্রাজ্য গঠন এবং এক নূতন শক্তিশালী জাতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আঁ হজরত তাঁহার অনুচরবর্গের নিকট যে সমস্ত হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যেক মোসলেমের অনুসরণীয়। তিনি অতি সহজ ভাষায় সামান্য কথায় যে সমস্ত গূঢ়ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সমগ্র পৃথিবীর নিকট আদৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। হাদিছ শাস্ত্রে অসংখ্য গ্রন্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে ছহি বোখারী, ছহি মোস্লেম, আবু দায়ুদ, তেরমজি, নাছায়ী এবং এব্‌নে মাজা সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া সমাদৃত ও গৃহীত। এই গ্রন্থগুলি ছেহা ছেত্তা নামে বিখ্যাত। এইগুলির মধ্যে ছহি বোখারী ও ছহি মোস্‌লেম অধিকতর প্রামাণিক। (২)

(১) অলৌকিক ব্যাপার।

(২) পূর্ব্বকালে কোরায়েশ্‌গণ পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অনুসরণ করিত। ইহা ছুন্নত বলিয়া অভিহিত হইত। আঁ হজরতের পর হইতে তাঁহার ও তদীয় ছাহাবিদিগের দৃষ্টান্ত জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে অনুসরণ করা প্রত্যেক মোস্‌লেম অত্যাবশ্যক মনে করিত। সর্ব্বপ্রথম ছাহাবিদিগের সাক্ষ্য লইয়াই ছুন্নত নির্দ্ধারিত হইত। তৎপরে তাবেয়ীন্ অর্থাৎ ছাহাবিদিগের উত্তরাধিকারিগণের সাক্ষ্য গৃহীত হইত। আঁহ্‌জরতের ইহলোক পরিত্যাগের পর নানা বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক পক্ষে স্ব স্ব মতামতের পোষকতার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইহা হইতে নানাবিধ হাদিছের উৎপত্তি। যে সমস্ত উপদেশ আল্লাহতালা হইতে আঁ হজরত জ্ঞাত হইয়াছিলেন তৎসমুদয় হাদিছে কুদছি বলিয়া অভিহিত

বচনাবলী।

১। আমি তোমাদের নিকট দুইটী বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, যে পর্য্যন্ত তোমরা উহাদিগকে মান্য করিয়া চলিবে, সে পর্য্যন্ত বিপথগামী হইবে না। উহাদের একটী খোদাতালার পবিত্র কোরআন ও অপরটী প্রেরিত পুরুষের হাদিছসমূহ।

ছহি হাদিছ

২। ছয়টী বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবে, তাহা হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। যখন কথা বল, সত্য বলিবে। যখন প্রতিজ্ঞা কর, পালন করিবে। যাহা আমানত রাখ, তাহা রক্ষা করিবে। চিন্তা ও কর্ম্মে পবিত্র থাকিবে। অবৈধ ও দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে। অপরের প্রতি উৎপীড়ন হইতে হস্তকে বিরত রাখিবে।

এবং আঁ হজরত বর্ণিত উপদেশাবলী হাদিছে নববী বলিয়া অভিহিত। যেগুলির সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য মাত্র, সেই হাদিছই গ্রহণীয়। কি অবস্থায়, কোন্ সময় কাহার দ্বারা কোন্ হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া যখন সন্দেহের কোন কারণ দর্শিত না হইয়াছে, তখন সেই হাদিছ গৃহীত হইয়াছে, অন্যথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিবরণকারিদিগের পরস্পর বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের চরিত্র ও সত্যতা সম্বন্ধে অকাট্য সাক্ষ্য দ্বারা হাদিছাবলীর সত্যাসত্য স্থিরিকৃত হইয়াছে। কতক হাদিছ ছহি, কতক হাছান, কতক জয়ীফ সাব্যস্ত হইয়াছে, কতক মউজু ও মকরুহ সাব্যস্ত হইয়াছে। কালে হাদিছে কোন কোন শব্দ যোগ হইয়া পড়ে, কোন স্থলে অর্থের বিরুদ্ধভাব দৃষ্টিগোচর হয়, এই জন্য টীকার আবশ্যক হয়। ভাষ্যকার এবনে হাজার ও অলকচওয়ালোনির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল হাদিছ হজরত আলি ও তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, শিয়াগণ কেবল সেইগুলি গ্রহণ করেন।

৩। একঘণ্টা কাল ধ্যান ও খোদাতালার সৃষ্টি কৌশল চিন্তা শত বৎসরের বেরিয়া (বিশুদ্ধ) এবাদত হইতেও শ্রেষ্ঠ।

৪। খোদাতালা এবাদত গ্রহণ করেন না, যে এবাদতে শরীরের সহিত অন্তঃকরণ লিপ্ত না থাকে।

৫। যে আল্লার সহিত মিলিতে চায়, আল্লা তাহার সহিত মিলিতে চান।

৬। শরীরের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে, যাহার সৌন্দর্য্যে সমস্ত শরীর সুন্দর হয়, তাহার নাম কল্‌ব।

৭। খোদাওন্দ করিম উদ্দেশ্য দেখিয়া কার্য্যের বিচার করিবেন।

৮। রাব্বুল আলামিন (১) নয়টী বস্তুর আদেশ দিয়াছেন :—

(ক) প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁহাকে ভক্তি করা, (খ) সম্পদ ও বিপদে সত্য কথা বলা, (গ) সচ্ছল ও অসচ্ছল সকল অবস্থায় সাম্যভাব অবলম্বন করা, (ঘ) আত্মীয় এবং প্রতিবেশী উপকার না করিলেও তাহাদের উপকার করা, (ঙ) কেহ কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলেও তাহাকে খয়রাত করা, (চ) কেহ ক্ষতি করিলেও তাহাকে ক্ষমা করা, (ছ) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য নিস্তব্ধতা অবলম্বন করা, (জ) কথা বলিতে খোদাওন্দ করিমের নাম লওয়া, (ঝ) সৃষ্ট জীবের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা যাহা অপরের অনুসরণীয় হইতে পারে।

৯। যে যুবক বার্দ্ধক্যের সম্মান করে, সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সম্মানিত হয়।

১০। পিতার আনন্দে খোদার আনন্দ এবং পিতার অসন্তোষে খোদার অসন্তোষ।

১১। সে মানব জাতির প্রতি সদয় নহে, খোদা তাহার প্রতি সদয়

(১) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালক।

নহেন। যাহারা সত্য, পবিত্র ও দয়ালু, তাহারা স্বর্গে প্রবেশ লাভ করিবে। যে সৃষ্ট জীব ও সন্তানাদির প্রতি সদয় নহে, খোদাতালা তাহার প্রতি সদয় হইবে না।

১২। যে এতিমের ভার গ্রহণ করে, সে হাশরের দিন আমার সহিত মিলিত হইবে।

১৩। বিধবা স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধান করিবে।

১৪। দরিদ্রকে সাহায্য করিবে।

১৫। পথিককে আহার্য্য দান করা খয়রাত্‌ মধ্যে গণ্য।

১৬। স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করাও খয়রাত্‌ মধ্যে গণ্য।

১৭। প্রতিবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, পথ হইতে কণ্টকাদি দূরীভূত করাও খয়রাত্‌ মধ্যে গণ্য।

১৮। ধনীর নিকট হইতে জাকাত আদায় করিয়া দরিদ্রকে দান করা কর্ত্তব্য।

১৯। সে আমাদের নয়,যে ছোটদিগকে ভাল না বাসে এবং বৃদ্ধদিগকে সম্মান না করে।

২০। উৎপীড়িত ব্যক্তির অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট করা এবং নির্য্যাতন হইতে তাহাকে রক্ষা করা পুরুষের যোগ্য (কর্ত্তব্য)।

২১। যে বিপদ্‌কালে স্বজনকে ও ক্লিষ্টকে সাহায্য করে, আল্লাহতালা তাহার কষ্টের সময় তাহাকে সাহায্য করিবেন।

২২। যে তাহার ভ্রাতার অভাব দূর করিবে, খোদাতালা তাহার অপরাধ মাফ করিবেন।

২৩। সমস্ত সৃষ্টজীব খোদাতালার এক পরিবারস্থ। যে তাঁহার সৃষ্টজীবের উপকার করিবে, সে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবে।

২৪। আয়েষা! তুমি দরিদ্রকে বিনা দানে ফিরাইও না। কিছু সম্বল না থাকিলে আধখানা খেজুর দিয়া তুষ্ট করিবে।

২৫। যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহার মৃত্যু নাই।

২৬। যে জ্ঞানীকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।

২৭। প্রত্যেক মোছলেম স্ত্রী পুরুষের উপর এলেম (জ্ঞান) তলব করা ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য)।

২৮। সম্ভব হইলে সুদূর চীনদেশেও বিদ্যা অনুসন্ধান করিবে।

৩০। যে সবল ও উপযোগী হইয়া অপর বা নিজের জন্য পরিশ্রম না করে, আল্লাহতালা তাহার প্রতি সদয় হন না।

৩১। আয় খোদা! আমাকে আলস্য ও অপারগতা হইতে রক্ষা কর।

৩২। খোদাতালা তাহার উপর অনুগ্রহ করেন, যে স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা (অর্থাৎ ভিক্ষা না করিয়া) রুজি অর্জ্জন করেন।

৩৩। মজুরের মজুরী (১) তাহার ঘর্ম্ম না শুকাইতে পরিশোধ করিবে।

৩৪। খোদা বলেন, যাহারা বিপদ মধ্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করে এবং অপরাধ ক্ষমা করে তাহারা সত্যপথাবলম্বী।

৩৫। বিনয় ও নম্রতা ধর্ম্মের কার্য্য।

৩৬। সমস্ত মোসলমান ধর্ম্মতঃ ভ্রাতৃস্বরূপ। একে অপরকে উৎপীড়ন করিবে না কিংবা তাচ্ছিল্যের সহিত দৃষ্টি করিবে না। কোন একজন মোসলমানের বস্তু (রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান) অপরের পক্ষে অবৈধ।

৩৭। তাহাকে মোমেন বা বিশ্বাসী বলা যায় না, যে তাহার ভাইয়ের জন্য চাহে না, যাহা সে নিজের জন্য চাহে।

(১) পারিশ্রমিক।

৩৮। সমস্ত মোসলেম একটী দেহ স্বরূপ। মস্তকে বেদনা হইলে সমস্ত শরীর ক্লিষ্ট হয়, চোখে কষ্ট পাইলে সমস্ত শরীরে কষ্ট পৌছে।

৩৯। স্ত্রীলোক পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ।

৪০। পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু মূল্যবান কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু ধার্ম্মিকা স্ত্রী।

৪১। যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওক্ত নমাজ আদায় করে এবং রমজান মাসে রোজা রাখে ও সচ্চরিত্রা এবং স্বামীর বাধ্য, সে স্ত্রীলোক যথেচ্ছ দ্বার দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে।

৪২। যে সকল পুরুষ স্ত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করে, তাহারা অসদ্ব্যবহারী। সে আমার পথাবলম্বী নহে, সে স্ত্রীকে কুপথে যাইতে শিক্ষা দেয়।

৪৩। সে জিনিস বৈধ কিন্তু খোদাতালা না পছন্দ করেন, তাহার নাম তালাক।

৪৪। ধার্ম্মিকা স্ত্রী পুরুষের প্রধান সম্পত্তি।

৪৫। ধর্ম্মকার্য্য আদায় করিলে কুবাক্যের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

৪৬। সেই সুখী, যে সুখের সময় খোদাতালাকে ধন্যবাদ দেয় এবং দুঃখের সময় সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে এবং উভয় সময় তাঁহার প্রশংসা করে এবং স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে।

৪৭। যে ব্যভিচার করে, চুরি করে, মদ্য পান করে, আমানত খেয়ানত করে ও লুণ্ঠন করে, সে মোমেন নহে। সাবধান! সাবধান!!

৪৮। বেহেস্ত মাতার পদতলে অবস্থিত।

৪৯। মৃত্যুকে আহ্বান করিও না, যেহেতু মোছলেমের জীবন বৃদ্ধি দ্বারা সৎকার্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে।

৫০। মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সুকথা বলিবে এবং তাহাদের সম্বন্ধে কুকথা হইতে বিরত থাকিবে।

৫১। যখন তোমাদের পার্শ্ব দিয়া কোন মৃত দেহ যাইবে, তখন খাড়া হইবে, উহা ইহুদির হউক, খৃষ্টানের হউক বা মোছলমানের হউক।

৫২। ইসলাম বৈরাগ্য (সংসার ত্যাগ) অনুমোদন করে না।

৫৩। আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ।

৫৪। অপরের স্ত্রীর প্রতি কামচক্ষে দেখা ব্যভিচার স্বরূপ।

৫৫। যাহারা ইসলামের নাম লইয়া কোফরী এখতেয়ার করে এবং বিনা কারণে মানুষের রক্তপাত করে, তাহারা খোদাতালার পরম শত্রু।

৫৬। খোদাতালার সহিত অপরকে শরীক করা, মাতা পিতাকে কষ্ট দেওয়া, স্বজনকে হত্যা করা, আত্মঘাতী হওয়া ও শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ।

৫৭। খয়রাত করা প্রত্যেক মোসলেমের কর্ত্তব্য। যাহার সম্বল নাই, সে সৎকার্য্য করিতে পারে। ইহাই তাহার পক্ষে খয়রাত স্বরূপ।

৫৮। মধ্য পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ ও প্রশংসার্হ।

৫৯। অতি ভোজন ও অতি পান দ্বারা তোমার কল্‌ব নষ্ট করিও না।

৬০। নফ্‌ছকে (১) দমন করাই সর্ব্বপ্রধান জেহাদ।

৬১। দুনিয়ার প্রতি মহব্বত সমস্ত বিপদের মূলীভূত কারণ।

৬২। যে খোদার উপর ও ভবিষ্যৎ জীবনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে অতিথিকে সম্মান করে।

৬৩। মেজবান (গৃহস্থ) মেহমানকে (অতিথি) গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে।

৬৪। যাহাদিগকে দেখিলে খোদার এয়াদ হয়, তাহারাই খোদার শ্রেষ্ঠ বান্দা।

---

(১) রিপু।

৬৫। লোকের সহিত তাহাদের বুদ্ধির সীমানুযায়ী কথা বলিবে।

৬৬। যে অপরাধ করিয়া প্রকৃত অন্তঃকরণের সহিত পরিতাপ করে, সে ঐ লোকের ন্যায়, যে কখন অপরাধ করে নাই।

৬৭। মাতাপিতা অন্যায় করিলেও তাঁহাদিগের উপকার করা উচিত।

৬৮। দরিদ্রকে খয়রাত করিলে এক গুণ পুরস্কার পাওয়া যায়; কিন্তু আত্মীয়কে খয়রাত করিলে দ্বিগুণ পুরস্কার পাওয়া যায়।

৬৯। পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম লইয়া কোন কার্য্যে গর্ব্ব করা উচিত নহে, যেহেতু আদমজাতি মানবের সন্তান এবং আদম মৃত্তিকা হইতে জাত।

৭০। অহঙ্কারী ব্যক্তি কখনও বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৭১। যাহার মধ্যে একটি কণা মাত্র অহঙ্কার আছে, সে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারিবে না।

৭২। বিনয় ও নম্রতা ইমানের দুইটী শাখা।

৭৩। নিশ্চল জল দূষিত করিবে না।

৭৪। খোদা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ভালবাসেন।

৭৫। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই, যাহার চরিত্র ও ব্যবহার সর্ব্বোত্তম।

৭৬। কখনও অপরের দোষ অনুসন্ধান করিবে না।

৭৭। অপরকে ঈর্ষা করিবে না।

৭৮। পৃথিবীতে আপনাকে পথিকের ন্যায় মনে করিবে এবং নিজকে মৃত ব্যক্তির সদৃশ বিবেচনা করিবে।

৭৯। নমাজের সময় খোদাতালা ব্যতীত সমস্ত চিন্তা দূরে রাখিবে, কথোপকথনকালে এমন কোন বাক্য প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু শেষে আক্ষেপ করার আবশ্যক হইতে পারে। অপরের নিকট কোন লালসা করিবে না কিংবা আশা রাখিবে না।

৮০। মোমেনের মৃত্যু নাই, সে অস্থায়ী পৃথিবী হইতে স্থায়ী অস্তিত্বে পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র।

৮১। মৃত্যু মোসলেমের পক্ষে অনুগ্রহ স্বরূপ।

৮২। দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ আদায় করিবে, কিন্তু যদি অশক্ত হও, তবে বসিয়া নমাজ আদায় করিবে। বসিতে অশক্ত হইলে শয্যোপরি নমাজ আদায় করিবে। নমাজী হইয়াও যে দুষ্কৃতি হইতে বিরত না হয়, খোদাতালা হইতে তাহার দূরত্ব বাড়িতে থাকে।

৮৩। ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য এবং পীড়িতকে সেবা করিবে। যে দাস অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে। উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে, সে মোসলমান হউক বা না হউক।

৮৪। যে কোন মোসলেম অপরকে পূর্ব্বাহ্নে পীড়িত শয্যায় সাক্ষাৎ করে, তাহার উপর অপরাহ্নে সত্তর হাজার ফেরেস্তা দোয়া করে এবং যে পীড়িতের সহিত অপরাহ্নে সাক্ষাৎ করে, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেস্তা তাহার প্রতি দোয়া করে এবং সে ক্ষমার্হ হইবে।

৮৫। যাহা সত্য তাহা বলিবে যদিও উহা লোকের নিকট কষ্টদায়ক ও অসন্তোষজনক অনুমিত হয়।

৮৬। পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করিলে অজু ও রোজা নষ্ট হয়।

৮৭। অপরের প্রশংসা নষ্ট করা মোমেনের উচিত নহে। কাহাকেও শাপ দেওয়া, কাহাকেও গালি দেওয়া কিংবা বড়াই করা মোমেনের অনুচিত।

৮৮। আমাকে অত্যধিক প্রশংসা করিবে না, যেমন খৃষ্টাধর্ম্মাবলম্বিগণ যীশুখৃষ্টের প্রশংসা করিতে গিয়া তাহাকে খোদা ও খোদার পুত্র বলিয়া থাকে। আমি কেবল মাত্র খোদাতালার ভৃত্য। সুতরাং আমাকে তাহার দাস ও রছুল বলিবে।

৮৯। যে দাসদাসীর প্রতি কুব্যবহার করে, সে বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে সমস্ত দাস দাসী নমাজ আদায় করে, তাহা-দিগকে ভ্রাতা-ভগ্নী স্বরূপ দেখিবে।

৯০। অসৎসঙ্গে থাকা অপেক্ষা একাকী থাকা উত্তম এবং একাকী থাকা অপেক্ষা সৎসঙ্গে থাকা উত্তম। কু-কথা বলা অপেক্ষা নিস্তব্ধ থাকা ভাল।

৯১। যে জ্ঞানের অন্বেষণে গৃহত্যাগ করে, সে আল্লার পথে বিচরণ করে।

৯২। সে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট মোসলেম নহে, যে কেবল নিজের উদর পূর্ণ করে এবং যাহার প্রতিবাসী ক্ষুধার্ত্ত থাকে।

৯৩। ইসলাম কৌমার ব্রত সমর্থন করে না।

৯৪। বিবাহ সকলের পক্ষে জরুরী, যাহারা বিবাহ করিতে সমর্থ।

৯৫। খোদার রাহে (১) যাহারা নম্রতা অধিকার করে, খোদা তাহা-দিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

৯৬। সেই ব্যক্তি খোদার নিকট অত্যন্ত আদরণীয়, যে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে পারে, যে তাহার অনিষ্ট করে।

৯৭। যে ব্যক্তি বিপদে পতিত না হইয়াছে, তাহার সহিষ্ণুতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

৯৮। যে ব্যক্তি রোজা রাখে, কুকথা হইতে তাহার বিরত থাকা উচিত এবং কেহ অনিষ্ট করিলে ক্ষুব্ধ হওয়া অনুচিত।

৯৯। যে ব্যক্তি রোজা রাখিয়া মিথ্যা কথা বলে এবং অন্যদিকে মনঃসংযোগ করে, খোদাতালার সমক্ষে তাহার রোজা রাখা না রাখা সমান।

---

(১) পথে

১০০। সত্যবাদী ব্যক্তির পক্ষে কাহাকেও শাপ দেওয়া উচিত নহে।

১০১। সে ব্যক্তি আমাদের নহে, যে অপরকে উৎপীড়নে যোগদান করিতে আহ্বান করে। সে আমাদের নহে, যে তাহার কাওমের (২) সহিত অবিচারে লড়াই করে। সে আমাদের নহে, যে কাওমকে উৎপীড়নে সাহায্য করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

১০২। যে ব্যক্তি আমার নিকট অর্দ্ধহস্ত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, আমি তাহার নিকট এক হস্ত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি; এবং যে ব্যক্তি আমার নিকট একহস্ত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, আমি তাহার দিকে ষাট হস্ত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি, এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে ধীরে ধীরে আইসে, আমি তাহার দিকে দৌড়িয়া যাই এবং যে ব্যক্তি আমার নিকট রাশীকৃত গুণাহ লইয়া উপস্থিত হয় এবং আমাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আমি তাহার নিকট ক্ষমার ভাণ্ডার লইয়া উপস্থিত হই।

১০৩। ঐ খয়রাত সর্ব্বোত্তম, যাহা দক্ষিণ হস্ত দান করে এবং বামহস্ত অনবগত থাকে।

১০৪। লোকের অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট করা, ক্ষুধাতুরের আহার্য্য সংগ্রহ করা, দুঃস্থকে সাহায্য করা, দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূর করা এবং প্রপীড়িত ব্যক্তির কষ্ট দূর করা কর্ত্তব্য।

১০৫। যখন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবে, তখন তাহাকে এই বলিয়া তুষ্ট করিবে, "তুমি সুস্থ হইবে ও অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবে।" যেহেতু যদিও এইরূপ প্রবোধ তাহার অদৃষ্ট খণ্ডন করিবে না, কিন্তু তাহার আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবে।

১০৬। এই জীবন পর-জীবনের ক্ষেত্র স্বরূপ। সৎকাজ বপন কর, যদ্দ্বারা তুমি সুফল ভোগ করিতে পার। চেষ্টা করাই খোদাতালার আদেশ

(২) সম্প্রদায়ের

এবং খোদাতালা যাহা আদেশ করিয়াছেন, কেবল চেষ্টা দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে।

১০৭। ৪টী গুণ দেখিয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে হয় (ক) তাহার আর্থিক অবস্থা (খ) তাহার বংশ মর্য্যাদা (গ) তাহার সৌন্দর্য্য (ঘ) তাহার সৎগুণাবলী, কিন্তু যদি তুমি অন্য গুণের বিবেচনায় বিবাহ কর, তোমার হস্ত মলিন হইবে।

১০৮। যে সমস্ত ভৃত্য তোমাকে সন্তুষ্ট করে, তাহাদিগকে তুমি যাহা খাও তাহা খাইতে দাও এবং তুমি যাহা পরিধান কর, তাহাই পরিতে দাও; কিন্তু যাহারা তোমাকে সন্তুষ্ট করে না, তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া থাক; খোদার সৃষ্টজীবকে কষ্ট দিও না।

১০৯। লোকের মহত্ত্ব বিচার করিয়া তাহাদিগকে সম্মান করিবে।

১১০। পার্থিব বস্তুর আধিক্যকে ধন বলা যায় না, মানসিক সন্তোষই প্রধান ধন।

১১১। জ্ঞান অর্জ্জন করিবে, ইহা মানুষকে ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা দেয়। ইহা স্বর্গের পথ উজ্জ্বল করে, ইহা মরুভূমির পানি, নির্জ্জনতার সুহৃদ ও বন্ধুহীনের বন্ধু। ইহা সুখের পথ প্রদর্শন করে। ইহা বিপদকালে শান্তি দেয়। ইহা মিত্র মধ্যে অলঙ্কার স্বরূপ ও শত্রু সমক্ষে বর্ম্ম স্বরূপ।

১১২। হজরত আয়েষা রছুলে খোদাকে বলিতে শুনিয়াছেন:— সর্ব্বশক্তিমান আল্লা আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানের পথ অনুসরণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে স্বর্গীয় পথ সুগম হইবে। জ্ঞানের আধিক্য এবাদতের (১) আধিক্য হইতে শ্রেষ্ঠ।

---

(১) উপাসনার

১১৩। সমস্ত রাত্রির এবাদত অপেক্ষা এক ছায়াত বা (ঘণ্টা) জ্ঞানশিক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১১৪। মানুষের দুইটী আকাজ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হয় না; উহাদের একটী জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা, উহা যতই পূর্ণ হয়, ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপরটী পার্থিব আকাজ্ক্ষা। এই দুইটী আকাজ্ক্ষা সমতুল্য নহে, যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে কিন্তু দুনিয়াদার গর্ব্বান্ধ থাকে।

১১৫। ঐ সময় কেয়ামত নিকটবর্ত্তী, যখন ইসলাম ও কোরআনের নামমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এবাদতগাহ (২) জ্ঞান ও এবাদত হইতে পৃথক হইবে। শিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান লুপ্ত হইবে এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হইয়া তাহাদিগের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

১১৬। স্বর্গের কুঞ্জিকা নমাজ এবং নমাজের কুঞ্জিকা অজু।

১১৭। আঁ হজরত এবনে মাছউদকে বলিয়াছেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ আদায় করিলে খোদা সন্তুষ্ট থাকেন। নমাজীর মর্ত্তবার (৩) নীচেই ঐ ব্যক্তির মর্ত্তবা, যে পিতামাতাকে সম্মান করে, তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করে এবং তাঁহাদিগকে বিরক্ত না করে।

১১৮। যে ব্যক্তিকে খোদাতালা ধন দিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি তাহার দেয় খয়রাত আদায় না করে, তাহা হইলে হাশরের দিন তাহার ধন সর্পে পরিণত হইবে।

১১৯। যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, সে নিজের মুখ ক্ষত করে, যে ব্যক্তি নিজের মুখকে আঁচড় ও ক্ষত হইতে রক্ষা করিতে চায়, তাহার ভিক্ষা করা উচিত নহে, ঐ অবস্থা ব্যতীত যে অবস্থায় ক্ষুধা ও অভাব তাহাকে নাচার করে।

(২) উপাসনালয় (৩) মর্য্যাদা

১২০। জীবনকালে এক দেরহাম দান করা, মৃত্যুকালে শত দেরহাম দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১২১। দানদ্বারা আল্লার রোষাগ্নি নিশ্চয়ই নির্ব্বাপিত হয় এবং দান কুমরণ হইতে রক্ষা করে।

১২২। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, যে ব্যক্তির নিকট আল্লার নামে খয়রাত চাহিলে পাওয়া যায় না।

১২৩। যে মোসলেম তাহার পীড়িত ভাইকে সেবাশুশ্রূষা করিতে যায়, সে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বেহেস্তী ফল সংগ্রহ করিতে থাকে।

১২৪। কোরআনের অর্থ বুঝাইবে এবং খোদার আদেশবাণী অনুসরণ করিবে।

১২৫। মাতা সন্তানের প্রতি যেরূপ দয়ালু, আল্লাতালা তাহার সেবকের প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর দয়ালু।

১২৬। ঐ লোককে তুমি গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিবে না, যে প্রথমে ছালাম না করে।

১২৭। ঘৃণা দূর করিবার জন্য মোছাফেহা (১) করিবে।

১২৮। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, যে যদৃচ্ছা তোষামোদ করে।

১২৯। যে ভাই তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার সহিত মিথ্যা বলা সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা।

১৩০। প্রশংসা করিতে গিয়া সীমা অতিক্রম করিও না।

১৩১। আল্লাহতালা ইচ্ছা করিলে সব গুনাহ মাফ্ করেন, ছেওয়ায়(২) পিতামাতার নির্য্যাতন। এই অপরাধের জন্য তিনি পৃথিবীতে তখন তখন দণ্ড দিতে তৎপর হন।

(১) করমর্দ্দন (২) পিতা মাতার নির্য্যাতনরূপ অপরাধ ব্যতীত।

১৩২। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য সদৃশ।

১৩৩। ঐ মোসলেমের গৃহ সর্ব্বোত্তম, যেখানে এতিম (১) উপকৃত হয় এবং ঐ মোসলেমের গৃহ সর্ব্বনিকৃষ্ট যেখানে এতিম নির্য্যাতিত হয়।

১৩৪। প্রতিহিংসা হইতে দূরে থাকিবে। যেহেতু ইহা সৎকার্য্যকে নষ্ট করে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে দহন করে। ঝগড়া-বিবাদের পোষকতা করিতে বিরত থাকিবে, যেহেতু ইহা ধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটিত করে।

১৩৫। রাগ করিও না।

১৩৬। ঐ ব্যক্তি বলবান ও ক্ষমতাশালী নহে, সে অপরকে পাতিত করে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলবান ও ক্ষমতাশালী, যে ক্রোধ হইতে বিরত থাকে।

১৩৭। তিন প্রকার ব্যক্তির সহিত আল্লাহতালা হাশরের দিন কথা বলিবেন না এবং তাহাদের জন্য দুঃসহ দণ্ডবিধান হইবে,—(১) ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) মিথ্যাবাদী রাজা, (৩) অহঙ্কারী নির্ধন।

১৩৮। যখন কোন ব্যক্তি রাগ করে, তখন তাহার বসিয়া থাকা উচিত এবং বসিয়া যদি রাগ না যায়, তবে তাহাকে শয়ন করিতে দাও।

১৩৯। তিনটী বস্তু লাশের (মৃতদেহের) অনুসরণ করে, তন্মধ্যে ২টী প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং একটী তাহার সঙ্গেই থাকে। পরিবারবর্গ এবং ধন প্রত্যাবর্ত্তন করে কিন্তু কার্য্যাবলী সঙ্গেই থাকে।

১৪০। আল্লা তোমার সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য দেখিবেন না। তোমার অন্তঃকরণ ও আমল (২) দেখিবেন।

১৪১। পরবর্ত্তী কালে লোকে প্রকাশ্যে বন্ধু ও ভাইয়ের মত ব্যবহার করিবে এবং অপ্রকাশ্যে শত্রুর ন্যায় কাজ করিবে।

(১) মাতৃপিতৃহীন বালকবালিকা। (২) কার্য্য

১৪২। ঐ সমস্ত বিবাহোৎসব সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ, যাহাতে ধনীলোক নিমন্ত্রিত হয় এবং দরিদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয় না।

১৪৩। আমার অনুবর্ত্তীদিগের পক্ষে দুইটী বস্তু অতি ভয়াবহ। প্রথম কামুকতা, দ্বিতীয় দীর্ঘজীবনের আশা।

১৪৪। ঐ সমস্ত স্ত্রীলোক সর্ব্বপেক্ষা উত্তম, যাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে।

১৪৫। যে আমিরকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।

১৪৬। যদি কোন নিগ্রোবংশীয় দাস শাসনভার প্রাপ্ত হয়, তাহারও আদেশ পালন করিবে।

১৪৭। ঐ সমস্ত শাসক সর্ব্ব নিকৃষ্ট, যাহারা প্রজাপীড়ন করে।

১৪৮। ঐ ব্যক্তি স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যে উৎপীড়ন দ্বারা লোকের নিকট হইতে দশমাংশ গ্রহণ করে।

১৪৯। ঐ সমস্ত লোক আল্লার দোষমনী করে,যাহারা সর্ব্বদা কলহরত থাকে।

১৫০। আঁ হজরত সুদের দাতা ও গ্রহিতাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।

১৫১। তোমার খাদ্যের মধ্যে ঐ জিনিস সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, যাহা তুমি স্বয়ং বা তোমার সন্তানগণ অর্জ্জন করিয়াছেন।

১৫২। ঐ শরীর স্বর্গে প্রবেশ লাভ করিবে না, সে শরীর অবৈধ উপায়ে পুষ্ট হইয়াছে।

১৫৩। যে ব্যক্তি একচেটীয়া (একাধিকার) করে, সে গোনাহগার। যে সমস্ত লোক নগরে শস্যাদি ক্রয় করে এবং শস্যাদরে বিক্রয় করে, তাহারা শুভফল লাভ করে; কিন্তু যাহারা অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহারা অভিশপ্ত হয়।

১৫৪। মোসলেমগণ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং ধার্ম্মিক শ্রেণীর নিকট পৌছিতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত তাহারা স্বীয় দেনা পরিশোধ না করিবে।

১৫৫। যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ মারা যায়, সে শহিদ। যে ব্যক্তি সম্পত্তি রক্ষার্থ মারা যায় সেও শহিদ। যে ব্যক্তি পরিবার রক্ষার্থ মারা যায় সেও শহিদ। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ মারা যায় সেও শহিদ।

১৫৬। আল্লাহতালা চোরকে অভিসম্পাত করেন।

১৫৭। প্রত্যেক নেশা সুরাবৎ এবং অবৈধ।

১৫৮। যে একবার সুরাপান করে এবং তওবা না করে, ৪০ দিন পর্য্যন্ত আল্লাহ তাহার নমাজ গ্রহণ করিবেন না।

১৫৯। তোমার চাকরকে প্রতি দিন সত্তর বার ক্ষমা করিবে।

১৬০। ঔষধ ব্যবহার কর, যেহেতু আল্লাহ এমন কোন যন্ত্রণা সৃষ্টি করেন নাই, যাহার নিবৃত্তি নাই, ছেওয়ায় (১) বার্দ্ধক্য। বার্দ্ধক্য রোগের কোন ঔষধ নাই।

১৬১। বাক্‌শক্তিহীন জন্তুর উপকার কর এবং তাহাদিগকে জলপান করিতে দেওয়া বিশেষ পুরস্কার যোগ্য।

১৬২। জন্তু সম্বন্ধে খোদার উপর ভয় রাখিবে। যখন তাহাদিগকে সবল মনে করিবে, তখন চড়িবে, দুর্ব্বল মনে করিলে চড়িবে না।

১৬৩। সন্দেহ ঘোরতর অসত্য সদৃশ।

১৬৪। মানত করিলে আদায় করিবে।

১৬৫। খোদাতালার আদেশবাণীকে স্মরণ কর এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাই ইসলাম।

১৬৬। খোদাতালার গুণে আপনাকে গুণান্বিত কর।

(১) ব্যতীত।

১৬৭। খোদাতালার উপর নির্ভর করিও, কিন্তু তোমার উট্‌কে বাধিয়া রাখিও।

১৬৮। প্রত্যেক বস্তুরই বিশিষ্ট প্রকারের ভূষণ আছে। খোদাতালার স্মরণই মানব হৃদয়ের ভূষণ।

১৬৯। যাহা বৈধ তাহা স্পষ্টবোধ্য, যাহা অবৈধ তাহাও স্পষ্টবোধ্য, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহজনক বিষয় আছে, যাহা হইতে নিরস্ত থাকাই ভাল।

১৭০। যাহারা সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারা খোদাতালার প্রিয়।

১৭১। প্রফুল্লভাবে বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা করা এবং উৎসবে নিমন্ত্রণ করা খয়রাতের কার্য্য।

১৭২। শিশুদিগকে আদর এবং চুম্বন করা খয়রাতের কার্য্য।

১৭৩। প্রতিবাসীর প্রতি সহানুভূতি করা এবং তাহাদিগকে উপঢৌকন দেওয়া খয়রাতের কার্য্য।

১৭৪। সে ব্যক্তি মোনাফেক, যে কথা বলিবার সময় মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করিয়া খেলাফ করে এবং আমানত খেয়ানত করে।

১৭৫। মোসলেম সে, যাহার হস্ত এবং জিহ্বা হইতে কোন মোসলেমের অনিষ্ট হয় না এবং মোহাজের সে, যে খোদাতালার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে পলায়ন করে।

১৭৬। কবর অনন্ত যাত্রার প্রথম মঞ্জেল (ষ্টেশন)।

১৭৭। বিনা অনুমতিতে আহলে কেতাব (১) দিগের গৃহে প্রবেশ, তাহাদের স্ত্রীগণকে প্রহার বা তাহাদের ফল ভক্ষণ করা খোদাতালার নিষেধ।

(১) যাহাদিগের উপর ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছে

১৭৮। অপরাধ কিসে হয়? যখন কোন বস্তু তোমার বিবেককে দংশন করে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ কর।

১৭৯। মানুষের স্বকৃত অপরাধের ফল ব্যতীত কোন বিপদ বা পরীক্ষা তাহার উপর পতিত হয় না এবং খোদাতালা অধিকাংশ অপরাধই ক্ষমা করেন।

১৮০। খোদাতালাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলে যেমন এবাদত (পূজা) করিতে, ঠিক তেমন কর, কারণ তুমি না দেখিলেও তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

১৮১। আঘাত হইতে তোমার হস্তকে বিরত রাখ এবং মন্দ ও অবৈধ দ্রব্য গ্রহণ হইতেও বিরত রাখ।

১৮২। এক দিবস অপেক্ষা দীর্ঘ কালের পথে বাহির হইলে স্ত্রীলোকের পুরুষ আত্মীয়ের সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য।

১৮৩। সন্তানগণকে প্রতিপালন কর।

১৮৪। সন্ধ্যাকালে সন্তানগণকে বাহিরে যাইতে দিও না।

১৮৫। তোমার মধ্যে যে সমস্ত দোষ বর্ত্তমান, অন্যের সেগুলি দেখিলে উল্লেখ বা নিন্দা করিও না।

১৮৬। বিচার বুদ্ধি অপেক্ষা খোদাতালা আর কোন অধিকতর সম্পূর্ণ ও সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যে সমস্ত মঙ্গল দান করেন, ইহারই জন্য এবং ইহা হইতেই জ্ঞান উদ্ভূত। ইহার দ্বারাই তাঁহার অসন্তুষ্টি বিধান হয় এবং ইহার জন্যই পুরস্কার এবং তিরস্কার লাভ হয়।

১৮৭। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অনেকবার দন্ত ধাবন করিতেন এবং ইহাকে তিনি পরিচ্ছন্নতার একটী অঙ্গ মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের বিশেষ অসুবিধা না থাকিলে আমি প্রত্যেক নমাজের পূর্ব্বে দন্ত পরিষ্কারের আজ্ঞা দান করিতাম।"

১৮৮। যখনই তিনি গোছল করিতেন, সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মাথার উপর পানি ঢালিয়া দিতেন।

১৮৯। উপরের (দাতার) হস্ত নীচের (গ্রহীতার) হস্ত হইতে ভাল।

১৯০। পরিশোধের উদ্দেশ্যে ঋণ করিলে খোদাতালা পরিশোধ করেন আর যে প্রবঞ্চনার (পরিশোধ না করিবার) উদ্দেশ্যে ঋণ করিলে, খোদাতালা তাহাকে ধ্বংস করেন।

১৯১। যে ভৃত্যের উপর প্রভুর সম্পত্তির ভার অর্পিত, সে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৯২। খোদার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না, এতিমের হক নষ্ট করিও না, স্ত্রীলোকের প্রতি মিথ্যাকলঙ্কারোপ করিও না।

১৯৩। কোন বস্তুর অলীক বর্ণনা করিও না।

১৯৪। হীনতা ও কাপুরুষতা হইতে আল্লাহতালা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১৯৫। যে নিজের জন্য ভিক্ষা দ্বার উন্মুক্ত করে, খোদাতালা তাহার জন্য দারিদ্র্যের দ্বার খুলিয়া দেন।

১৯৬। যখন এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ, যাহাকে তোমা অপেক্ষা অধিক অর্থ এবং রূপ দান করা হইয়াছে, তখন যাহাদিগকে তোমা অপেক্ষা কম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে।

১৯৭। তোমার নিম্নস্থগণের তত্ত্বাবধান করিবে। ইহা তোমার পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক, কারণ এতদ্দ্বারা তুমি খোদাতালার দানের আজ্ঞা হইতে রক্ষিত হইবে।

১৯৮। যে কেহ ঋণ ও সন্তান রাখিয়া গিয়াছে, আমার নিকট আসুক, আমি তাহাদের সহায়। আমি ঋণ পরিশোধ করিব এবং সন্তান-গণের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

১৯৯। কথায়, কার্য্যে ও চিন্তায় যে সত্যবাদী, তাহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও সত্যবাদী বলা যায় না।

২০০। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কোন্ ব্যক্তি? যাহারা একাকী আহার করে, দাসগণকে প্রহার করে এবং কাহাকেও কিছু দেয় না।

২০১। মন এবং মুখ মোসলেম না হইলে সে কথনও মোসলেম নয়।

২০২। আয় আল্লা, আমাকে তোমার মহব্বত দান কর; তোমাকে যাহারা মহব্বত করে, তাহাদিগকে মহব্বত করিতে দাও; যে কার্য্য দ্বারা তোমার প্রেমলাভ করা যায়, আমি যেন তাহাই করি। তোমার প্রেমকে নিজ পুত্র পরিজন, ধন সম্পদ হইতে প্রিয়তর করিয়া দাও।

২০৩। যে ব্যক্তি দুইটী বালিকার রক্ষণাবেক্ষণ করে, যতদিন তাহারা পরিণত বয়স্কা না হয়, সে দুই অঙ্গুলির ন্যায় স্বর্গে আমার নিকটে নিকটে থাকিবে।

২০৪। চিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে আল্লাহতালা সন্তুষ্ট হন।

২০৫। একথা বলিও না যে, লোকে তোমার মঙ্গল করিলে তুমিও তাহার মঙ্গল করিবে এবং লোকে তোমার অন্যায় করিলে, তুমিও তাহাদের ক্ষতি করিবে; বরং প্রতিজ্ঞা কর যে. লোকের নিকট হইতে অপকার পাইলেও তাহাদের উপকার করিবে এবং তাহারা অত্যাচার করিলেও তুমি কথন পীড়ন করিবে না।

২০৬। যথন তোমরা স্মরণ কর, "ছোবহান আল্লা" ৩৩ বার, "আল-হাম্‌দোলিল্লাহ" ৩৩ বার, "আল্লাহু আকবর", ৩৪ বার বলিবে।

২০৭। আমার উত্তরাধিকারিগণ (আমার মৃত্যুপর) নগদ কিছু পাইবে না।

২০৮। আমি অভিসম্পাত করিতে আসি নাই, বরং আল্লাহতালা আমাকে দয়ার মূর্ত্তি স্বরূপ পাঠাইয়াছেন।

২০৯। তোমাদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহারা পরিজন-বর্গের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন।

২১০। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে হৃষ্টচিত্তে ঋণ পরিশোধ করে।

২১১। ধন থাকিলেই প্রকৃত গনি হওয়া যায় না, ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত গনি (ধনী) যাহার অন্তঃকরণ গনি বা প্রশস্ত।

২১২। আরবের বাসেন্দা এবং আজমের (আরব ব্যতীত স্থানের) বাসেন্দার মধ্যে কোন ভেদ নাই ; কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন বাহাদূরী নাই ; প্রকৃত বাহাদূরী তাহার যে খোদাকে ভয় করে।

২১৩। ইহা সঙ্গত যে, তুমি ওয়ারেছ (উত্তরাধিকারী) রাখিয়া দেহত্যাগ কর। ওয়ারেছ অপরের মুখাপেক্ষী বা অপরের সাহায্য প্রার্থী হয়, ইহা উচিত নয়।

২১৪। স্ত্রী পুরুষের ভূষণ এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের ভূষণ।

২১৫। যাহার হৃদয় অন্ধ, সেই প্রকৃত অন্ধ।

২১৬। কেয়ামতের দিন খোদা তালা নিম্নলিখিত লোককে আশ্রয় দান করিবেন :—

(১) ন্যায়বান বাদশাহ (২) যিনি যৌবনে খোদার এবাদত করিয়াছেন (৩) যিনি নির্জ্জনে খোদাকে এয়াদ করেন এবং খোদার প্রেমে যাহার চক্ষু অশ্রুদ্বারা সিক্ত হয় (৪) যাহার অন্তঃকরণ মসজেদে আকৃষ্ট থাকে (৫) ঐ ব্যক্তিদ্বয় যাহাদের পরস্পরের মহব্বত ঐশী হেতু হয় (৬) ঐ ব্যক্তি যে গোপনে খয়রাত করে, যাহার দক্ষিণ হস্ত কি দান করে, বাম হস্ত খবর রাখে না।

২১৮। ঐ জিনিস জমা করিবে না, যাহা খানায় (ভোগে) আসিবে না। ঐ গৃহ প্রস্তুত করিবে না, যেখানে বসবাস করিবে না। খোদার উপর ভরসা রাখ, যাহার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং যাহার দরবারে

উপস্থিত হইতে হইবে। ঐ সমস্ত বস্তুর জন্য খাহেশ (আকাঙ্খা) রাখ, যে সমস্ত বস্তু ঐ স্থানে তোমার কাজে আসিবে, যেখানে তুমি বরাবর থাকিবে।

২১৯। একটী ব্যক্তির উপরও জুলুম করিবে না, জুলুম কেয়ামতের দিন কালিমা (তারিকি) দৃষ্টি করে।

২২০। সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া যথাসময়ে নমাজ আদায় করা শ্রেষ্ঠ, সাত বৎসরের সন্তানের পক্ষে নমাজ আদায় করা মোস্তাহাব, দশবৎসর বয়স্কের প্রতি ফরজ। [আঁ হজরতের পূর্ব্বে মক্কায় প্রত্যেক ওয়াক্তে দুই রেকাত নমাজের আদেশ ছিল। হেজরতের ১ম সনে মোছাফেরের জন্য দুই রেকাত নমাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল আর মুকীমের পক্ষে জোহর, আসর ও এশার জন্য দুইয়ের পরিবর্ত্তে চারি রেকাৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হেজরতের ২য় সনে আজান প্রথা জারি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে যখন যে আসিত নমাজ পড়িত। ইহাতে বড়ই গোলমাল হইত দেখিয়া হজরত ওমরের মতানুসারে আঁ হজরত আজানের আদেশ দিয়া বেলালকে প্রথম আজান দিতে হুকুম দিয়াছিলেন।]

২২১। এমন কোন বিশ্বাসী (মোস্লেম) নাই, যে বিপদ ও রোগদ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছে এবং তাহাকে আল্লাহ উচ্চপদে স্থাপন করেন নাই এবং তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন নাই (আল্লাহ তদ্দ্বারা তাহার গোনাহ তাহা হইতে পাতিত করেন—যেমন শরৎকালে বৃক্ষ হইতে পত্র পতিত হয়)।

২২২। তুমি কি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভালবাস? (তাহা হইলে) প্রথমে তোমার লোকদিগকে ভালবাস।

২২৩। সে আমাদের নয়, যে তাহার বয়ঃকনিষ্ঠদিগের প্রতি স্নেহার্দ্র নহে কিংবা বয়োবৃদ্ধদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান নহে।

২২৪। হজরত আয়েষা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ হজরত এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, "আয় আল্লাহ, আমাকে চিরদিন দরিদ্র রাখিও, আমার

মরণ যেন দরিদ্রের মরণের ন্যায় হয়, আমাকে পরকালে দরিদ্রগণের দলে উত্থিত করিও।"

২২৫। পৃথিবী সাধুব্যক্তির কারাগার এবং অভাবের স্থান, যখন সে পৃথিবী ত্যাগ করে, তখন কারামুক্ত হয় এবং তাহার অভাব দুরীভূত হয়।

২২৬। হে আয়েষা! যাবত তোমার কাপড়ে জোড় দেওয়া যাইতে পারে, তাবৎ তাহা পুরাতন মনে করিও না।

২২৭। আল্লাহতালা যখন বিশ্বজগৎ পয়দা করেন, তখন একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; সে খানি তাঁহার নিকট আরশের উপর রক্ষিত আছে। তাহাতে লেখা আছে, "নিশ্চয়ই আমার কৃপা আমার রোষকে পরাভূত করিয়া থাকে।"

২২৮। জীবদ্দশায় এক মুদ্রা খায়রাত, মৃত্যুকালে শত মুদ্রা ব্যয় অপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

২২৯। যে রোজাদার মিথ্যা এবং পরচর্চ্চা হইতে পরহেজ করে না, খোদাতালার নিকট তাহার পানাহার বিরতির কোন মূল্য নাই।

২৩০। তোমাদের স্বোপার্জ্জিত বা সন্তান কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত খাদ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২৩১। ভিক্ষা দ্বারা মানুষ স্বীয় মুখে ক্ষত এবং বিকৃতি সৃষ্টি করে। সুতরাং যে ক্ষত ও বিকৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। (রাজার নিকট বা) অনন্যগতি হইয়া ভিক্ষা অবশ্য ইহার বহির্ভূত।

২৩২। ঋণ ব্যতীত শহিদের সকল গোনাহ খোদাতালা ক্ষমা করিবেন।

২৩৩। জানাজার জন্য একটি মৃতদেহ আনীত হইলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "মৃতব্যক্তির কোন ঋণ আছে

কি ?" লোকে বলিত, "আছে"। হজরত পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন "ঋণ পরিশোধের জন্য সে কি কিছু রাখিয়া গিয়াছে ?" তাহারা বলিত "না"। তখন হজরত বলিতেন "তোমরা জানাজায় যোগদান করিতে পার, আমি পারিব না।"

২৩৪। ক্রুদ্ধ অবস্থায় বিচার করা বিচারকের পক্ষে অকর্ত্তব্য।

২৩৫। তোমার স্ত্রীগণের প্রতি কোমল ব্যবহার করিবে, কারণ স্ত্রীলোক হজরত আদমের বক্র পঞ্জরাস্থি হইতে নির্ম্মিত। যদি একেবারে সরল করিতে চেষ্টা কর, তবে ভাঙ্গিয়া যাইবে ; আবার একেবারে যদৃচ্ছা ছাড়িয়া দিলে বক্রতা চিরদিনই রহিয়া যাইবে।

২৩৬। মত না লইয়া কোন বিধবার বিবাহ দিবে না ; কুমারীরও সম্মতি জিজ্ঞাসা না করিয়া বিবাহ দেওয়া অবিধেয়। শেষোক্ত ব্যক্তির সম্মতি মৌনতা দ্বারা জ্ঞাপিত হয়।

২৩৭। তোমার ভৃত্যকে প্রতিদিন সত্তর বার ক্ষমা করিবে।

২৩৮। অতিথিকে আদর করা প্রত্যেক মোমেনের পক্ষে পরম কর্ত্তব্য। এক রাত্রি ও এক দিন তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, তিন দিন পর্য্যন্ত পানভোজন করাইবে। ইহার অধিক আরও পুণ্যজনক, তবে গৃহস্থের অসুবিধা করিয়া অতিথির দীর্ঘ দিন তাহার বাড়ী অবস্থান করা উচিত নহে।

২৩৯। রাজ্যভার খোদাতালার বিশিষ্ট প্রকারের আমানত এবং রাজ্যাধিকারী উপযুক্ত না হইলে এবং সৎকর্ম্ম ও সুশাসন না করিলে কেয়ামতের দিন তাহার কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

২৪০। হে আল্লার বান্দা 'ঔষধ ব্যবহার কর' ; কারণ বার্দ্ধক্য ব্যতীত খোদাতালা এমন কোন বেদনা সৃষ্টি করেন নাই, যাহা নিবারণের ঔষধ নাই। বার্দ্ধক্যই প্রতিকার শূন্য ব্যাধি।

২৪১। যে খোদাতালার জীব স্বীয় সন্তানের প্রতি স্নেহপ্রবণ নহে, তাহার প্রতি করুণাময়ের স্নেহ হইবে না।

২৪২। হজরত রছুলাল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "হে রছুলে খোদা, কোন্ আত্মীয়ের উপকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "তোমার মাতা, তোমার মাতা, তোমার মাতা এবং তৎপরে পিতা এবং তাঁহার পর নৈকট্যের ঘনিষ্টতা হিসাবে অন্য আত্মীয়।"

২৪৩। পিতার তুষ্টিতে খোদাতালার তুষ্টি এবং পিতার সন্তোষে খোদাতালার সন্তোষ।

২৪৪। কবরের উপর বসিও না বা কবর সম্মুখে রাখিয়া নমাজ পড়িও না।

২৪৫। সন্তানহারা জননীকে যে ব্যক্তি শান্তনা দান করিবে, সে বেহেস্তে উত্তম পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইবে।

২৪৬। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আয় রছুলাল্লাহ, ইমানের সত্যতার নিদর্শন কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "যদি তুমি স্বকৃত সৎকার্য্যে আনন্দ ও অসৎকার্য্যে বেদনা বোধ কর, তবে তুমি মোমেন।"

২৪৭। এক মোমেন অপর মোমেনের পক্ষে দর্পণ সদৃশ।

২৪৮। যে ব্যক্তি অপরকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, সে স্বয়ং সৎকর্ম্ম সম্পাদনের পুণ্যাধিকারী হয়।

২৪৯। সামান্য খর্জ্জুরের অংশ হইলেও দান করিয়া নরকাগ্নি হইতে আপনাকে রক্ষা কর।

২৫০। মোমেনের পক্ষে তাহার ভ্রাতার সহিত তিন দিবসের অধিক কথোপকথন বন্ধ রাখা হারাম।

২৫১। দানের দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করা বমন ভক্ষণ সদৃশ।

২৫২। যে মানুষের অধিকার অস্বীকার করে, সে আল্লার অধিকার অস্বীকার করে।

২৫৩। যে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষাকল্পে নিহত হয়, সে শহীদের [ধর্ম্মার্থ জীবনোৎসর্গকারীর] মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়।

২৫৪। যে সেবা করে, সেই মানবের নেতৃপদের অধিকারী।

২৫৫। দারিদ্র্য মানুষকে প্রায় কুফরের (ধর্ম্মবিশ্বাসহীনতার) দ্বারে উপনীত করে।

২৫৬। দোলনা হইতে কবর পর্য্যন্ত জ্ঞানানুসন্ধান কর।

পরিশিষ্ট। (ক)

বহিরা ছিরিয়ার অধিবাসী ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তদানিন্তন প্রচলিত ধর্ম্ম নানা প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়াতে তিনি সম্বৎসর মঠ মধ্যে নির্জ্জন বাস করিয়া সত্যের অনুসন্ধানে চিন্তারত থাকিতেন এবং বৎসরান্তে একদিন শিষ্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

পাদরী বহিরা এবং ছলমান ফারসী ও তাহাদের ইছলাম গ্রহণ

এই সময়ে পারশ্যদেশে মাবা জারদস্তী নামক জনৈক অগ্নিপূজক বাস করিতেন। এই মাবা উত্তর কালে আঁ হজরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া খাঁটি মোসলেম হন এবং ছালমান ফারসী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খন্দক যুদ্ধে ইনি আঁ হজরতের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। মাবা অগ্নিপূজা ত্যাগ করিয়া সত্যের অনুসন্ধানে নানাদেশ পর্য্যটন করিতে করিতে বহিরার নিকট উপনীত হইয়া বলেন, "সকল ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিয়াছি। দেখিলাম, সত্য অসত্য এমন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব। আপনি যদি সত্যের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, আমাকে জানাইয়া কৃতার্থ করুন"। বহিরা তদুত্তরে বলিলেন, "আমি নিজেও এই উদ্দেশ্যে বহু বৎসর যাবৎ চিন্তারত আছি, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাই বলিয়া আমি আশা পরিত্যাগ করি নাই, কারণ আমি জানি, খোদাতালা নিশ্চয়ই একজন হাদী (সত্য পথপ্রদর্শক) পাঠাইয়া জগতের ভ্রমান্ধকার দূর করিবেন। আমি সেই প্রতীক্ষায় এখানে স্থির হইয়া বসিয়া আছি। তুমিও আমার অনুসরণ কর।" মাবা বলিলেন, "অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য আমার নাই। আপনি বলিয়া দিন, কোথায় গেলে আমি তাঁহার সন্ধান পাইব"।

মাবার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বহিরা বলিলেন, "তবে শুন, প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং আমার ধর্ম্মগুরুর নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, অবিলম্বে একজন জবরদস্ত নবী আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারই সন্দর্শনের আশায় আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর এই স্থানে অবস্থান করিয়া যাবতীয় পথিকগণের প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম। যে ঘটনার কথা বলিতে যাইতেছি, সে আজ অন্যূন চল্লিশ বৎসরের কথা। একদিন একটি আরব দেশীয় বণিকদল বাণিজ্যব্যপদেশে পর্য্যটনকালে অদূরে ঐ বৃক্ষতলে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতেছিল। আরবগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বিনীত এবং কলহপ্রিয় হইলেও এই প্রকার কথিত ছিল যে, ইহাদেরই দেশস্থ ফারাণ পাহাড় হইতে সেই হাদী বহির্গত হইবেন। সুতরাং আমি এই দলের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তাহাদের মধ্যে জনৈক অল্প বয়স্ক সুন্দর ও প্রতিভাশালী বালকের মুখে আমি এমন এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলাম যে, আমার হৃদয় স্বতঃই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। আমি লক্ষ্য করিলাম যে, বালকটি যেখানেই যাইতেছে, একখণ্ড মেঘ তাহাকে প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। আরও দেখিলাম, বালকটি অত্যন্ত স্বাবলম্বী; স্বকার্য্যে কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। বিশেষ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমি বালকের অলিকে (অভিভাবককে) জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা প্রতিমাপূজক। তৎপরে বালকের সহিত আমার এই প্রকার কথোপকথন হইল:—

আমি—আপনারও কি মজ্‌হাব এই ?

বালক—আমি কখনও কোন মূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করি নাই। সত্য অনুসন্ধানের এক আকুল তৃষ্ণা আমাকে আলোড়িত করিতেছে; আমি তাহাই খুঁজিতেছি, আজও পাই নাই।

আমি—আপনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ও ইহুদী ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া স্বীয় মজহাবের ত্রুটী জানিয়া থাকিবেন।

বালক—আমি লেখা পড়া জানি না, আমার কাওম (সম্প্রদায়)ও অশিক্ষিত, আপনাদের গ্রন্থে কি আছে, আমি অবগত নহি। তবে আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আরবগণ বিপথগামী।

আমি—আমার "দীন" (ধর্ম্ম) সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

বালক—আপনিও গোনাহ হইতে মুক্ত নহেন। আপনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গোনাহ শেরেক বা অংশবাদ।

আমি—আপনি কি আমাকে আরবগণের ন্যায় পৌত্তলিক মনে করেন?

বালক—খোদার প্রকৃত মজহাব তওহিদ (একত্ববাদ)। মানবের প্রকৃতিই ইহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। যে সম্প্রদায়ের কথা মনে করুন দেখিবেন, সকলেই খোদাকে বেমেছাল (অদ্বিতীয়) ও কদীম (অনাদি) বলিয়া স্বীকার করিবে; এমন কি, ঘোরতর নাস্তিকও একটি "কুওয়তে আবদী" (চিরন্তন শক্তি) মানিয়া থাকে। এই সমস্ত গুণ একাধিক ব্যক্তিতে সম্ভব নহে। অথচ এই সত্য স্বীকার করিয়াও সকল মজহাবই অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহুদি বলে, "ওজায়ের" খোদার পুত্র। খৃষ্টান বলে, মছী খোদার পুত্র এবং তাহারা তিন খোদার পক্ষপাতী। বোৎপরস্ত দেবমূর্ত্তির পূজা করে, আবার কেহ বা স্বীয় কল্পনা-প্রসূত শক্তির মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু কি বিস্ময়ের কথা যে, সকলেই মুখে খোদাকে অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয় আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, অথচ কার্য্যতঃ খোদার প্রাপ্য বন্দেগী সামান্য বস্তুকে অর্পণ করে।

আমি—আপনার কথা হইতে বুঝা যায়, আপনি লেখা পড়া না জানিলেও আছমানী কেতাবসমূহের শিক্ষা শ্রবণ করিয়াছেন।

বালক—না, না। আমি কোন আছমানী কেতাব দেখি নাই বা শুনি নাই; আর কেতাবের প্রয়োজনই বা কি? ঐ উপরিস্থ নিস্তব্ধ

আকাশ, ঐ উজ্জ্বল ভ্রমণশীল নক্ষত্রনিকর, ঐ বিশাল মরুভূমি, ঐ পর্ব্বতের শিখরসমূহ কি কোন শিক্ষা দেয় না? উহাদের প্রত্যেকটি খোদার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহারই গুণগানে নিরত আছে। ইচ্ছা থাকিলে আপনিও প্রত্যেক বস্তু হইতে শিক্ষা পাইতে পারেন।

আমি—আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির আরবের এক অপ্রসিদ্ধ কোণে পড়িয়া থাকা দুনিয়ার উপর জুলম্। আপনি এই খানকায় (আশ্রমে) অবস্থিতি করুন; আমরা আপনার নিকট হইতে হেদায়েত (সত্য পথের সন্ধান) পাইব।

বালক—হেদায়েতের আবশ্যক এখান অপেক্ষা আমার দেশের ভ্রান্ত লোকের পক্ষে অধিক। আর আমি এখনও জানি না, আমি কি জন্য আসিয়াছি বা আমাকে কি আদেশ করা হইয়াছে বা আমি কি করিব। আমার অন্তরে এক আগ্রহ ও পিপাসা বলবতী আছে, জানি না কিসে ইহার নিবৃত্ত হইবে। আমি নিজকে সম্পূর্ণ খোদার মর্জ্জির উপর ছাড়িয়া দিয়াছি। আমা হইতে তিনি যে কার্য্য গ্রহণ করেন,তাহাতেই রাজি আছি। আপনি কি মনে করেন যে, আমিও আপনার ন্যায় হাত পা ভাঙ্গিয়া এখানে বসিয়া যাইব? এরূপ জীবন আমায় শান্তি দান করিতে অক্ষম। আপনি সমস্ত পার্থিব দ্রব্যকে বর্জ্জন করা খোদাপরস্তি মনে করেন, কিন্তু আমার নিকট ইহা মানব জীবনের এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। খোদা দুনিয়াতে যে সমস্ত লজ্জত ও নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা অকৃতজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমি—তবে কি আপনি বৈরাগ্য এবং নিষ্ঠার বিরুদ্ধবাদী? আর আমি যে জীবনের প্রধান অংশ এবাদতে ব্যয় করি, ইহা কি ব্যর্থ?

বালক—নিজকে খোদার মর্জ্জির উপর সমর্পণ করাই এবাদত; দিবারাত্র গৃহকোণে বসিয়া থাকা এবাদত নহে। দুনিয়ার সমস্ত কার্য্য খোদার নির্দ্দেশমত সম্পন্ন করাই প্রকৃত এবাদত এবং পার্থিব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে যে, ভোগান্ধতা আসে, তাহা হইতে বাঁচিবার নামই বৈরাগ্য এবং নিষ্ঠা; দুনিয়ার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করা এবাদতও নহে, পরহেজগারী (নিষ্ঠা)ও নহে।

বালকের এই সকল প্রত্যুত্তর শুনিয়া আমার ধারণা হইল যে, ইনি নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ পুরুষ হইবেন এবং হয়ত ইনিই আছমানী কেতাবের নির্দ্দিষ্ট হাদী। আমি জানিতাম যে, এই হাদী বাল্যকাল হইতেই এতিম হইবেন। তাই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বালকের অভিভাবককে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বাস্তবিকই শুনিলাম যে, বালক তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাহার মাতা পিতা কেহই নাই। আমার তখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ইনিই সেই শেষ মহাপুরুষ হইবেন। সুতরাং বালকের অভিভাবককে সাবধান করিয়া দিলাম যে, বালককে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবেন; কারণ ইহুদিগণ সন্ধান পাইলে ইহার শত্রুতা সাধন করিতে ছাড়িবে না।

কাফেলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার পর হইতেই আমি সংসার বিমুখ সন্ন্যাসব্রতের উপর ক্রমে আস্থাহীন হইয়া পড়িতে লাগিলাম এবং পূর্ব্বে এবাদতে বসিয়া যে ক্রুশ, ত্রিত্ব ও পূর্ব্বতন আওলিয়াগণের ধ্যান করিতাম, তাহা এখন প্রকৃত এবাদতের অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার পর এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আর সেই বণিক দলের সাক্ষাৎ পাই নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ বালক এতদিনে নিশ্চয়ই আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বাবা, তোমার যদি বাস্তবিকই অনুসন্ধিৎসা অতি প্রবল হয়, তবে এখান হইতে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে

গমন করিলে, তাহার সন্ধান পাইবে। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে আমার সহিত প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার নিকট ঐ বালকের সমস্ত সংবাদ লিখিবে।

প্রতিশ্রুতি দান করিয়া মাবা আরবের মরুভূমির মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। পথিমধ্যে জাকারিয়া নামক জনৈক খৃষ্টীয় সাধকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সাধুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সহবাসে অতিবাহিত করেন। তাঁহার নিজের মজহাব সম্বন্ধে জাকারিয়া মাবাকে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছিলেন :—"একই সত্য মজহাব হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত মছী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মছী প্রচলিত মজহাব পলের শিক্ষাদ্বারা ক্রমে কলুষিত হইয়া রোমীয়ের হস্তে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীন মছীহতের (খৃষ্টধর্ম্মের) আমিই একমাত্র নিদর্শন অবশিষ্ট আছি এবং সাম্প্রদায়িক কলহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এই গুপ্তস্থানে অবস্থান করিতেছি। যাহা হউক, এখন মছীহিয়তের সময় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কারণ সত্য প্রচারের ভার খোদাতালা অন্য ব্যক্তির উপর সমর্পণ করিয়াছেন; দক্ষিণের পার্ব্বত্য ভুমিতে নূতন নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ হেজাজে তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তিনি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া এছরবে (মদিনায়) যাইবেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে প্রেরিতত্বের মোহরাঙ্কিত থাকিবে"।

জাকারিয়ার মৃত্যুর পর মাবা এক বণিক দলের সহিত হেজাজ যাত্রা করিলেন। কিন্তু দলপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পথিমধ্যে কৌশল ক্রমে জনৈক ইহুদির নিকট মাবাকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া গেল, সুতরাং সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মাবা দাস জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। মাবার প্রভুর এক কন্যা তখন মদিনায় অবস্থান করিতেছিল, তাহাকে

গৃহে আনিবার ভার ভাগ্যক্রমে মাবার উপর পতিত হইল। মাবা ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মদিনায় গমন করিলেন। মদিনায় অবস্থান কালে তিনি তাঁহার বহুকালের সাধনার ধন, ঈপ্সিত নবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। জাকারিয়ার নিকট ইঁহার সম্বন্ধে যে সকল নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই মিলিয়া গেল। একদিন ভাগ্যক্রমে ইঁহার উন্মুক্ত পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তের মোহর দর্শন করিয়া তিনি চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হন। সেই দিন আঁ হজরত মাবার নিকট হইতে তাঁহার নিজের এবং বহিরার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার প্রভুর নিকট হইতে মুক্তি প্রার্থনা কর, আমি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিব।"

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে মাবা বহিরার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—"আমি এখন আর খৃষ্ট মাবা নহি, দীন ইসলাম গ্রহণ করায় আঁ হজরত আমাকে ছালমান নাম দিয়াছেন। এই নাম আমার নিকট অতীব প্রিয়, কারণ ইহার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার উভয় লোকের মঙ্গলের ভরসা হয়। যে মুহূর্ত্তে সেই পবিত্র হস্তে হস্ত রাখিয়া ইমান আনিয়াছি, তখনই আমার সকল সন্দেহ চূরমার হইয়াছে। কিরূপে মুক্তি সাধন করা যায়, তাহা আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি আপনার খাদেম, তবুও দাবী করিয়া বলিতে পারি, ৮০ বৎসরের এবাদতে ও রেয়াজাতে (১) আপনার যে সকল সন্দেহ দূর করিতে পারে নাই, খোদার মর্জ্জি, দুই কথায় আমি তাহার সুমীমাংসা করিয়া দিব।"

যাহা হউক, ছালমান প্রভু কন্যাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ইহুদি অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এই সুযোগে তিনি স্বীয় মুক্তি প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর এই সর্ত্তে ইহুদী ছালমানকে

(১) উৎকৃষ্ট পবিত্রাচার

মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইল যে, নিস্ক্রয় স্বরূপ তাহাকে ৪০ আওকিয়া (১) স্বর্ণ দিতে হইবে এবং তাহার বাগানে ৩০০ খর্জ্জুর চারা রোপণ করিয়া সতেজ করিয়া দিতে হইবে। ছালমান উভয় স্বর্ত্ত স্বীকার করিয়া আঁ হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, আঁ হজরত শিষ্যবর্গ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে খর্জ্জুর চারা রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই চারাগুলি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন প্রয়োজনীয় স্বর্ণ দান করিয়া ছালমানকে মুক্ত করিলেন এবং স্বীয় সন্নিধানে অবস্থান করিবার অনুমতি দিলেন।

বহিরা ছালমানের পত্রের উত্তরে লিখিলেন :—"তোমার সৌভাগ্যের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। সেই বালকই যে আখেরী পয়গম্বর হইয়াছেন শুনিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। জীবনে ঐকান্তিক সাধ ছিল, আখেরী রছুল আমার সামনে প্রকাশ হন এবং আমি তাঁহার সাক্ষাৎলাভে কৃতকৃতার্থ হই। আমার উভয় আকাঙ্খাই পূর্ণ হইয়াছে। সন্ন্যাসব্রত যে মানবের পক্ষে মহা অভিসম্পাত সদৃশ, ইনি এই সত্য জানাইয়া দিয়াছেন। এই সন্ন্যাসব্রত (রোহবানায়ত) জীবনকে নীরস করিয়া দেয়, সৃষ্টি নষ্ট করে, পৃথিবীর উপাদেয়তাকে পণ্ড করিয়া দেয় এবং মাত্র কয়েকটী লোকের মধ্যে মুক্তির আশা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। যাহা হউক, দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা স্বত্বেও আমি মদিনায় উপস্থিত হইয়া হজরতের পদ চুম্বন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁহার বিনানুমতিতে যাইতে পারিতেছি না।"

হজরত এই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া বহিরাকে এই উত্তর জানাইতে আদেশ করিলেন যে, তাঁহার সশরীরে মদিনায় আগমনের কোন প্রয়োজন নাই। যে সমস্ত পূণ্যাত্মা তাঁহার প্রেরিতত্বের বিষয় শ্রবণ করত ইসলাম

(১) ওজন বিশেষ

কবুল করিয়াছেন, তাঁহারা, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া ইমান আনিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন।

বহিরা এই উত্তর পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং স্বীয় শিষ্যবর্গকে ডাকিয়া শেষ হাদীর বিষয় প্রকাশ করিলেন এবং প্রত্যেককে এই হেজাজের নবীর প্রতি ঈমান আনিতে উপদেশ দিলেন। তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, "যে ধর্ম্ম পৃথিবীর আদিকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং যে সত্য ধর্ম্ম মছী প্রচার করেন, কিন্তু কালক্রমে যাহা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সত্যধর্ম্মের পূনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এই নবী প্রেরিত হইয়াছেন। যে ইহাকে বিশ্বাস না করিবে, সে পথভ্রষ্ট হইবে।"

এই প্রকার ওয়াজ (বক্তৃতা) করিয়া বহিরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক শিষ্য ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের গির্জ্জাটী মছজেদে পরিণত হইয়াছিল।

সমাপ্ত।